দুই
টাকা

প্রথম প্রেম—২৲ ইতি—১৷৷০ জননী জন্মভূমিশ্চ—১৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,—২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবি রজনীকান্ত সেনের

বাণী ১।০ শেষদান ১।০ কল্যাণী ১৷০

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের

রত্নদীপ্তর বাক্স ১॥০ মনের মানুষ ২৲

জামাতা বাবাজী ২৲ নবদুর্গা ২৲

ষোড়শী ৩॥০, সিন্দুর-কৌটা ২॥০

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্তের

অশ্রুময়—২৲ গৌরী—১৲

রায় যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুরের

ধ্রুবতারা ২৲ উড়িষ্যার চিত্র ২৲ অনুপমা ২৲

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চৌধুরীর

বৃন্তচ্যুত ১।০, ঘরের ডাক ২৲

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের

পিয়ারী২৲, কুজ্ঝটিকা২৲, লজ্জাবতী ২৲

শ্রীবিধু ভট্টাচার্য্য

প্রশান্ত ১॥০ চিরঅপরাধী ১॥০

অশ্রুনির্ঝর—২৲ পঙ্কজ—১॥০

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

ঘড়োহাওয়া ২৲ বধূবরণ ১॥০

অনাহুত ১॥০, শ্রাবণমন্ত্র ১॥০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

পুতুল প্রতিমা ১॥০

অভয়ের বিয়ে ২৲

তার পর ২৲ শুভা ২৲ সর্বহারা ২৲

অগ্নি সংস্কার ১॥০ পিতা পুত্র ১॥০

শান্তি ২॥০ দূরের আলো ২৲ বিপর্য্যয় ২॥০

তৃপ্তি ২৲ গ্রামের কথা ২৲ পাঞ্জী ২॥০

দুষ্টগ্রহ ২৲ মিলনপূর্ণিমা ২৲ তৃপ্তি ২৲

বিয়ের খাতা ১॥০

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

অস্তাচল—১॥০

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের

নারায়ণী—২৲ পতিতার সিদ্ধি ২॥০

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

বাণী ব্রজসুন্দরী ১॥০ বীরপূজা ১৲

রাজা গণেশ ১॥০ সনাতন গোস্বামী ১॥০

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের

গান ২৲ পরপারে ১॥০ সাজাহান ১৲

চন্দ্রগুপ্ত ১৲ বঙ্গনারী ১৲ হাসির গান ২৲

দিলীপকুমার রায়ের

দ্বিজেন্দ্রগীতি ১ম ২॥০ ২য় ১॥০ দুধারা ১॥০

মনের পরশ ৩৲ ভ্রাম্যমানের

দিনপঞ্জিকা ২৲

প্রহেলিকা—২৲

জঞ্জাল—১৷৷০ যুগমানব—৩৲

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস এম-এর

পলাশবন—১॥০

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর

ব্রতচারিণী ২॥০ খেয়ার শেষে ২৲

দানের মর্য্যাদা ২৲ বিসর্জ্জন ১॥০

বিজিতা ২॥০ নূতন যুগ ১॥০ বঙ্গপল্লী ২॥০

তরুণের অভিযান ১॥০ স্নেহের মূল্য ২৲

দুনিয়ার দান—১॥০

রায় বাহাদুর জলধর সেন প্রমুখ ষোলজন

পূজারী পূজিত

ভাগের পূজা—২৲

নরেন্দ্র দেব

ওমর খৈয়াম ৪৲ গল্পমিল ১॥০ বাল্মীয় ২৲

খেলার পুতুল ২৲

বসুধারা ২৲ মেঘদূত ৩৲ বোঝাপড়া ॥০

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

উদাসীর মাঠ ১৲ ত্রিলোচন কবিরাজ ১৲

মানময়ী গার্লস্ স্কুল (নাটক) ৸০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,—২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পাঠাইবেন।

২। প্রবন্ধ সকল প্রকাশকের নিকট প্রেরিতব্য।

৩। প্রবন্ধের সঙ্গে ঠিকানা লেখা না থাকিলে বড় অসুবিধা হয়। প্রবন্ধ লেখকগণ দয়া করিয়া প্রত্যেক লেখার সঙ্গে ঠিকানা লিখিয়া দিবেন এবং অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ লইতে হইলে ডাক খরচা দিতে হইবে।

৪। কবিতার নকল রাখিয়া পাঠাইবেন, অমনোনীত কবিতা ফেরত দেওয়া হয় না।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি—

১। নূতন বিজ্ঞাপনদাতাগণের পক্ষে মূল্য অগ্রিম দেয়।

২। পরিচিত ও পুরাতন বিজ্ঞাপনদাতাগণের পক্ষে পূর্ব্বমাসের বিজ্ঞাপনের মূল্য বাঙ্গালা মাসের ১২ই মধ্যে না দিলে, পরের মাসে সে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না।

৭। কোনও বিজ্ঞাপনের প্রকাশ বা অপ্রকাশ ও স্থান নির্দ্দেশ আমাদের ইচ্ছাধীন।

বিজ্ঞাপনের হার—

সাধারণ	১ পৃষ্ঠা	বা ২ কলম	...	৩০৲	প্রতিমাসে
	½ "	বা ১ "	...	১৬৲	"
	¼ "	বা ½ "	...	৯৲	"
	⅛ "	বা ¼ "	...	৫৲	"
সূচী-পৃষ্ঠার অৰ্দ্ধ পৃষ্ঠা			...	২০৲	"
"	সিকি "		...	১২৲	"
"	⅛ "		...	৭৲	"

বৈদেশিক, রেলওয়ের ও গভর্ণমেণ্টের বিজ্ঞাপনের হার সাধারণ পৃষ্ঠা—৩৫৲।

বিশেষ পৃষ্ঠার হার পত্র লিখিয়া জ্ঞাতব্য।

প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্,

ফোন :—৩৭৭, বড়বাজার
টেলিগ্রাম :—'পাব্লিকেশন'

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

[illegible]

শ্রীরবীন্দ্র নাথ মৈত্র

যথেষ্ট—আবার বুগ বংশের এবং তোমাদের মধ্যে শাড়ীর আঁচল ও চাবির গুচ্ছ পর্য্যন্ত রোগ জীবাণু ছড়াইতেছে। ভবিষ্যতে সম্ভবতঃ পদধ্বনি শুনিয়াই তোমরা মূর্চ্ছা যাইবে—তখন রোগী এবং কবিরাজের অবস্থা দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করা যায় না। অনষ্টার ট্রাজেডি 'নারী নির্য্যাতন' আধুনিক প্রেমের অপূর্ব্ব কৌতুক চিত্র। 'জীবনাস্কস-ক্লেব' সভাপতি সোমেন সমদার দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং-এ জীবনের অঙ্ক আরম্ভ করিয়া কমলার মামা হারাণ মজুমদারের বাড়ী যে অবস্থায় উহা সমাপ্ত করিল, তাহা পড়িয়া অতি বড় নীতিবিদও প্রশংসা না করিয়া পারিবেন না। 'জোয়ার' গল্পটিতে দাম্পত্য জীবনের যে অধ্যায় চিত্রিত হইয়াছে, তাহা রঙ্গে, কৌতুকে, হাস্যে ও করুণায় অভিনব। 'সংস্কারক' গল্পটি পল্লী সংস্কারকগণের দুরবস্থার একটি নিখুঁত চিত্র। 'শেষ পৃষ্ঠার' প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সবটুকুই উপভোগ্য। শক্তিশালী লেখকের হস্তে সাধারণ বিষয়গুলি কিরূপ অপূর্ব্ব হইয়া উঠে রবীন্দ্র মৈত্র এই কৌতুক-চিত্রের প্রত্যেক গল্পে তাহার পরিচয় দিয়াছেন। পরশুরামের গড্ডালিকা ও কজ্জলীর ন্যায় এই বই-খানিও গল্প সাহিত্যের কৌতুক-সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে। দাম এক টাকা। —বঙ্গবাণী

—উদাসীর মাঠ—

অপূর্ব্ব গল্পসংগ্রহ গ্রন্থ। চমৎকার ছাপা ও বাঁধা। মূল্য এক টাকা

...অবতারণা করিয়াছেন, বাঙলা
...সাহিত্যে তাহা সম্পূর্ণ
নূতন এবং একান্ত দুর্লভ।
বইখানি পড়িতে বসিয়া
হাসিতে হাসিতে পেটে খিল
ধরিবে।
মূল্য ১৷৷০ টাকা
শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত
পিতা-পুত্রে ১৷৷০
শান্তি ২৷৷০
দূরের আশায় ২৲
মিলন-পূর্ণিমা ২৲
পাপের ছাপ ২।০
একা ১৷৷০
অভয়ের বিয়ে ২৲
তারপর ২৲
বিপর্য্যয় ২৷৷০
দুষ্টগ্রহ ২৲
রূপের অভিশাপ ২৲
সর্ব্বহারা ২৲
ব্রতী ২।০
কাঁটার ফুল ১৷৷০
অগ্নিসংস্কার ১৷৷০
গ্রামের কথা ২৲
শুভা ২৲ তৃপ্তি ২৲
রাজশ্রী ২৷৷০
ঋষির মেয়ে
নাটক (২য় সংস্করণ)
ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত মূল্য ১৲
বড় বৌ বা নারায়ণী
নাটক—ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত
মূল্য—২৲ টাকা

মন্ত্রশক্তি (২য় সং)—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।
মণির জ্যোতি—শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী।
ফুলের তোড়া (৩য় সং)—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।
অভাগী (দ্বিতীয় খণ্ড)—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর।
নব্য-বিজ্ঞান (২য় সং)—শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ।
নববর্ষের স্বপ্ন—শ্রীনরলা দেবী বি-এ।
নীলমাণিক (২য় সং)—রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন, বি-এ।
হিসাবনিকাশ—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম্-এ, বি-এল।
মায়ের প্রসাদ (২য় সং)—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
ইংরাজী কাব্যকথা—আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম-এ
জলছবি—শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।
শয়তানের দান (২য় সং)—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।
ব্রাহ্মণ-পরিবার (২য় সংস্করণ)—শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।
নিষ্কৃতি (৫ম সং)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
হরিশ ভাণ্ডারী (৫ম সং)—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর।
কোন্ পথে (২য় সং)—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এম-এ।
পরিণাম—শ্রীগুরুদাস সরকার, এম্-এ।
পল্লীরাণী (৩য় সং)—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
ভবানী—শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।
অমিয় উৎস—শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।
অপরিচিতা (২য় সং)—শ্রীপান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এল।
প্রত্যাবর্ত্তন—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বসুমতী সম্পাদক।
দ্বিতীয় পক্ষ (২য় সং)—শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।
ছবি (৫র্থ সং)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

[illegible] (২য় সং)—[illegible]
অয়স্বরা—শ্রীবিধুভূষণ বসু।
আকাশ কুসুম—শ্রীনিশিকান্ত সেন।
ব্রহ্মপণ—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়।
আহুতি—শ্রীসরসীবালা বসু।
অন্না (২য় সং)—শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী।
মণ্টুর মা—শ্রীচরণ দাস ঘোষ।
পুষ্পদক—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।
রক্তের ঋণ (৩য় সং)—শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম-এ, ডি
ছোড়দি (২য় সং)—বিজয়রত্ন মজুমদার।
কালো বৌ (২য় সং)—শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য বি-এ, বি
মোক্তিন!—শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ।
দিক্ষীশ্বরী—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
ভুলের মায়া—শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়।
আনন্দ মন্দির (২য় সং) শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম-এ
চিরকুমার (২য় সং)—মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় এম-এ
নারীর প্রাণ—শ্রীবামাপ্রসন্ন সেনগুপ্ত।
প্রজাপতির দৌত্য—শ্রীঅজয়কুমার সেন।
সাধে-বাদ—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
স্বাস্থ্যযুক্তি—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায় এম-এস-সি।
মুসাফিরের মঞ্জিল—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর।
প্রেমের ফাঁদ—সরসীবালা বসু।
আত্মস্মৃতি (২য় সং)—শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী।
গরীব (২য় সং)—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।
বাজীওয়ালা—শ্রীসুষমা সিংহ।

প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পারিজাতের

জেস্মিন সাবান

শীতকালে ব্যবহারেও গা ফাটে না

—বরং—

ত্বক মসৃণ রাখে।

—পারিজাত সোপ ওয়ার্কস—

অফিস :—১নং, পর্টুগীজ চার্চ্চ ষ্ট্রীট কলিকাতা

ফোন—৩৯০৭ বড়বাজার

ফ্যাক্টরী :—টালিগঞ্জ

ফোন—সাউথ ১৫৫৫

— শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত —

লেখিকার প্রত্যেক বই-খানিই যেন সজীব। আমাদের সংসারের সুখ দুঃখের কথায় ভরা। আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান, চরিত্রবল, সমাজের বিশৃঙ্খলা, আদর্শ দম্পতি, ত্যাগের মহিমা, ভোগের অন্ধতা, সকল সুরুচিসঙ্গত ভাবে বইগুলির প্রত্যেক পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে যে ভাবে লিখিত আছে, তাহাই যে আমাদের জীবন-ধারণের পক্ষে একমাত্র পন্থা ইহা আপনি সানন্দে স্বীকার করিবেন।

ঝুমকা ২০৲ হইতে
মিনা আংটী ৮৲ হইতে
চূড়ীর বালী ৪৲ হইতে ৬৲
নেকচেন „ ৪৲ হইতে ৬৲
বিস্তারিত বিবরণ সচিত্র
ক্যাটালগে পাইবেন।
এস, কে, দত্ত
ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার
৩৪ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা
ক্যাটালগের জন্য ৵০ আনার ষ্টাম্পসহ পত্র লিখুন।
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত পুস্তকাবলী
বিরাজ বৌ
চরিত্রহীন ৩॥০
দেবদাস ১॥০
স্বামী ১৲
ছবি ।৵০
পরিণীতা ১৲
দেনা-পাওনা ২॥০
নববিধান ১॥০
মেজদিদি ১।০
কাশীনাথ ১॥০
নিষ্কৃতি ।০
বামুনের মেয়ে ১৲
রমা (নাটক) ১৲
বৈকুণ্ঠের উইল ১৲
বিন্দুর ছেলে
মূল্য
দুই

প্র-২৩

নিবেদন

সরোজনলিনীর জাপান-ভ্রমণকাহিনী ছাপাইতে নানা কারণে দেরি হইয়া পড়িল। যাহা হউক এখন যে ইহা সাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে পারিয়াছি তাহাতে নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছি। সরোজনলিনীর বড় ইচ্ছা ছিল যে তাঁহার বিদেশ-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা যেন দেশের কাজে লাগে। আশা করি তাঁহার সেই ইচ্ছা ফলবতী হইবে এবং তাহাতে তাঁর অমর আত্মা তৃপ্তিলাভ করিবে। তাঁহার অবশিষ্ট ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পৃথক পুস্তকাকারে ছাপাইবার আশা রহিল।

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রায় সাহেব জগদানন্দ রায় মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া কেবল এই বইখানার ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন তাহা নহে, তিনি যারপরনাই পরিশ্রম করিয়া বইখানার পাণ্ডুলিপি দেখিয়া দিয়া ইহার মুদ্রাঙ্কনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বইখানার প্রুফ-সংশোধনে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের উভয়ের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

এই পুস্তক সরোজনলিনীর উদ্দেশে উৎসর্গিত হইল। ইহার বিক্রয়-লব্ধ অর্থ "সরোজনলিনী দত্ত নারী-মঙ্গল সমিতি"র ভাণ্ডারে অর্পিত হইবে।

কলেক্টার কুঠি
হাওড়া
৬-৬-২৮

শ্রীগুরুসদয় দত্ত

ভূমিকা

গ্রন্থকর্ত্রী স্বর্গীয়া সরোজনলিনীর পরিচয়-প্রদান অনাবশ্যক। আজ বঙ্গদেশের নগরে ও গ্রামে বহু "মহিলা-সমিতি" তাঁহার স্মৃতি বুকে ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সাধনা অনেকে করেন, কিন্তু সব সাধনার সিদ্ধি হয় কই? যে সূত্রটি ধরিয়া পুণ্যাত্মা গ্রন্থকর্ত্রী সাধনা করিতেছিলেন, তাহা আজ বাঙলার নারীগণকে সখ্যত্বের ডোরে বাঁধিতে পারিয়াছে। ইহাকেই বলে সিদ্ধি। জীবনের মহাব্রত সাঙ্গ হইবার পূর্ব্বেই ভগবান্ তাঁহাকে নিজের কাছে টানিয়া লইয়াছেন সত্য, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি সেই ব্রতধারিণী সাধ্বীর আশীর্ব্বাদই এখন তাঁহার অসিদ্ধ কর্ম্মগুলিকে পূর্ণতা প্রদান করিতেছে। তাই মনে করি,—

"জীবনে যত পূজা হ'ল না সারা,
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা;
যে ফুল না ফুটিতে
ঝরেছে ধরণীতে,
যে নদী মরু-পথে হারালো ধারা,
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা।"

এই কবি-বাক্যের সার্থকতা গ্রন্থকর্ত্রীর জীবনে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। মানুষ মরিয়া গেলে ভৌতিক দেহের সহিত তাহার সকলি ধ্বংস হয়, একথা যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের উক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করা চলে না। যন্ত্রের তার ছিঁড়িয়া গেলে যেমন যন্ত্রীর মহিমা লোপ পায় না, তেমনি দেহের অবসানের সঙ্গে দেহীর সকলি কখনও শেষ হয় না।

আমার বিশ্বাস পাঠক-পাঠিকাগণ গ্রন্থকর্ত্রীর এই মহৎ জীবনের পরিচয় তাঁহার এই পুস্তকে পাইবেন। জাপান ও য়ুরোপ ভ্রমণ শেষ করিয়া যখন

তত্ত্ব-কুসুম।

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লংঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা ত্বমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্॥

কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারি

প্রণীত।

শ্রীধাম বৃন্দাবন।

যোগানন্দ ব্রহ্মচারী

প্রকাশক।

অনুপসহর (বুলন্দসহর)

প্রথম সংস্করণ

বৈশাখ, ১৩২৮ সাল।

মূল্য ১৷৹ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
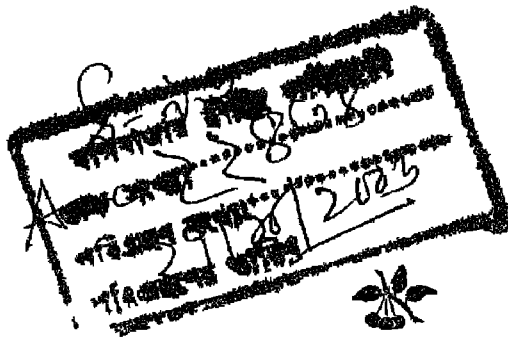
সাম্য-প্রেস,
৬নং কলেজ-স্কোয়ার, কলিকাতা
শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

পুষ্পাঞ্জলি।

ভগবন।

তোমার কৃপায় এই হৃদয়-রূপ কাননে যাহা কিছু ভক্তরূপ কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তাহা তোমার পূজার জন্য সংগ্রহ করিলাম। তোমার বাগান, তোমার ফুল, তোমার ইচ্ছায় সাজি ভরিয়া তুলিয়া, ভক্তিচন্দন মাখাইয়া গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজার ন্যায়, তোমার শ্রীচরণে শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ বলিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিলাম।

গ্রন্থকার।

নিবেদন।

আজকাল লোকের ধর্ম্মানুরাগ যেন দিন দিন বাড়িতেছে, সুতরাং তত্ত্বানুসন্ধান ও ধর্ম্মালোচনাও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতেছে, তাহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। কারণ,আমি ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই ভ্রমণ করিয়াছি, কাজেই আমাকে বাধ্য হইয়া নানা সাম্প্রদায়িক লোকের সঙ্গে মিশিতেও হইয়াছে, তাহাতেই আমি লোকের ধর্ম্ম পিপাসার প্রমাণ পাইয়াছি। কেননা, কোন সাধু মহাত্মা পাইলেই লোকে তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলে, এবং তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন করে, উদ্দেশ্য সংশয় অপনোদন। কিন্তু ইহা বলা বাহুল্য যে, লোকের সকল সময়ে সকল প্রশ্ন ঠিক এক সঙ্গে মনে উদয় হয় না, ইহা কিন্তু সংশয় অপনোদনের প্রধান অন্তরায়। আবার এমনও অনেক লোক আছেন যে, মনে সংশয় সব আছে, কিন্তু গুছাইয়া বলিতে পারিলেন না, সুতরাং প্রশ্নই করিলেন না। এই উভয় ক্ষেত্রেই যদি অযাচিত ভাবে কোন লিখিত পুস্তকে সেই সকল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়, তাহা হইলে উল্লিখিত শাস্ত্রানভিজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু লোকদিগের বিশেষ উপকার সাধিত হইতে পারে। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আমি এই পুস্তকখানি লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই পুস্তকে সমুদয় প্রশ্নেরই যে মীমাংসা হইয়াছে এমন কথা বলিতে পারি না, তবে যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায় শাস্ত্রগ্রন্থে নানা প্রকারে বর্ণিত আছে, এবং পণ্ডিতগণ তাহার নানাবিধ টীকাদিও প্রণয়ন করিয়াছেন। এখন ঐ সকল গ্রন্থ থাকিতেও যে মাদৃশ ব্যক্তির সেই বিষয়ে একখানি অভিনব গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন, অথবা বৃথা শ্রম বলিয়া গণিত হইতে পারে।

কিন্তু ইহার প্রকৃত প্রয়োজন না থাকিলে, আমি কখনই এইরূপ গুরু-তম বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না। প্রয়োজন যে কি তাহাই বলিতেছি। সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, এবং টীকাকার কৃত টীকাদির ভাষাও প্রায় তদনুরূপ, আর ভাবও উচ্চাধিকারীর বোধগম্য, কাজেই সাধারণের সহজবোধ্য নহে। আর একটী গোলযোগের বিষয় এই যে, সংসারের অধিকাংশ লোকেই সংস্কৃত জানে না, সুতরাং তত্ত্বজ্ঞান লাভোপ যোগী শাস্ত্রকথিত উপদেশ ও তাহার তাৎপর্য্যার্থ এতদুভয়েই অনভিজ্ঞ, অথচ তত্ত্বজ্ঞান লাভে ইচ্ছুক। আমি সেই সকল লোকের জন্যই পুস্তক-খানি লিখিতেছি, এবং যাহাতে তাহারা বিষয়টী অপেক্ষাকৃত সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, সে চেষ্টাও সাধ্যমত করিয়াছি। যাঁহারা শাস্ত্রগ্রন্থ পড়িবার ও বুঝিবার অধিকারী তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র, কেননা, তাঁহারা পরিশ্রম করিয়া নিজেরাই নিজেদের প্রশ্নের মীমাংসা শাস্ত্রগ্রন্থে পাইতে পারেন, কিন্তু শাস্ত্রানভিজ্ঞ লোকদিগের আর সে উপায় নাই। উল্লিখিত লোকদিগের উপকারের জন্য যখন আমি পরিশ্রম করিতেছি, তখন আমার সেই শ্রম বৃথা বলিয়া গণিত হওয়ার কোন কারণ দেখা যায় না। ইহাতে পণ্ডিতেরা যদি পঠিতব্য কিছু না পান তাহাতে আমার কোন দুঃখ নাই। কারণ পুস্তকখানি শাস্ত্রানভিজ্ঞ লোকদিগের জন্যই লিখিত হইতেছে। ইহার দ্বারা তাহাদের কথঞ্চিৎ উপকার সাধিত হইলেও আমার সকল শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

এই পুস্তকে শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার অনুসরণ বরাবর করিয়াছি, এবং অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থের লিখিত বিষয়ও প্রয়োজন মত স্থানে স্থানে উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করিয়াছি, এবং সেই সকল বিষয় আমি যতদূর বুঝিয়াছি তাহাই বুঝাইয়াছি। তবে ইহাও আমি বলিতে বাধ্য যে, কালপ্রভাববশতঃ বর্ত্তমান সময়ে লোকেদের বুদ্ধি, বৃত্তি ও রুচির বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

কাজেই সাধারণে বিষয়টা যাহাতে সহজে বুঝিতে পারে, তদনুরূপ কথোপ-কথনচ্ছলে কালোপযোগী উদাহরণের সহিত ব্যবহারিক চলিত ভাষায় বুঝাইবার চেষ্টা পাইয়াছি। ফলতঃ, ভাবের কোন বৈলক্ষণ্য হয় নাই। এখন পুস্তকখানি সাধারণের কতদূর রুচিকর হইবে তাহা বলিতে পারি না। কেমনা, ইহাতে চিত্তরঞ্জক উপাখ্যান কিম্বা চিত্তাকর্ষক কাব্যরস কিছুই নাই। পরন্তু, যে রস হইতে সমস্ত রসের উৎপত্তি সে রসের কথা ইহাতে আছে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে এই পুস্তকখানি সাধারণ অজ্ঞান লোকে-দের জন্য লিখিত, সুতরাং বিষয়গুলি যাহাতে তাহাদের বুঝিবার অনুকূল হইতে পারে, সেই ভাবেই লিখিত হইয়াছে। তা ছাড়া, লেখকও এ কার্য্যে নূতন ব্রতী। কাজেই ইহাতে ভ্রম প্রমাদাদি থাকা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। অতএব সেই ত্রুটীর জন্য পাঠকগণের নিকট অগ্রেই আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া রাখিলাম।

অর্থোপার্জ্জন অথবা যশোলাভের আশায় আমি এই পুস্তক লিখিতে প্রবৃত্ত হই নাই। তবে কোন্ আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তির এতাদৃশ গুরুতম বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা? আকাঙ্ক্ষা এই যে, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কায় কটক লইয়া যাইবার জন্য যখন সমুদ্রে সেতু বন্ধন করেন, তখন কাঠবিড়ালী আর্দ্রগাত্রে সমুদ্র তীরে বালুকারাশির মধ্যে গড়াগড়ি দিয়া, পরে সেতুর উপর গিয়া গা ঝাড়িয়া দিয়া সেতুবন্ধনের যেমন সহায়তা করিয়াছিল। আমিও তেমনি ভবসমুদ্র পার হইবার তত্ত্বজ্ঞানরূপ সেতুর যৎকিঞ্চিৎ সহায়তা করি। ইহাই আমার ক্ষুদ্রাকাঙ্ক্ষা। নিবেদন মিতি।

কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী,

শ্রীবৃন্দাবনধাম।

বিজ্ঞাপন।

এই পুস্তকের সম্পূর্ণ সত্ব মদধীন রহিল। এই পুস্তকের লিখিত কোন বিষয় আমার বিনানুমতিতে যদি কেহ সম্পূর্ণ অথবা আংশিকরূপে গ্রন্থান্তরে কিম্বা ভাষান্তরে ছাপাইয়া প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তিনি আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবেন। নানা কারণবশতঃ ছাপাতে ভুল ও অশুদ্ধ হওয়ায় তাহার একটা শুদ্ধিপত্র দেওয়া হইল। ভগবদিচ্ছায় পুনরায় ছাপা হইলে সে সব সংশোধনের চেষ্টা পাইব, নিবেদন ইতি।

অনুপসহর,
(বুলন্দসহর)

যোগানন্দ ব্রহ্মচারী
সত্বাধিকারী।

শুদ্ধিপত্র।

কত পাতা	কত লাইনে	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১ম	১২	ব'সে	ব'লে
১৩	১৫	বাসুদেব	বসুদেব
১৭	২০	বযন্ত্রণায়	ভবযন্ত্রণায়
১৯	১০	শেনবার	শোনবার
২০	১২ (শ্লোকে)	সর্ব্ব কর্থ	সর্ব্ব কর্ম্ম
৩৮	১২	ইন্দ্রিয়দির	ইন্দ্রিয়াদির
৩৬	৯	এখম	তখন
৭০	১১	হৃত	হ্রত
৪৭	৮	মাটী সে	মাটী যে
৪৭	১০	সূক্ষ্মাসূক্ষ্মরূপী	সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্মরূপী
৫১	১৭	সেগু	সেগুলি
৫১	২৪	উপদে	উপদেশ
৬৪	১ (শ্লোকে)	কক্রৌতীহৈব	শক্রৌতীহৈব
৮৮	২০	তত্ত্বজ্ঞান	তত্ত্বজ্ঞানী
১১৫	১৩	বৃ	বৃষ্টি
১২৬	১৫	পাদোঽস ভূতানীতি	পাদোঽস্য ভূতানী ত্রিপাদোঽস্যামৃতং দিবি
১৩১	১০	রূম	চরম
১৩৫	১৩	ভেলক	ভেল্কী

কত পাতা	কত লাইনে	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৪০	৩	অশুদ্ধ বুদ্ধি ও অহঙ্কার যে কার্য্য শুদ্ধ সূত্রে একত্র হয় তার নাম আনন্দময় কোষ।	
১৫৬	১	শদা	দশা
১৬৯	১৬	এ ভগবানে	ভগবানে
১৭৫	৩	শান্ত	সান্ত
১৭৫	৫	শান্ত	সান্ত
১৭৫	৬	শান্ত	সান্ত
১৭৬	৪	শান্ত	সান্ত
১৮৫	১৬	ইত্যচ্যতে	ইত্যুচ্যতে

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র।

বিষয় পৃষ্ঠা

অ

আ

ঈ

এ

বিষয় | পৃষ্ঠা

ও

ক

গ

বিষয় পৃষ্ঠা

চ

জ

ত

দ

ধ

বিষয় | পৃষ্ঠা

ন

প

ব

বিষয় পৃষ্ঠা

ল

শ

স

৫

তত্ত্ব-কুসুম।

প্রথম দিন।

শিষ্য। গুরুদেব। অনেক দিন হ'তে আমার মনে সংশয় হ'য়েছে, এবং সেই সব সংশয় মেটাবার জন্য পণ্ডিতদের নিকট অনেক প্রশ্নও ক'রেছি, কিন্তু তাঁরা যা বলেন আমি তা ভাল ক'রে বুঝ্‌তে পারি না। এমন কি, অনেক সময় তাঁদের বলা শব্দের অর্থও বুঝ্‌তে পারি না, ভাবের ত কথাই নাই তার কারণ কি?

গুরু। পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ভাষায় নানা শাস্ত্রগ্রন্থ পড়েন সুতরাং সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা তারা বেশী ক'রে থাকেন। সেইজন্য শাস্ত্রীয় বিষয় বলবার সময় প্রায় সংস্কৃত শব্দই ব্যবহার করেন। তুমিত সংস্কৃত জান না, কাজেই সে সব বুঝ্‌তে পার না। আবার অনেক পণ্ডিত এমনও আছেন যে, নানা শাস্ত্রে নানা মত পড়েন ব'লে নানা বুদ্ধিবিশিষ্ট হন। তার মানে এই যে, বুদ্ধি নানাদিকে যায়, একটার উপর নিশ্চয় হয় না, সুতরাং শাস্ত্রীয় বিষয় বল্‌বার সময় সেই বুদ্ধির বশবর্ত্তী হ'য়েই ব'সে থাকেন, অর্থাৎ নানামত মিলিয়ে বলেন। কাজে কাজেই ভাবগুলি আঁকা-বাঁকা হ'য়ে পড়ে, সেই জন্য তোমার মনে প্রবেশ হয় না এবং তুমিও বুঝ্‌তে পার না। সিধা হ'লে তবেত সেদোষ।

শিষ্য। আমি শাস্ত্রটাস্ত্র পড়িনি আপনার শরণ নিয়েছি, আপনিও

আমাকে কোন শাস্ত্রগ্রন্থ পড়্তে নিষেধ করেন। কেবলই বলেন, ভগবদ্গীতা পড়। এখন আমার উপায় কি হবে?

গুরু। তোমার কল্যাণের জন্যই ভগবদ্গীতা পড়্তে বলি। কারণ, সকল শাস্ত্রের যা সার তা এক গীতাতেই আছে, সুতরাং এক গীতা পড়লেই সব শাস্ত্র পড়ার ফল হয়, বরং বেশী ফল হয়। কারণ, শাস্ত্র ছাড়াও জীবের পরম কল্যাণকর উপদেশগুলি অধিকারিভেদে ভগবান স্বয়ং শ্রীমুখে যা বলেছেন তার আর তুলনা নাই। পক্ষান্তরে, ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ প'ড়ে সারভাগ গ্রহণ করাও সাধারণের পক্ষে সম্ভবপর নয়, যেহেতু, শাস্ত্রজ্ঞ ভিন্ন শাস্ত্রানভিজ্ঞ লোকে সারভাগ বেছে নিতে পারে না। আবার শাস্ত্রজ্ঞ লোকের পক্ষেও বহু শাস্ত্র মন্থন ক'রে সারভাগ গ্রহণ করা নিতান্ত অসম্ভব। কারণ, তা বহু সময়সাপেক্ষ, কাজেই এজীবনে কুলায় না, কেননা, একালের লোক স্বল্পায়ু। সেইজন্য পরম দয়াল পরমাত্মা জীবের কল্যাণ কামনায় গীতায় ঐ রকম ভাবে উপদেশ দিয়েছেন। সুতরাং ভগবদ্গীতা পড়্লে এবং গীতোক্ত উপদেশ মত চল্লে যত শীঘ্র জ্ঞানলাভ হয়, এমন আর কোনও শাস্ত্রদ্বারা হয় না। এখন বুঝ্তে পার্লে কেন তোমাকে গীতা পড়্তে বলি, তোমার কল্যাণের জন্যই বলি। অতএব সম্পূর্ণরূপে গীতার আশ্রয় নেও।

শিষ্য। গীতার আশ্রয় নিলে তবে আমারও জ্ঞানলাভ হবে?

গুরু। নিশ্চয় হবে। কোন একটা স্থানে যেতে গেলে একটা নির্দ্দিষ্ট রাস্তা ধ'রেই যেতে হয়। তা না ক'রে, এ রাস্তায় খানিক ও রাস্তায় খানিক সে রাস্তায় খানিক ক'রে গেলে কি আর গন্তব্যস্থানে পৌঁছান যায়? ভগবানের নিকট যেতে গেলে ভগবদ্গীতার কথিত রাস্তাই সর্ব্বাপেক্ষা সোজা ও নিরুপদ্রব। এখন তোমার সংশয় কি বল। আমি এক ভগবদ্গীতা অবলম্বন ক'রেই তোমাকে সব বোঝাতে চেষ্টা কর্‌ব।

শিষ্য। কেন আমরা এ সংসারে এসেছি, আমাদের এ জীবনের উদ্দেশ্য কি এবং আমাদের এজীবনের কর্ত্তব্যই বা কি?

গুরু। ফলের আকাঙ্ক্ষা রেখে কর্ম্ম করলে, সেই কর্ম্মফল ভোগের জন্য এই ভোগায়তন শরীর ধারণ করতে হয়। পাপ হ'ক আর পুণ্য হ'ক উভয়বিধ কর্ম্মফল ভোগের জন্যই জন্মগ্রহণ করতে হয়। শাস্ত্রে বলে চোরাশী লাখ যোনী ভ্রমণ ক'রে সর্ব্বশেষে মনুষ্য যোনীতে জন্ম হয়, এবং পুরুষার্থ অবলম্বন ক'রে সাধনা করলে ঈশ্বরকে জেনে আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি হয় এবং পরমানন্দ লাভ হয়। কেননা, জন্ম মৃত্যুর যন্ত্রণা আর থাকে না। অতএব ঈশ্বরকে জেনে চিরকালের জন্য আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি করাই এজীবনের উদ্দেশ্য। এবং সেই অবস্থা লাভের জন্য যে কোন উপায়ে হ'ক ভগবদ্ভক্তি লাভ ক'রে তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হওয়াই এজীবনের কর্ত্তব্য।

শিষ্য। ত'বে সংসারধর্ম্ম না ক'রে কেবল ভগবদ্ভক্তি লাভ করাই কি এজীবনের কর্ত্তব্য?

গুরু। সংসার ধর্ম্ম ভিন্ন মানুষের উপায়ই নাই। সংসার ধর্ম্ম না করলে লোকের একুল ওকুল দুকুল যায়।

শিষ্য। বলেন কি মশায়!! সংসার না ছাড়লে কি কখন ঈশ্বরকে পাওয়া যায়? ত'বে এত যে সাধু সব সংসার ত্যাগ ক'রেছেন তাদের কি দুকুল গিয়েছে?

গুরু। যারা প্রকৃত সাধু তাঁদের দুকুল নিশ্চয়ই যায়নি। যদি তাঁদের দুকুলই যেত তা হ'লে ভগবান শঙ্করাচার্য্য, কবির দাস গুরু গোরক্ষনাথ, গুরু নানক, ত্রৈলিঙ্গ স্বামী, মহাত্মা তুলসীদাস প্রভৃতি মহাত্মাদের দ্বারা সংসারের এত উপকার সাধিত হ'ত না এবং লোকেও অলৌকিক যোগ বিভূতি দেখতে পেত না। তবে "উদর নিমিত্তং বহুকৃত বেশঃ" যারা

তাদের দুকূল নিশ্চয়ই গিয়েছে। কেবল ধর্ম্মের ষাঁড়ের মত দায়িত্বহীন হ'য়ে নিষ্কর্ম্মাবস্থায় জীবন কাটাচ্ছে। অথবা "অশক্তি মান ভবেৎ সাধু" মতে যারা সাধু তাদেরও দুকূল গিয়েছে।

শিষ্য। সাধুর মধ্যে যে এত রকমারি আছে তাত আমি জান্‌তাম না।

গুরু। হঠাৎ সংসার ত্যাগ ক'রে কৌপীন পরলে কি মাথামুড়িয়ে রঙ্গীন কাপড় পর্‌লে অথবা জটা রাখলে সাধু হয় না। সংসারে থেকে তদুপযুক্ত আচরণ ও কর্ম্ম করাতে পার্‌লে তবে প্রকৃত সাধু হ'তে পারা যায়।

শিষ্য। গৃহীদের কি রকম আচরণ ও কর্ম্ম কর্‌লে প্রকৃত সাধু হ'তে পারা যায় ও তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়?

গুরু। দেখ, চিত্তশুদ্ধি হচ্ছে তত্ত্বজ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়। চিত্ত শুদ্ধি হ'লেই ভক্তিলাভ হয়, তখন তত্ত্বজ্ঞান আপনিই প্রকাশ পায়। এই চিত্তশুদ্ধি লাভের জন্যই শাস্ত্রে গৃহীদের পক্ষে যজ্ঞ, দান ও তপ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। ভগবান গীতার ১৮শ অধ্যায়ের ৫ম শ্লোকে বলেছেন যে,

যজ্ঞ দান তপঃ কর্ম্ম নত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিনাম্।

যজ্ঞদান ও তপ কদাচ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নয়। ইহাদের অনুষ্ঠান করাই শ্রেয়ঃ, কেন না, এই তিনটি কাজে মানুষকে পবিত্র করে। অর্থাৎ এই তিনটি বিবেকীদের চিত্তশুদ্ধির কারণ। অতএব সংসারে থেকে নিষ্কাম ভাবে এই তিনটির অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি এই অবশ্য অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম না ক'রে সংসার ত্যাগ করে, তার সে ত্যাগ বৃথা হয়।

কারণ চিত্তশুদ্ধি ভিন্ন ভক্তি কিম্বা তত্ত্বজ্ঞান লাভের সম্ভাবনা নাই। অন-ধিকারী হ'য়ে সংসার ত্যাগ কর্‌লে তার ফল এই হয় যে, যদিও কেও কোন কারণ বশতঃ সংসার ত্যাগও করে, তা হ'লে তাকে ত্যাগজনিত বিচ্ছেদ যন্ত্রণা নিশ্চয়ই ভোগ করতে হয়। সংসারে জেগে থেকে অর্থাৎ আকৃষ্ট থেকে সংসার ত্যাগ হয় না। সংসারে ঘুমুলে তার মানে সংসারে অনাসক্ত হ'লে তবে গা সংসার ত্যাগ হয়।

শিষ্য। আমি এই বিষয়টা ভাল মত বুঝ্‌তে পার্‌লাম না।

গুরু। মনে কর একটী অজ্ঞান বালক একটা খেল্‌না পেলে তাতে ভারি আসক্ত হয়। কেন না, অজ্ঞান বালকের স্বভাবই তাই। বালক কি রকম আসক্ত হয়? সে খেল্‌নাটী সমস্ত দিন নিয়ে বেড়ায়, এক মুহূ-র্ত্তের জন্যেও ছাড়ে না, কেও চাইলেও দেয় না, কিন্তু সন্ধ্যার পর বালক যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন তার অতি প্রিয় খেলনাটী আপনিই হাত থেকে খ'সে যায়। সাংসারিক লোক অজ্ঞান বালকের মত খেল্‌না সদৃশ সংসারকে এটে ধ'রে কেবল আমার আমার ক'রে প্রাণান্ত হচ্ছে। নিদ্রিত হ'লে, অতি প্রিয় খেল্‌না যেমন বালকের হাত থেকে আপনিই খ'সে যায়, তেম্‌নি সংসার ক্ষেত্রে নিদ্রিত হ'লে লোকের অতি প্রিয় সংসারও হাত থেকে আপনিই খ'সে যায়, অর্থাৎ সংসার ত্যাগ হয়। সংসার ক্ষেত্রে নিদ্রিত হয় কে? ভগবদ্‌তত্ত্বে জাগ্রত হয় যে। ভগবান গীতার ২য় অধ্যায়ের ৬৯ শ্লোকে ব'লেছেন যে,

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রাত ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥

অজ্ঞ লোকের পক্ষে যা (আত্মনিষ্ঠা) নিশা স্বরূপ তাতে (আত্ম-নিষ্ঠাতে) জিতেন্দ্রিয় ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তিগণ জাগ্রত থাকেন। যাতে

(যে বিষয়নিষ্ঠাতে) সর্ব্বভূত জাগ্রত থাকে, তা (সেই বিষয়নিষ্ঠা) আত্মদর্শী জিতেন্দ্রিয় মুনির পক্ষে অর্থাৎ ভগবদ্‌পরায়ণ মহাত্মার পক্ষে নিশা স্বরূপ। ভগবদ্বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, আমাদের জ্ঞাতব্য তত্ত্ব দুইটী সংসারতত্ত্ব ও ভগবদ্‌তত্ত্ব। এখন প্রাকৃতিক নিয়ম এই যে, যখন যিনি যে তত্ত্বে থাক্‌বেন তখন তিনি সেই তত্ত্বে জেগেই থাকবেন, সুতরাং সেই সঙ্গে সঙ্গে অপর তত্ত্বটীতে নিদ্রিতই থাক্‌বেন। তার মানে এই যে, যিনি যখন যে তত্ত্বে থাকেন তখন তিনি সেই তত্ত্বেই ম'জে থাকেন, এবং অপর তত্ত্বটীতে নিদ্রিত থাকেন অর্থাৎ তার কোন খবর রাখেন না। এর সোজা মানে এই যে, সংসারে যিনি আসক্ত ঈশ্বরেতে তাঁর আসক্তি জন্মিতে পারে না, আর যিনি ঈশ্বরেতে আসক্ত সংসারেও তাঁর আসক্তি জন্মিতে পারে না।

শিষ্য। আপনি যে যজ্ঞ দান ও তপ নিষ্কাম ভাবে কর্‌তে হবে ব'ল্‌লেন, নিষ্কাম মানে কি?

গুরু। কোন ফলের আকাঙ্ক্ষায়, স্বার্থের জন্য, অনুরোধে প'ড়ে, ভয়ে, খাতিরে, যশের লালসায় অথবা বড় মানুষী দেখাবার জন্য যজ্ঞ দানাদি না ক'রে কেবল কর্ত্তব্য বোধে বা দয়ার বশবর্ত্তী হ'য়ে, ঈশ্বরের প্রীত্যর্থে কিম্বা ঈশ্বরেতে কর্ম্ম ফল সমর্পণ ক'রে যে কর্ম্ম করা যায় তাই নিষ্কাম। ফলতঃ নিষ্কাম কর্ম্মে ফলের আকাঙ্ক্ষা কি কোন রকম মতলব আদৌ থাক্‌বে না। ভগবান গীতার ২য় অধ্যায়ের ৪৭শ শ্লোকে ব'লেছেন যে,

কর্ম্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্ম ফলহেতুর্ভূর্মা সঙ্গোঽস্ত্ব কর্ম্মণি॥

হে অর্জ্জুন। কর্ম্মে তোমার অধিকার হ'ক কিন্তু কর্ম্মফলে যেন কদাচ

অধিকার না হয়। কর্ম্মফল যেন তোমার কর্ম্মে প্রবৃত্তির হেতু না হয়, অর্থাৎ ফলের লোভে যেন কর্ম্ম না কর, এবং অকর্ম্মেও তোমার যেন আসক্তি না হয়, অর্থাৎ কর্ম্ম ত্যাগও না কর। কর্ম্ম নিশ্চয়ই ক'রতে হবে কিন্তু নিষ্কাম ভাবে।

শিষ্য। এযে ভাবি বিপদের কথা দেখছি। কর্ম্ম করতে গেলেই ফল কামনা মনে আপনিই উদয় হবে, বরং কর্ম্ম না করাই ভাল।

গুরু। কর্ম্ম না ক'রে তুমি এক মুহূর্ত্তও থাকতে পার কৈ? তাতেই ত গীতার ৩য় অধ্যায়ের ৫ম শ্লোকে ভগবান ব'লেছেন যে,

নহি ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্য কর্ম্ম কৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম প্রকৃতির্জৈগু´ণৈ্য॥

কর্ম্ম না ক'রে কেহ ক্ষণমাত্র থাকতে পারে না, প্রকৃতিজ গুণের বশে সকলেই কর্ম্ম করতে বাধ্য হয়।

শিষ্য। সন্ন্যাসীরা কিন্তু কর্ম্মত্যাগ করেন, এবং জ্ঞানীরাও ত কর্ম্ম করেন না।

গুরু। কর্ম্ম কেহই ত্যাগ করতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞানমার্গাবলম্বীর ঈশ্বরোপাসনা কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাঁরা কি তা ত্যাগ করতে পারেন? তবে তাঁদের জীবনের উদ্দেশ্য এবং কর্ত্তব্য কি?

কর্ম্ম কেহই ত্যাগ করতে পারে না। জ্ঞানী হ'ন আর অজ্ঞান হ'ক, কর্ম্মত্যাগ করার সাধ্য কারও নাই। সেই জন্য ভগবান উপরোক্ত শ্লোকে ঐ কথা ব'লেছেন। তার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, ভগবান ব'লছেন হে অর্জ্জুন! তুমি বলতে পার যে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব সত্বেও আমি তোমাকে কর্ম্ম করতে ব'লছি কেন? কর্ম্ম না ক'রে তুমি যে থাকতে পার না। প্রকৃতি তোমাকে ছাড়বেন না। শ্বাস প্রশ্বাস, খাওয়া, মলমূত্র ত্যাগ প্রভৃতি

এগুলি কি কর্ম্ম নয়? সন্ন্যাসী এবং জ্ঞানীই কি এই সকল কর্ম্ম ত্যাগ করতে পারেন?

শিষ্য। যে সকল কর্ম্ম প্রকৃতির বশ হ'য়ে ক'রতে হবে তা ত্যাগ করা যায় না বটে? কিন্তু যে গুলি স্বেচ্ছাধীন কর্ম্ম সে গুলি কি আর ত্যাগ করা যায় না? যেমন যাগযজ্ঞাদি। আমাদের সনাতন ধর্ম্মে বেদবিহিত শ্রৌত কর্ম্ম, ও স্মৃতিবিহিত স্মার্ত্ত কর্ম্মকেই সাধারণতঃ কর্ম্ম বলে। সুতরাং ঐ সকল কর্ম্ম না ক'রে কি জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না?

গুরু। ভগবান গীতায় যে কর্ম্ম শব্দ ব্যবহার করেছেন তাতে কর্ম্ম মাত্রকেই বুঝায়। কেন না ৩য় অধ্যায়ের ৫ম শ্লোকে বললেন যে, কর্ম্ম না ক'রে কেহ ক্ষণমাত্র থাকতে পারে না, এবং তার পরের শ্লোকে ব'লছেন যে,

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢাত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥

যে বিমূঢাত্মা কর্ম্মেন্দ্রিয় গুলিকে সংযত ক'রে থাকে কিন্তু মনে মনে ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয় সকল স্মরণ অর্থাৎ চিন্তা করে সে মিথ্যাচারী। সেই জন্যই ভগবান অর্জ্জুনকে গীতার ৩য় অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোকে বুঝিয়েছেন যে,

ন কর্ম্মণা মনারম্ভা নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধি গচ্ছতি॥

কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করলে লোক নৈষ্কর্ম্ম প্রাপ্ত হয় না, এবং কর্ম্ম ত্যাগ করলেও সিদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া যায় না। ভগবদ্ বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, করব না ব'লে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করলেও প্রকৃতিজ গুণে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করায় এবং কর্ম্ম ত্যাগ করে মনে বিষয় বাসনা আসাতে মিথ্যাচারীও হ'তে হয়।

শিষ্য। কর্ম্ম যখন প্রকৃত পক্ষে ত্যাগ করা যায় না এবং বাহ্যতঃ ত্যাগ করলেও যখন সিদ্ধি পাওয়া যায় না, তখন মানুষের কর্ত্তব্য কি ?

গুরু। সেই জন্যইত ভগবান গীতার ৩য় অধ্যায়ের ৭ম শ্লোকে বলেছেন যে,

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগ মসক্তঃস বিশিষ্যতে॥

হে অর্জ্জুন। ইন্দ্রিয় সকল মনের দ্বারা নিয়ত (সংযত) করে অনাসক্ত ভাবে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারায় যে কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করে সেই শ্রেষ্ঠ। ভগবদ্বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ এই যে মানুষকে সমস্ত কর্ম্মই অনাসক্ত ভাবে করতে হবে। কারণ, আসক্তিতেই ফল কামনা ও অহংকার আসে। নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম না করলে কখনই চিত্তশুদ্ধি লাভ হয় না। অতএব সকলের নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য।

শিষ্য। গৃহীরা নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ করে ভক্তি এবং জ্ঞান লাভ করবে। তা হ'লে গৃহস্থ ভিন্ন কি অন্যের নিষ্কাম কর্ম্ম হবে না ?

গুরু। না—তা হবে না।

শিষ্য। কেন ? অন্য আশ্রমে গেলে মানুষত বদল হয় না, তবে না হওয়ার কারণ কি ?

গুরু। কারণ, ত্যাগীরা নিষ্কাম কর্ম্মের সকল সুবিধা পান না। গৃহীরা ধন, লোকজন আত্মীয়স্বজন প্রভৃতির দ্বারা নিষ্কাম কর্ম্মের সুবিধা পায়। আর এই সব সুবিধা আছে ব'লেই গৃহীরা নিষ্কাম কর্ম্মযোগের অধিকারী, এবং অন্যান্য কারণেও গৃহীরা নিষ্কাম কর্ম্মের অধিকারী। পরন্তু ত্যাগীর অধিকার অন্যরূপ যার যাতে অধিকার আছে তার তাই করলে তবে কল্যাণ হয়।

শিষ্য। আমি এই বিষয়টা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

গুরু। গৃহীরা মায়াময় সংসার ধর্ম্মে থাকে, সুতরাং স্থূল জগতের মায়াজনিত যাবতীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মই কর্‌তে হয়। এমন কি, জড়দেহ সম্পাদ্য ভোগাদি কাজও বাদ দেবার যো নাই। গৃহীবর্গ কর্ম্মই একমাত্র করণীয়। কর্ম্মই যখন একমাত্র উপায়, তখন সেই কর্ম্ম যাতে কল্যাণ প্রদ হয় গৃহীদের তাই করাই কর্ত্তব্য। সেই জন্য গীতাতে নিষ্কাম কর্ম্মের এত উপদেশ আছে ও প্রশংসাও আছে। পরন্তু ত্যাগীকে অধ্যাত্ম জগতের কর্ত্তব্য সব কর্‌তে হয় ইন্দ্রিয় সংযম ক'রে মনের একাগ্রতা সাধন কর্‌তে হয়।

শিষ্য। আপনি ব'লছেন বটে যে ত্যাগীর নিষ্কাম কর্ম্মের সুবিধা নাই কিন্তু আমার গার্হস্থ্য ধর্ম্ম ভাল লাগে না। কারণ, গৃহস্থদের মধ্যে মিথ্যা প্রবঞ্চনা শঠতা প্রভৃতি দোষগুলি বড্ড বেশী। তাতেই ব'লছিলাম যে সংসার ত্যাগ ক'রে কি আর নিষ্কাম কর্ম্ম হ'তে পারে না?

গুরু। তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ। গার্হস্থ্য ধর্ম্মের প্রতি তোমার বিদ্বেষ জন্মেছে। সেটা কিন্তু ভাল লক্ষণ নয়। কোন আশ্রম, কোন ধর্ম্ম, কোন দেবতা, কোন প্রাণী কি যে কোন বস্তুর প্রতি হিংসা দ্বেষ কর্‌লেই হৃদয় কলুষিত হয়। সুতরাং আত্মার অধোগতি হয়, সেই জন্য হিংসাদিকে পাপ বলে। তুমি এখন থেকে যদি হিংসাদি দোষগুলিকে প্রশ্রয় দাও, তা হ'লে কোন কালেই তোমার চিত্ত শুদ্ধি লাভ হবে না, কাজেই আত্মার অধোগতি হবে। পক্ষান্তরে, তুমি যে ঘোর আসক্তিমান লোক তারও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। কেননা, আসক্তি থেকেই হিংসা, দ্বেষ ও ক্রোধাদি উৎপন্ন হয়।

শিষ্য। আসক্তি থেকে হিংসা, দ্বেষ ও ক্রোধাদি উৎপন্ন হয় এটা বড় আশ্চর্য্য কথা। আসক্তি মানে মনের টান্, তাতে প্রীতিই বাড়বে তা না হ'য়ে ঠিক বিপরীত হচ্ছে?

গুরু। মনে কর কোন একটী জিনিষের প্রতি তোমার আসক্তি আছে, এবং তুমি সেই জিনিষটী দেখ্‌লে আনন্দ পাও ব'লে সর্ব্বদা তাকে দেখ। কিন্তু কোন এক ব্যক্তি ঐ জিনিষটী তোমার দৃষ্টি থেকে তফাৎ ক'রে ফেল্‌লে। এখন তোমার আসক্তির স্রোত যেমন প্রতিহত হ'লো, আর অম্‌নি সেই ব্যক্তির উপর তোমার হিংসা দ্বেষ, ক্রোধাদি উৎপন্ন হবে।

শিষ্য। হাঁ, তা কতকটা হয় বটে, কিন্তু এ বিষয়টা তেমন নয়। আমি গৃহস্থদের মধ্যে মিথ্যা প্রবঞ্চনাদি দোষগুলি স্বচক্ষে দেখেছি ব'লেই ব'ল্‌ছি।

গুরু। বেশ কথা। আচ্ছা, বল দেখি তুমি যে দলে এসেছ সেই সাধুর কি দশা? বোধ হয় তুমি তা জান না। আমি বহুদিন ধ'রে বহু সাধুর সঙ্গে মিশেছি, বহু সাধুর সঙ্গে দীর্ঘকাল ধ'রে বাস করেছি। কাজেই তাঁদের আচার, ব্যবহার, বিদ্যা, বুদ্ধি ও জ্ঞান সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাও লাভ ক'রেছি। উপসংহারে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, সাধু শ্রেণীর মধ্যে সাধু বেশধারী অসাধুরা যে সকল প্রবঞ্চনা বিশ্বাস-ঘাতকতা প্রভৃতি পাপাচরণ করে, গৃহীরা তা স্বপ্নেও কখন কল্পনা কর্‌তে পারে না।

শিষ্য। আপনি বলেন কি। সাধুর মধ্যে এমন।!

গুরু। তবে সাধে কি আর ভগবান শঙ্করাচার্য্য ব'লেছেন যে, "উদর নিমিত্তং বহু কৃত বেশঃ।"

শিষ্য। গার্হস্থ্য ধর্ম্মের তত্ত্বটা আমায় ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিন। আমি না জেনে বড় অন্যায় কথা ব'লেছি।

গুরু। গৃহস্থাশ্রমই সকল লোকের একমাত্র আশ্রয় সেই জন্য গৃহস্থকে জ্যেষ্ঠাশ্রমী বলে।

শিষ্য। কথাটা আমি ভাল ক'রে বুঝতে পারলাম না।

গুরু। আমাদের সনাতন ধর্ম্মে চারিটী আশ্রম আছে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। তার মধ্যে এক গৃহস্থাশ্রমই শ্রেষ্ঠ। কেন না, আর তিনটী আশ্রমবাসীই এক গৃহস্থের দ্বারায় প্রতিপালিত হন। পক্ষান্তরে, ইহাও দেখা যায় যে, গৃহস্থাশ্রম অপর তিনটী আশ্রমের বুনিয়াদ স্বরূপ। কারণ, যে কোন মহাত্মা হ'ন না কেন, সকলেই গৃহস্থাশ্রমে থেকে আশ্রমোচিত কর্ম্মের দ্বারা মহান্ অবস্থা প্রাপ্ত হ'য়েছেন। গৃহস্থাশ্রম যখন বুনেদ স্বরূপ হচ্ছে, তখন বুনেদ্ না গেঁথে কি আর অন্যান্য আশ্রমের দালান গাঁথা চলে? অতএব সংসারে থেকে নিষ্কাম ভাবে আশ্রমোচিত কর্ম্ম করতে থাক্‌লে, ক্রমে চিত্ত শুদ্ধি লাভ হয়, এবং সময়ে ভক্তি লাভ ক'রে তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারীও হওয়া যায়। তখন আপনিই একটার পর আর একটা আশ্রম ছাড়িয়ে যায়। তা না ক'রে, স্ত্রী পুত্র ঘর বাড়ী আত্মীয়স্বজন সব ত্যাগ ক'রে সবাই সন্ন্যাসী হ'য়ে যাক এটা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়। কেন না, তাহলে সংসার লোপ পায়। সংসার ত্যাগের জন্য কাওকে স্বতন্ত্র ভাবে চেষ্টা করতে হয় না। অর্থাৎ শলা পরামর্শ কি কোন বন্দোবস্ত করতে হয় না। যখন যে ব্যক্তির পূর্ণ বৈরাগ্য আসে তখন তার সংসার আপনিই ত্যাগ হয়; এবং পরবর্ত্তী আশ্রমোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্মের জ্ঞান লাভও হয়, পরে তদনুসারে সাধন করলে সিদ্ধিলাভও হ'য়ে থাকে।

শিষ্য। এখন কোন উপদেশ মত চল্‌লে সংসারে অনাসক্ত হয়ে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়? সেইটী আমাকে বলুন।

গুরু। কেন? ভগবদ্গীতার উপদেশানুসারে চল্‌লে নিশ্চয়ই সংসারে আসক্তি থাক্‌বে না। অতএব সকলেরই সর্ব্বতোভাবে গীতোক্ত উপদেশ মত চলা উচিত।

শিষ্য। কেন? অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থের উপদেশ মত চল্‌লে সংসারে অনাসক্ত হবে না তার মানে কি?

গুরু। তার মানে এই যে, এখনকার মানুষ স্বল্পায়ু রোগযুক্ত, অলস ও স্বেচ্ছাচারী এবং ভ্রম প্রমাদাদি তমোগুণ প্রধান, কাজেই সে রকম লোকের দ্বারা মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য পালন হওয়া এক রকম অসম্ভব, সুতরাং লোকের অধোগতির সম্ভাবনা। তাই দয়ার সাগর ভগবান অর্জ্জুনকে উপলক্ষ ক'রে, সংসারী ও ত্যাগী যাবতীয় লোকের উদ্ধারের উপায়, অধিকারী ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রকমে অপেক্ষাকৃত সহজ সাধ্যভাবে গীতায় নির্দ্দেশ ক'রেছেন।

শিষ্য। তা হ'লে গীতা ত লোকের পরম কল্যাণকর পদার্থ দেখ্‌ছি।

গুরু। তাত নিশ্চয়ই। গীতা কে এবং কি উদ্দেশ্যে ব'লেছেন তা জান?

শিষ্য। গীতা কি উদ্দেশ্যে ব'লেছেন তা জানি না তবে কে ব'লেছেন তা জানি। শ্রীকৃষ্ণ ব'লেছেন।

গুরু। না—শ্রীকৃষ্ণ হ'য়ে অর্থাৎ বাসুদেব কি দেবকীনন্দন হ'য়ে গীতা বলেন নি, গীতা বল্‌বার সময় যোগাবলম্বন ক'রে পূর্ণ যোগেশ্বর সর্ব্বব্যাপী অবিনাশী পরব্রহ্মস্বরূপ হ'য়ে ব'লেছেন। কাজেই গীতা বড় মিষ্টি, চিত্তাকর্ষক ও কল্যাণকর। গীতার অনাদর কেও করে না। পরমাত্মার কথিত না হ'লে কি আর এমন হয়?

শিষ্য। এখন শ্রীকৃষ্ণ যে অবিনাশী পরব্রহ্মস্বরূপ হ'য়ে গীতা ব'লেছেন তা জানা যায় কিসে?

গুরু। মহাভারতের অনুগীতা পর্ব্বাধ্যায়ে সে বিষয়ের উল্লেখ আছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হ'লে শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থে বাসকালীন একদিন বিকালবেলায় সভামণ্ডপে বেড়াতে বেড়াতে ভগবান দ্বারকায় যাবেন এই

কথা অর্জ্জুনকে বলায়, অর্জ্জুন ভগবানকে বল্লেন যে, সখা! আমার মোহ দূর করবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে যে সমস্ত উপদেশ দিয়েছিলে, আমি তার অনেক ভুলে গিয়েছি, পুনরায় আমি সেই সব উপদেশ শুনতে ইচ্ছা করি, অতএব আমায় আবার তাই বল। ভগবান সেই কথা শুনে অর্জ্জুনকে মিষ্ট ভর্ৎসনা ক'রে ব'ল্লেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে আমি যোগাবলম্বন ক'রে তোমাকে উপদেশ দিয়েছিলাম, সুতরাং সে সব কথা এখন আর হবে না। তবে এখন আমি যা বলি তা শোন তাতেও তোমার মুক্তি হবে ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণ হ'য়ে যে গীতা বলেননি গীতাতেই তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় দূরে খুঁজবার দরকার নাই। গীতার ১০ম অধ্যায়ের বিভূতিযোগে ভগবান যা ব'লেছেন, আমি তা থেকে তোমাকে কিছু বলি শোন। ভগবান বলছেন যে, "অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিত।" হে অর্জ্জুন। আমি সর্ব্বভূতে আত্মারূপে অবস্থান ক'র্‌ছি।

"অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ" আমি ভূতগণের আদি মধ্য ও অন্ত, অর্থাৎ সৃষ্টিস্থিতি ও প্রলয়ের কারণ। "আদিত্যানামহং বিষ্ণু। আদিত্যগণের মধ্যে অর্থাৎ দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে আমি বিষ্ণু। রুদ্রাণাং শঙ্কর শ্চাস্মি। রুদ্রগণের মধ্যে অর্থাৎ একাদশ রুদ্রের মধ্যে আমি শঙ্কর 'রাম শস্ত্র ভূতামহম্।" শস্ত্রধারীগণের মধ্যে অর্থাৎ যোদ্ধাদের মধ্যে আমি রামচন্দ্র। "বৃষ্ণীণাং বাসুদেবোঽস্মি" বৃষ্ণী বংশ অর্থাৎ যদুবংশের মধ্যে আমি বসুদেব নন্দন শ্রীকৃষ্ণ। এখন বিচার ক'রে দেখ। ভগবান ব'লছেন যে, আমি ভূতগণের আত্মা, আমি ভূতগণের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ, আমি বিষ্ণু, আমি শঙ্কর এবং রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ যে অবতার তাও আমি। যদি শ্রীকৃষ্ণ হ'য়ে গীতা ব'লতেন তা হ'লে তিনিই যে বসুদেব নন্দন শ্রীকৃষ্ণ সে কথা আর ব'লতেন না। তিনি শ্রীকৃষ্ণ ত আছেনই, অর্জ্জুন ত তা জানেই, তবে আবার আমি বসুদেব নন্দন শ্রীকৃষ্ণ এ পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন

কি? প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন এই যে, শ্রীকৃষ্ণ সেই সময়ে যোগাবলম্বন করতঃ পরব্রহ্মের স্বরূপ হ'য়ে গীতা ব'লেছেন, কাজেই ব'ল্‌ছেন যে তিনিই শ্রীকৃষ্ণ।

শিষ্য। আমি একটা বিষয় এই ভাবছি যে, ভগবান যুদ্ধক্ষেত্রে এরূপ ভাবে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ দিলেন কেন? এই উপদেশে দেখছি মানুষের হিতংকর কোন উপদেশই বাদ পড়েনি দেখছি।

গুরু। সকল বিষয়ের তাৎপর্য্যার্থ অর্থাৎ মৎলব বুঝ্‌তে চেষ্টা ক'র্‌তে হয়, তাহ'লে আসল তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হয়। অর্জ্জুনের শোক ভগবান ইচ্ছাতেই দূর কর্‌তে পারতেন। তা না ক'রে, অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য ক'রে সংসারে সকল শ্রেণীর লোকেরই ভব-যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হওয়ার উপায়, শাস্ত্র সকল মন্থন ক'রে এবং তার সঙ্গে নিজের মত মিলিয়ে অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য ভাবে উপদেশ দিয়েছেন কেন? কারণ, জগতের সকল লোকেরই কল্যাণের জন্য গীতার ঐ সব উপদেশ দিয়েছেন, কেবল একলা অর্জ্জুনের জন্য নয়।

শিষ্য। আমার মনে একটা সংশয় এই হচ্ছে যে, ভগবান গীতাতে সব শাস্ত্র বচনইত ব'লেছেন, এবং সে সব শাস্ত্র গ্রন্থও আছে, তখন আবার সে বিষয় গীতায় আলাদা ক'রে বল্‌বার কি প্রয়োজন।

গুরু। প্রয়োজন এই যে, ঈশ্বর লীলার জন্য জীবকে মায়াময় অশেষ যন্ত্রণাদায়ক সংসারে পাঠিয়েছেন বটে, কিন্তু তিনি বড়ই দয়ালু, তাতেই আবার দয়া ক'রে সেই অশেষ যন্ত্রণা থেকে মহাপাতকীরও উদ্ধারের উপায় গীতায় নির্দ্দেশ ক'রে দিয়েছেন।

শিষ্য। ভগবান কেন যে গীতা ব'লেছেন তা বুঝ্‌লাম। কিন্তু আর একটা সংশয় এই হচ্ছে যে, ঈশ্বর দয়াময়, সেই দয়া হেতুই তিনি জীবের কেবল কল্যাণ কামনাই ক'রে থাকেন, এবং সেই কল্যাণের

জন্যই তিনি গীতা ব'লেছেন আপনি ব'ল'ছেন। গীতাত প্রায় চার হাজার বছর হ'ল ব'লেছেন, কিন্তু মানুষত সেই সনাতন কাল থেকেই আছে তা হ'লে এর আগে ভগবান জীবের কল্যাণের জন্য কোন দয়াপ্রকাশ করেননি কেন?

গুরু। হাঁ, সকল যুগেই ভগবান কোন না কোন অবতাররূপে অবতীর্ণ হ'য়ে জীবের কল্যাণকর উপদেশ সকল দিয়েছেন। যেমন সত্য যুগে কপিলমুনি সাংখ্য যোগ ব'লেছেন। ত্রেতাযুগে রাম অবতারেও যোগবাশিষ্ঠের সৃষ্টি ক'রেছেন, কিন্তু তাতে তেমন না হওয়াতেই কৃষ্ণাবতারে আবার এই গীতার সৃষ্টি ক'রেছেন।

শিষ্য। রাম অবতারে যোগবাশিষ্ঠের সৃষ্টি কি ক'রে ক'রলেন, কিন্তু তাতে তেমন ফল না হওয়াতে কৃষ্ণাবতারে আবার গীতার সৃষ্টি ক'রলেন, এ বিষয় ভেঙ্গে না বল্লে আমি কিন্তু বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

গুরু। ভগবান রামচন্দ্র যৌবনের প্রারম্ভে তীর্থ পর্য্যটনে যান, কিন্তু যখন তীর্থ পর্য্যটন ক'রে অযোধ্যায় ফিরে এলেন, তখন তাঁর মনে বৈরাগ্য জন্মেছে। তিনি আহার বিহার, বসন ভূষণ সব ত্যাগ ক'রে বিমনা হ'য়ে প'ড়ে প'ড়ে অনুক্ষণ এই চিন্তা ক'রতে লাগলেন যে, সংসার সমস্তই মিথ্যা এবং মনে অহরহ এই বিচার করাতে, ক্রমে যাবতীয় পার্থিব পদার্থের প্রতি অনাসক্ত হ'য়ে তীব্র বৈরাগ্য প্রাপ্ত হ'লেন। এখন আহার ত্যাগ করাতে শরীর ক্রমে শীর্ণ হ'য়ে এল এবং চেহারাও খারাপ হয়ে গেল। ইতিমধ্যে একদিন বিশ্বামিত্র ঋষি মহারাজ দশরথের নিকট উপস্থিত হ'লেন। কারণ, রামচন্দ্রকে নিয়ে গিয়ে তাঁর যজ্ঞের অনিষ্টকারী রাক্ষস গুলাকে বধ করাবেন। তিনি নিজেই সমস্ত রাক্ষস সংহার করতে পারতেন, কিন্তু তা হ'লে তাকে ক্রোধের বশবর্ত্তী হ'তে হয়, সুতরাং তাতে তাঁর তপ নষ্ট হবে, কাজেই রামচন্দ্রের দ্বারায় বধ করাবেন। তার পর

মহারাজের আজ্ঞানুসারে রামচন্দ্র রাজসভায় আনীত হ'লে তাঁর শরীরের শীর্ণাবস্থা দেখে সভাস্থ সকলে অবাক্ হ'লেন। কারণ জিজ্ঞাসিত হ'লে রামচন্দ্র তার এই উত্তর দিলেন যে, সংসারের সমস্তই মিথ্যা ব'লে যাবতীয় পার্থিব পদার্থের প্রতি আমার কিছুমাত্র প্রীতি নাই, এবং সেই জন্য আমি আহার বিহার সমস্তই ত্যাগ করেছি। এই কথা শুনে বিশ্বামিত্র ঋষি সভাস্থ বশিষ্ঠদেবকে বল্লেন যে, তুমি থাক্‌তে রামচন্দ্রের এমন অবস্থা হয়েছে? রামচন্দ্রের জ্ঞান-ভাণ্ডার পূর্ণ আছে, কিন্তু তাহা বন্ধ আছে, তুমি কেবল চাবিটী খু'লে দিবে। তখন বশিষ্ঠদেব বিশ্বামিত্র ঋষির কথায় রামচন্দ্রকে জ্ঞানোপদেশ দিতে স্বীকৃত হ'লেন। এত-দুপলক্ষে যোগবাশিষ্ঠের সৃষ্টি হ'ল। রামচন্দ্র নিজে অজ্ঞান সেজে বশিষ্ঠদেবের নিকট জ্ঞানোপদেশ নিলেন। এখন ভেবে দেখ, যে রাম-চন্দ্র ঈশ্বরের অবতার পূর্ণ জ্ঞানের আধার, তিনি কখন অজ্ঞান হ'তে পারেন? তাছাড়া, রামচন্দ্র বশিষ্ঠদেবকে যে সকল প্রশ্ন ক'রেছেন, অজ্ঞান লোকের হৃদয়ে সে সব প্রশ্ন উদয় হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নাই। ঘটনাটীত এই রকম, কিন্তু ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে, ঈশ্বর দয়াল, জীবের কল্যাণের জন্য সততই চেষ্টিত আছেন, সেই জন্য স্বয়ং পূর্ণ জ্ঞানময় হ'য়েও, সংসারী মায়াবদ্ধ অজ্ঞান লোকের উদ্ধারের জন্য নিজে অজ্ঞান শিষ্য সেজে গুরু বশিষ্ঠদেবের নিকট তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ নিয়েছেন। কেন না লোকে সেই সব উপদেশ মত চল্‌লেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ ক'রে যমযন্ত্রণার হাত থেকে এড়াবে। ত্রেতাযুগে রাম অবতারের সময় যোগবাশিষ্ঠের সৃষ্টি হয়েছে। ভগবান দেখ্‌লেন যে, এই সুদর্ঘ কালেও লোকে যোগবাশিষ্ঠ কথিত অদ্বৈতজ্ঞান সহজে উপলব্ধি কর্‌তে পার্‌ল না। সেইজন্য অদ্বৈত-জ্ঞানী কদাচিৎ মেলে। অদ্বৈত জ্ঞানটী অতীব দুর্বোধ্য ও বাহ্যিক নীরস ব'লে সাধারণ লোকের

তেমন রুচিকর নয়। পরন্তু পরম দয়াল পরমেশ্বরের দয়ার বিরাম নাই। তাতেই আবার সাধারণ লোকেরও রুচিকর হবে ব'লে, আপনি স্বয়ং গুরু সেজে অর্জ্জুনকে শিষ্য সাজিয়ে আপামর সাধারণ লোকের ভক্তি ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ ক'রে ভব যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায়, অধিকারী ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রকমে গীতায় ব'লে দিয়েছেন। ফলতঃ কোন শ্রেণীর লোকই বঞ্চিত হয় নি।

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ তা বটে, কিন্তু একটা কথা এই যে, ভগবান শাস্ত্র বাক্য সকল যখন গীতাতে ব'লেছেন তখন সেই সকল শাস্ত্রোক্ত, উপদেশ ও গীতোক্ত উপদেশের ফলের তারতম্য হওয়ার কারণ কি?

গুরু। তার কারণ, শাস্ত্রে লোকের কল্যাণের জন্য অনেক রাস্তার উল্লেখ আছে। কেননা, ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোক স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে আপন আপন অনুকূল রাস্তা অবলম্বন কর্‌বে। পরন্তু সাধারণ লোকে আপনার অনুকূল রাস্তা ঠিক্ ক'রে নিতে পারে না; সুতরাং বেঠিক রাস্তায় যাওয়াতে ফলও পায় না। সেইজন্য কোন্ রাস্তা কোন্ অধিকারীর পক্ষে কল্যাণপ্রদ হবে, ভগবান তা গীতায় ঠিক ক'রে ব'লে দিয়েছেন। কেননা, সন্তানের কিসে কল্যাণ হবে তা পিতাই ভাল জানেন। এই কারণবশতঃ শাস্ত্রোক্ত উপদেশ ও গীতোক্ত উপদেশের ফলের তারতম্য।

শিষ্য। আমি বিষয়টী পরিষ্কার রূপে বুঝ্‌তে পারলাম না।

গুরু। যেমন অনেক ডাক্তার আছেন, তাঁরা রুগীর ব্যবস্থাপত্রে একটী রোগের জন্য অনেকগুলি ওষুধ লেখেন, অর্থাৎ সেই রোগটী প্রতিকারের যতগুলি ওষুধ তাঁদের জানা থাকে তার সব কয়টিই লেখেন, উদ্দেশ্য যেটীতে ফল পাওয়া যায়। কিন্তু বহুদর্শী বিজ্ঞ ডাক্তারেরা একটী রোগের জন্য একটী ওষুধেরই ব্যবস্থা করেন, কারণ, তাঁরা ঠিক

জানেন যে, এই রোগ এই ওষুধেই সারবে। শাস্ত্রকারেরা একটী সিদ্ধিলাভের জন্য অনেক রকম পদ্ধতি ব'লেছেন, তার মানে অধিকার ভেদে যার যেটী অনুকূল হবে সে সেইটীই অবলম্বন করবে। লোকে ঠিক না করতে পেরে প্রতিকূল পদ্ধতি অবলম্বন করে, কাজেই ফল পায় না। ভগবান অধিকারী ভেদে একটী সিদ্ধিলাভের জন্য এক রকম অনুকূল পদ্ধতিই নির্দ্দেশ করেছেন। কাজেই তার ফল অব্যর্থ। ভগবান অভ্রান্ত, সর্ব্বজ্ঞ, অভিজ্ঞ চিকিৎসক, সুতরাং তাঁর কথিত গীতা-রূপ ব্যবস্থাপত্রের ওষুধে ভবরোগ নিশ্চয়ই সারবে।

শিষ্য। যে যেমন অধিকারী তাকে যে তদনুকূল উপদেশ ভগবান গীতায় দিয়েছেন সেইটা শোনবার জন্য আমার বড় কৌতূহল হচ্ছে, আপনি অনুগ্রহ ক'রে তারই কিছু বলুন।

গুরু। গীতার অনেক স্থানেই সে রকম উপদেশ দিয়েছেন। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের ৮ম্ শ্লোকে ব'লছেন যে,

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়॥

হে অর্জ্জুন। তুমি আমাতেই চিত্ত স্থাপিত কর ও বুদ্ধি সন্নিবেশিত কর, তাহ'লে পরলোকে আমাতেই বাস করিবে, অর্থাৎ মুক্তি পাবে তাতে কোন সংশয় নাই। যদি তা-করতে না পার, অর্থাৎ তার অধিকারী না হও, তাহলে যে কি সাধনা করতে হবে তাই ৯ম্ শ্লোকে ব'লছেন যে,

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোসি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাস যোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥

হে ধনঞ্জয়। যদি আমার প্রতি চিত্ত স্থির রাখতে না পার, তাহ'লে

আমার স্মরণ অভ্যাস যোগ দ্বারা আমাকে পেতে ইচ্ছা কর। যদি তা না করতে পার, অর্থাৎ তার অধিকারী না হও, তাহ'লে যে কি সাধনা করতে হবে তা ১০ম শ্লোকে বল'ছেন যে,

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোসি মৎ কর্ম্ম পর মো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বণ সিদ্ধি মব্যপস্যসি॥

হে অর্জ্জুন। যদি তুমি আমার স্মরণ রূপ অভ্যাসে অসমর্থ হও, তাহ'লে আমার প্রীতি সাধনার্থ পরহিতকর সব মঙ্গল কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। আমার প্রীতার্থে কর্ম্মের দ্বারায় তুমি সিদ্ধিলাভ করবে অর্থাৎ আমাকে পাবে। যদি তাও করতে না পার, অর্থাৎ তারও অধিকারী না হও, তাহলে যে কি সাধনা করতে হবে, তা ১১শ শ্লোকে বলেছেন যে,

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদযোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্ব কর্থ ফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥

হে অর্জ্জুন! যদি তুমি এতেও অশক্ত হও, অর্থাৎ অনধিকারী হও, তাহলে একমাত্র আমারই স্মরণাপন্ন হয়ে সংযত চিত্তে কর্ম্মফল সব ত্যাগ কর। কেন যে কর্ম্মফল ত্যাগ করতে বলছেন, দ্বাদশ শ্লোকে তার কারণও বলছেন যে,

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্ জ্ঞানদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাসাচ্ছান্তিরনন্তরম্।

হে অর্জ্জুন! বিবেক অর্থাৎ জ্ঞানরহিত অভ্যাস অপেক্ষা পরোক্ষ অর্থাৎ সহ জ্ঞান শ্রেষ্ঠ। এইরূপ জ্ঞান অপেক্ষা অর্থ বোধক (হৃদয়ে ধ্যেয় বস্তুর ভাব ধারণ ক'রে) ধ্যান শ্রেষ্ঠ, এবং সেই ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্মফল
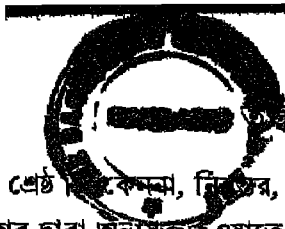
ত্যাগ শ্রেষ্ঠ [illegible] কেননা, নিরন্তর, ত্যাগ জনিত শান্তি উপভোগ হয়। কারণ, ত্যাগেব দ্বাবা অনাসক্ত হওয়াতে মনটী সর্ব্বদা শান্তিতে পূর্ণ থাকে। এখন ভেবে দেখ, অধিকাবী ভেদে ভগবান কেমন সব উপায় ব'ললেন। বাস্তবিক কোন ব্যক্তি কোন একটী কাজেব অধিকাবী না হ'য়ে যদি সে কাজটী করতে যায়, তা হ'লে তার দ্বাবা কখনই সেই কাজটী সুসম্পন্ন হয় না। এখন গীতায় অধিকাবী ভেদে ভিন্ন ভিন্ন উপায় বিধিমতে দেখান আছে ব'লে, অন্যান্য শাস্ত্রাপেক্ষা গীতাব ফল বেশী।

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ, এখন আমি বুঝ্‌লাম যে গীতা সর্ব্বোপরি। আচ্ছা, অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ মধ্যে কোন্ গ্রন্থ শ্রেষ্ঠ?

গুরু। অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ মধ্যে বেদান্ত শ্রেষ্ঠ। সিংহ যেমন পশুর মধ্যে রাজা বেদান্তও তেমান শাস্ত্রগ্রন্থ মধ্যে রাজা। একটা বচন আছে যে,

তাবদ্ গর্জ্জন্তি শাস্ত্রানি জম্বুকাঃ বিপিনে যথা।
নগর্জ্জতি মহা শক্তি যাবদ্ বেদান্ত কেশবী॥

যাবদ্ বেদান্ত কেশবী (সিংহ) না গর্জ্জায়, তাবৎ জঙ্গলেব শৃগালের ন্যায় অন্যান্য শাস্ত্র চাৎকাব করে। অর্থাৎ বেদান্তালাপ আরম্ভ হ'লে অন্যান্য শাস্ত্রালাপ সবতল পড়ে যায়।

শিষ্য। আপনি যে বল্‌ছেন গীতা পড়লে জ্ঞান লাভ হয়, তবে অনেক পণ্ডিতের তা হয় না কেন? পণ্ডিতেরা শাস্ত্রগ্রন্থ সব পড়েন, গীতাও অবশ্য পড়েন, কিন্তু তাঁদেব ব্যবহাব সাধারণ অজ্ঞান লোকের মত হয় কেন?

গুরু। পণ্ডিতদের সাধারণ অজ্ঞান লোকের মত ব্যবহাব কি দেখ্‌লে?

শিষ্য। সাধারণ অজ্ঞান লোক যেমন দম্ভ, অহঙ্কার ও ক্রোধাদির

বশ হ'য়ে থাকে, পণ্ডিত্‌দেরও সেই অবস্থা দেখ্‌তে পাই। তাঁদের মধ্যে যখন এক জনকে হারিয়ে দিয়ে আর এক জন বড হবার চেষ্টা করেন, এবং রাগে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হ'য়ে উন্মত্তাবস্থা প্রাপ্ত হন; তখন আর সাধারণ লোকের মত হ'লেন্ নাত কি ?

গুরু। পণ্ডিত দুই শ্রেণীব আছেন। এক শ্রেণী শাস্ত্রগ্রন্থ পড়েন ও শাস্ত্রোক্ত উপদেশ মত সাধনাও করেন। আর এক শ্রেণীব পণ্ডিত আছেন, তাঁরা কেবল শাস্ত্রগ্রন্থই পডেন, কোন সাধনা কবেন না। যিনি সাধক পণ্ডিত তাঁর অপরোক্ষানুভূতি আসে, অর্থাৎ অনুভব জ্ঞান লাভ হয় ব'লে আসল তত্ত্ব বোধগম্য হয়। কাজেই রিপুগণ আর মাথা তুল্‌তে পারে না, সুতরাং তাঁরা শান্ত হন্। আর যাঁরা কোন সাধনা না করে কেবল শাস্ত্রগ্রন্থই পড়েন, তাঁদের কেবল শাস্ত্র কথিত ভাষাতেই ব্যুৎপত্তি জন্মে, অর্থাৎ শব্দজ্ঞান হয় বস্তুজ্ঞান হয় না। কাজেই আসল তত্ত্ব কিছুই বোধে আসে না এবং চিত্ত শুদ্ধি লাভও হয় না। সুতরাং রিপু আদিও সংযত হয় না। এখন ঐ অসংযত রিপু আদির বশবর্ত্তী হ'য়েই তর্ক বিচারাদি করেন ব'লে ঐ বকম দশা প্রাপ্ত হন, এবং অশান্তিও ভোগ করেন।

শিষ্য। শাস্ত্র প'ড়ে একটা জ্ঞান ত হয়, তবে তাঁবা এমন হন্ কেন ?

গুরু। যাঁবা কোনরূপ সাধনা না ক'রে কেবল শাস্ত্র কথিত শব্দার্থের ব্যুৎপত্তিই লাভ করেন, তাঁরা এই মুস্কিলে পড়েন যে, তাঁদের অধীত সকল শাস্ত্রের সকল মত গুলিই হৃদয়ে স্ব স্ব প্রাধান্য বিস্তাব করে। সুতরাং স্থির সিদ্ধান্তের অভাব হেতু তাঁবা নানা বুদ্ধিবিশিষ্ট হন, এবং অসংযত রিপু আদির বশ হ'য়ে তর্ক বিতর্ক কর্‌তে কর্‌তে উন্মত্তাবস্থা প্রাপ্ত হন। তার ফল শেষে এই দাঁড়ায় যে, বিচার্য্য অথবা জ্ঞাতব্য আসল বিষয়টি ভুল্ প'ড়ে গিয়ে তর্ক বিতর্কের স্রোত চল্‌তে থাকে। দম্ভ,

অহঙ্কার ও ক্রোধাদির বড় বড় ঢেউ উঠে উভয় পক্ষকে নাকানি চুপানি খাওয়ায়। পক্ষদের মধ্যে যিনি সেই সব ঢেউ খেতে অপটু তিনি পিছিয়ে পড়েন, আর যিনি পটু তিনি কোমর বেঁধে লেগে যান।

শিষ্য। বিচার্য্য বিষয়ের আখির মীমাংসা কি হয়?

গুরু। আখির মীমাংসা যা হয় তা শোন। কোন একটী তত্ত্বের মীমাসাব জন্য বিচার আরম্ভ ক'রে শেষে কেবল অশান্তিই ভোগ হয় এবং আত্মাবও অবনতি হয়। কারণ, তার্কিকগণকে তর্ক বিতর্কের স্রোতে আসল তত্ত্ব থেকে অনেক দূরে টেনে নিয়ে গিয়ে, শেষে অশান্তির সমুদ্রে ফেলে দেয়।

শিষ্য। যুক্তি তর্কের দ্বারা আসল তত্ত্বের অর্থাৎ ভগবদ্ তত্ত্বের মীমাংসা কি হয় না?

গুরু। আজ থাক্ আবার কা'ল হবে।

দ্বিতীয় দিন।

গুরু। না—যুক্তি তর্কের দ্বারা ভগবদ্‌তত্ত্বের মীমাংসা হ'তে পারে না। সাধনার দ্বারা মনকে প্রকৃতির গণ্ডির (সীমানার) বাইরে না নিয়ে যেতে পার্‌লে, অর্থাৎ মায়ামুক্ত না হ'তে পার্‌লে, সে তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হয় না। কেন না, জীবগণ মায়ার দ্বারায় আবৃত আছে, এবং সেই জন্যই সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাও আমাদের অদৃশ্য হ'য়ে আছেন। ভগবান গীতার ৭ম অধ্যায়ের ২৫শ শ্লোকে তাই ব'লেছেন যে,

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ।
মূঢোঽয় নাভি জানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্‌॥

আমি আমার যোগমায়ার দ্বারা সমাবৃত আছি ব'লে মায়াবদ্ধ লোকের নিকট প্রকাশিত নই। সেই জন্য মায়া মূঢ় লোকেরা আমাকে অজ এবং অব্যয় ব'লে জান্‌তে পারে না। তার মানে এই যে জীবগণ প্রকৃতির অধীনে তন্মায়া প্রভাবে মুহ্যমান হ'য়ে আছে। বিচার, তর্ক, যুক্তি প্রভৃতি প্রকৃতির সীমানার মধ্যে, কাজেই ঐ সব যুক্ত্যাদি লৌকিক অর্থাৎ সাংসারিক জ্ঞানানুসারেই মীমাংসিত হ'য়ে থাকে। পরন্তু সাধনার দ্বারা অপরোক্ষানুভূতির সাহায্যে ঈশ্বরকে জান্‌তে পারা যায়।

লোকে সাংসারিক জ্ঞান সম্পন্ন হ'য়ে তদনুকরণে বৃথা কচকচানি করলে কি হবে? সেই জন্যে শাস্ত্রে একটা বচন আছে যে,

অচিন্ত্য খলু যে ভাবান্‌ তাংস্তর্কেন যোজয়েত।
প্রকৃতিভ্য পর যচ্চ তদাচিন্তস্য লক্ষণম্‌॥

যে ভাব চিন্তা কর্‌তেও পারা যায় না এবং যা (যে ভাব) প্রকৃতির বাইরে, তা নিয়ে তর্ক কর্‌তে নাই। সাধনার দ্বারা গুণাতীত অবস্থা লাভ ক'রে, অপরোক্ষানুভূতির (অনুভব জ্ঞানের) সাহায্যে তাঁকে যতদূর জানা যায় তত দূরই জানা যায়। ঈশ্বরকে জানবার আর অন্য উপায় নাই। শুধু মুখের কথায় জানা যাবে না, অর্থাৎ বই পড়লে হবে না খাটতে হবে।

শিষ্য। অপরোক্ষানুভূতি ভিন্ন ঈশ্বরকে জানা যাবে না তার কারণ কি, এবং লৌকিক ও অলৌকিক জ্ঞানেরই বা মানে কি?

গুরু। ঈশ্বর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল বিষয় নন্। তিনি সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মাবস্থায় সমগ্র বিশ্ব ব্যেপে অবস্থান ক'রছেন, সুতরাং তাঁকে দেখ্‌তে ধর্‌তে ছুঁতে কিছুতেই পাওয়া যায় না। কাজেই অপরোক্ষানুভূতি ভিন্ন তাঁকে জানবার আর অন্য উপায় নাই। সাংসারিক লোক স্থূল জগৎ সম্বন্ধে দেখে শুনে বা পড়ে, যে জ্ঞান লাভ করে তা লৌকিক জ্ঞান। আর সমদমাদি গুণগুলিকে আয়ত্ত করে সাধনার দ্বারা গুণাতীত হ'য়ে অধ্যাত্ম জগৎ অর্থাৎ আত্মা সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ হয় তাই অলৌকিক জ্ঞান বা অপরোক্ষানুভূতি। সুতরাং কেবল শাস্ত্র প'ড়ে ঈশ্বরকে জানা যায় না, কারণ, এইটী বহির্মুখীন বিদ্যা, তিনি কেবল সাধনায় অর্থাৎ অন্তর্মুখীন বিদ্যায় জ্ঞাতব্য। সেই জন্য ভগবান গীতার ২য় অধ্যায়ের ৪৫শ শ্লোকে ব'লেছেন যে,

ত্রৈগুণ্য বিষযাবেদা নিস্ত্রৈগুণ্য ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্য সত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান॥

হে অর্জ্জুন! বেদ সকল ত্রৈগুণ্য বিষয়ক। তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য হও, অর্থাৎ নির্দ্বন্দ্বো; নিত্য সত্ত্বস্থ, যোগ ক্ষেম রহিত ও আত্মবান হও। এরকম হ'তে বল্‌ছেন কেন? কেন না, নিষ্কাম কর্ম্মজনিত চিত্তশুদ্ধি লাভ ক'রে সাধনার দ্বারা তবে গুণাতীত অর্থাৎ মায়াতীত হ'তে হবে

তাহলে তখন ঈশ্বরকে জান্‌তে পারা যাবে। এখন ভগবদ বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ বুঝ্‌তে চেষ্টা করা যাক। ত্রৈগুণ্য বিষয় কি? সত্ত্ব রজস্তম এই তিনটী গুণ, এবং এই তিনটী গুণের সমষ্টির নাম ত্রৈগুণ্য, যার মধ্যে সেই সমষ্টি দেখা যায় তাই ত্রৈগুণ্য বিষয়, আর ত্রৈগুণ্য বিষয়ের কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্যের ব্যবস্থা যাতে আছে তাই ত্রৈগুণ্য বিষয়ক। এখন এই তিন গুণের সমষ্টি কোথায় দেখা যায়? সংসারে সেই জন্য সংসার ত্রৈগুণ্য বিষয়। সেই সংসারের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের ব্যবস্থা বেদে আছে ব'লে বেদ সকল ত্রৈগুণ্য বিষয়ক। তার মানে এই যে সাংসারিক ক্রিয়াকলাপ বেদানুসারেই হ'য়ে থাকে। অবশ্য এটা বেদের কাম্য কর্ম্ম সম্বন্ধে কথা হচ্ছে। ভগবান বল্‌ছেন যে, হে অর্জ্জুন! তুমি বেদবিহিত কর্ম্মকাণ্ডানু-সারে সকাম কর্ম্ম না ক'রে, নিষ্কাম কর্ম্মী হও, এবং গুণাতীত অর্থাৎ মায়াতীত হও। ভগবান বল্‌ছেন যে, সাংসারিক জ্ঞানানুসারে আমাকে জানতে চেষ্টা না ক'রে, গুণাতীত হ'য়ে অপরোক্ষানুভূতির দ্বারায় আমাকে জানতে চেষ্টা কর। কি রকম অবস্থা হ'লে গুণাতীত হওয়া যায় শ্লোকার্দ্ধে তাই বল্‌ছেন যে, নির্দ্বন্দ্বো, অর্থাৎ দ্বন্দ্ব রহিত হও। মন সকল অবস্থাতে অবিচলিত থাকার নাম নির্দ্বন্দ্ব। শীত, উষ্ণ, সুখ দুঃখ, ভাল মন্দ এই সকলের অধীন না হওয়া অর্থাৎ সুখেতে উৎফুল্ল না হওয়া এবং দুঃখেতে কাতর না হওয়া ইত্যাদি। নিত্য সত্ত্বস্থ, সর্ব্বদা সাত্ত্বিক ভাবে থাক। নির্যোগ ক্ষেম হও, অর্থাৎ যোগ ক্ষেম বর্জ্জিত হও। অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির চেষ্টাকে যোগ বলে, আর প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষার চেষ্টাকে ক্ষেম বলে। সেই যোগ ক্ষেম, রহিত হও, তার মানে এই যে, উপার্জ্জন ও রক্ষার যে চিন্তা তা ত্যাগ কর, কেন না, সে ব্যবস্থা আমিই করব। আর আত্মবান হও, কি না আত্মাতে রত হও। অর্থাৎ বহির্মুখীন্ ইন্দ্রিয়গণকে সংযত ক'রে অন্তর্মুখীন করতঃ আত্মাকে জানবার জন্য চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন কর।

শিষ্য। ভগবান বল্‌লেন বেদ ত্রৈগুণ্য বিষয়ক, অর্থাৎ সাংসারিক কর্ম্ম-কাণ্ডের ব্যবস্থা বেদে আছে। তবে কি বেদে তত্ত্বজ্ঞানের কথা কিছু নাই ?

গুরু। থাক্‌বেনা কেন ? তুমি ভগবদ্ বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ এখনও বুঝ্‌তে পারনি। ভগবান মায়াবদ্ধ সংসারী লোকের সম্বন্ধে এই উপদেশ দিচ্ছেন ব'লে, সংসার প্রচলিত বেদের কর্ম্মকাণ্ড (সকামকর্ম্ম) সম্বন্ধেই ব'লছেন। বেদের জ্ঞানকাণ্ড সম্বন্ধে একথা নয়। সাংসারিক লোক বেদোক্ত ফল প্রতিপাদক কর্ম্মকাণ্ডেরই অনুষ্ঠান করে থাকে। অর্জ্জুন সংসারী লোক, সেই জন্য ভগবান তাকে ব'লছেন যে, তুমি সংসার প্রচলিত সকাম-কর্ম্ম সকল ত্যাগ করে নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করে গুণাতীত হও। কারণ, সকাম কর্ম্মে কেবলই লোকের আশা তৃষ্ণা জন্মায়, কাজেই মায়াজালে আবদ্ধ করে।

শিষ্য। নিষ্কাম কর্ম্মের মহৎ ফল ত্যাগ করে, সাংসারিক লোক বেদোক্ত সকাম কর্ম্মের ক্ষুদ্র ফলের প্রতি অনুরক্ত হয় কেন ?

গুরু। নিষ্কামকর্ম্মের ফল মহৎ কিন্তু পাওয়া যায় বিলম্বে ; আর সকাম কর্ম্মের ফল ক্ষুদ্র, কিন্তু শীঘ্র পাওয়া যায়। সাধারণ সংসারী লোকের স্বভাব এই যে, যা শীঘ্র পাওয়া যায় তাতেই অনুরক্ত হয়, এই একটি কারণ। আর একটি কারণ এই যে বেদের কর্ম্মকাণ্ডের ফল-শ্রুতি বড়ই চিত্তাকর্ষক এবং রুচিকর বাক্যে বর্ণিত আছে। যেমন যা দান করবে তার শতগুণ পাবে ইত্যাদি। সেই জন্য লোভপ্রযুক্ত আশু ফলপ্রিয় সাংসারিক সাধারণ লোক সকাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান ক'রে থাকে। তাতেই ভগবান গীতার ২য় অধ্যায়ের ৪২শ, ৪৩শ ও ৪৪শ এই তিনটী শ্লোকে ব'লেছেন যে,

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রপদ্যন্ত্যবিপশ্চিত।
বেদ বাদ রতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্ম কর্ম্ম ফলপ্রদাম্।
ক্রিয়া বিশেষ বহুলাং ভোগৈশ্বর্য্য গতিং প্রতি ॥
ভোগৈশ্বর্য্য প্রসক্তানাং তয়াপহৃত চেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥

হে পার্থ। সংসারী অবিবেকীগণ এই শ্রুতিমধুর, জন্ম কর্ম্মফলপ্রদ, ভোগৈশ্বর্য্যের সাধনভূত বহুল ক্রিয়া বিশেষ বাক্য বলে এবং বেদ-বাদরত অর্থাৎ বেদের দোহাই দিয়ে থাকে, তারা কামাত্মান্ স্বর্গপর ও ভোগৈশ্বর্য্যে আসক্ত হয় এবং বলে বেদ ছাড়া আর কিছুই নাই। তাদের চিত্ত অপহৃত (মোহিত) হয়। সুতরাং তাদের বুদ্ধি সমাধিতে সংশয় বিহীন হয় না। ভগবদ্বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ এই যে যারা বেদোক্ত কর্ম্ম-কাণ্ডের শ্রুতিমধুর বাক্যে অনুরক্ত, বহুবিধ ফল প্রকাশক বেদ বাক্যই যাদের প্রীতিকর, যারা স্বর্গাদি ফল সাধন ভিন্ন অন্য কিছুই স্বীকার করে না অথবা জানেনা, (কারণ, বেদের মুখ্য তাৎপর্য্যার্থ না জানাতে তার গৌণার্থ গ্রহণ করে, অর্থাৎ কর্ম্মফলের অতিরিক্ত কিছুই নাই, এই বিশ্বা-সের জন্য তাদের কাম্য কর্ম্মই একমাত্র অবলম্বন) যারা কামপরায়ণ, স্বর্গই যাদের পরম পুরুষার্থ, জন্ম কর্ম্ম ফলপ্রদ ও ভোগৈশ্বর্য্যের সাধন ভূত নানাবিধ ক্রিয়া প্রকাশক বাক্যে যাদের চিত্ত মোহিত হয়, এবং যারা ভোগ ও ঐশ্বর্য্যে সংসক্ত হয়, সেই বিবেকহীনদের বুদ্ধি সমাধিতে সংশয়-বিহীন হয় না, অর্থাৎ ঈশ্বরেতে চিত্ত একাগ্র হয় না। কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞান লাভ হয় বটে, কিন্তু সেই সব কর্ম্ম নিষ্কাম ভাবে করা চাই।

শিষ্য। এখন কোন্ উপদেশে চল্‌লে নিষ্কাম কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়?

গুরু। কেন? ভগবদ্গীতার উপদেশে চল্‌লে নিষ্কাম কর্ম্মে প্রবৃত্তি হবে এবং ভক্তি ও জ্ঞানলাভও হবে।

শিষ্য। গীতাত অনেকেই পড়ে, তবে তাদের নিষ্কাম কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় না কেন?

গুরু। শুধু পড়্‌লে কিম্বা মুখস্থ কর্‌লে হয় না। গীতোক্ত উপদেশ মত চল্‌তে হয়, অর্থাৎ সেই রকম সাধন করে চরিত্রকে তদনুরূপ গঠন করতে হয় তবে হয়। তার মানে শাস্ত্র বচন শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করতে হয় এবং সেই রকম আচরণও নিজে করতে হয়। এইগুলির নাম হ'লো সাধনা। সেই সাধনা না করলে শাস্ত্র বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ অনুভবে কিছু আসেনা। কেবল পাখীর মত বুলি শেখা হয়। তোমাকে একটী উদাহরণ দিয়ে বোঝাই তাহ'লে তুমি বুঝতে পারবে। মনে কর, একটী বড় লোকের ল্যাপল্যাণ্ড দেশ দেখবার এবং ঐস্থান সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করবার জন্য মনে বড় কৌতূহল জন্মেছে। সেই জন্য তিনি ভূগোল ইতিহাস পর্য্যালোচনা করেছেন, এবং কোন্ কোন্ সমুদ্র ও কোন্ কোন্ দেশ দিয়ে যেতে হবে তাও সব ঠিক করেছেন। আর যে সেখানে বরফময় প্রাকৃতিক দৃশ্য অর্থাৎ সব জায়গা বরফে ঢাকা এবং সেই বরফের উপর দিয়ে হরিণে চাকা বিহীন গাড়ী টেনে নিয়ে যায় এই সমস্তই তিনি বই প'ড়ে অবগত হ'য়েছেন বটে, কিন্তু তা হলে কি হয়? যতক্ষণ তিনি জাহাজে এবং রেলে চ'ড়ে—তিতিক্ষা অবলম্বন ক'রে, অর্থাৎ ভ্রমণ জনিত ক্লেশ সহ্য ক'রে সমস্ত রাস্তা অতিক্রম করতঃ ল্যাপল্যাণ্ডে না পৌছাচ্ছেন্; ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁর ঐ স্থান সম্বন্ধে অনুভব জ্ঞান কিছুমাত্র হবেনা। অর্থাৎ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখে আনন্দ ও বরফের শৈত্যানুভব ইত্যাদি কিছুই অনুভবে আস্‌বেনা। পরিশ্রম ক'রে সমস্ত রাস্তা অতিক্রম করতঃ স্থানে না পৌঁছিলে যেমন সেইস্থান সম্বন্ধে কোন অনুভব জ্ঞান হয় না তেমনি শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে তিতিক্ষার সহিত সাধনার দ্বারা মায়াময় অজ্ঞান

তুমি অতিক্রম ক'রে সেই জ্ঞানময়ের কাছে না পৌঁছিলে তাঁর সম্বন্ধেও কিছু অনুভব জ্ঞান হয় না। বেদান্ত উপনিষদ্, গীতাদি পড়লে কি হবে? শ্রবণ, মনন নিদিধ্যাসন চাই।

শিষ্য। আজ্ঞা এখন আমি বুঝ্‌লাম। আচ্ছা, গীতা ভিন্ন অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ পড়া কি নিষিদ্ধ?

গুরু। অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ পড়া নিষিদ্ধ নয়। যে কোন শাস্ত্রে যে কোন মতই থাকুন কেন সকল মতের লক্ষ্য যে একই জিনিস তাতে আর কোন সন্দেহ নাই। যখন সকল মতের উদ্দেশ্য একই, তখন মতের বিভিন্নতা কি ক'রে হতে পারে? লোকে অজ্ঞানতা বশতই মতদ্বৈধ দেখে থাকে, অন্যান্য মতের প্রতি দ্বেষবশতঃ সেই সব মত নিয়ে বাদানুবাদ করে, কিন্তু তা করা বিশেষ নিষিদ্ধ। নানা শাস্ত্রে নানা মত আছে, তাতে তোমার কি এল গেল? তোমার মনে যে ভাবের জমাট বেঁধেছে, অন্যান্য মত নিয়ে তর্ক বিতর্ক করে তোমার সেই জমাট বাঁধা ভাবটীকে ছিন্ন ভিন্ন করা উচিত নয়। কেননা, ভগবান ভাবেরই বশ। ভাবের অভাব হ'লে তাঁকে জানা যায় না। সেইজন্য মহাত্মা তুলসী দাস ব'লেছেন যে,—

সব্‌মে বসিয়ে সব্‌মে রসিয়ে সব্‌কে লিজিযে নাম্।
হাঁজি হাঁজি কর্‌তে রহিযে বৈঠ্‌কে আপনা ঠাম্।
মগর হৃদ্ মে জপ রাম নাম।

নানা শাস্ত্রে নানা মত আছে তা নিয়ে তর্ক বিতর্ক না করে, যে যা বলে তাতেই হাঁ হাঁ করে যাও, এবং মনে মনে রাম নাম জপ কর। অর্থাৎ তুমি যে ভাব নিয়ে আছ, নিঃসংশয় চিত্তে তাতেই লেগে থাক।

তর্ক বিতর্কের দ্বারা মনের দৃঢ় ভাব শিথিল হ'তে পারে, সেইজন্য কুতার্কিকের সঙ্গে তর্ক করা নিষিদ্ধ।

শিষ্য। আমরা কথায় কথায় অনেক দূর এসে পড়েছি। আমাদের কাল কথা হচ্ছিল যে, ফলের আকাঙ্ক্ষা রেখে কর্ম্ম করলে সেই কর্ম্ম ফল ভোগের জন্য এই ভোগায়তন শরীর ধারণ করতে হয়। তবে কি এই শরীরই কর্ম্ম ফল ভোগ করে?

গুরু। শরীর ঘর বইত নয়। ঘর ভোগ করে, না—ঘরে যারা বাস করে তারা ভোগ করে? শরীর ভোক্তার বাসের স্থান মাত্র। সেই জন্য শাস্ত্রে শরীরকে ক্ষেত্র বলে। সেই ক্ষেত্রে অর্থাৎ শরীরে পুরুষ (আত্মা) সব প্রকাশ করে আছেন, এবং প্রকৃতি সদলবলের সহিত বাস করছেন। বুদ্ধি, অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়াদির প্রকৃতির স্বগণ। ভোগাদি কি যে কোন কাজ প্রকৃতি ইন্দ্রিয় দির দ্বারা সব সম্পন্ন করা-চ্ছেন। আর পুরুষ (পরমাত্মা) আত্মারূপে এই শরীরে নির্লিপ্ত, নিশ্চল, নির্ব্বিকার, উদাসীনবৎ প্রকৃতিজ সমস্ত কর্ম্মের দ্রষ্টা স্বরূপে অবস্থান ক'রছেন।

শিষ্য। আত্মা সর্ব্বদা শরীরের মধ্যে থেকেও যে কোন কর্ম্মে লিপ্ত হচ্ছেন না, তাহ'লে তিনি কি ভাবে যে আছেন সে সম্বন্ধে আমার কিছু ধারণা হচ্ছে না।

গুরু। আত্মা কি রকম অবস্থায় ভূতগণের দেহের মধ্যে অবস্থান করছেন ভগবান তা গীতার ১৩শ অধ্যায়ের ৩২শ, ৩৩শ শ্লোকে ব'লেছেন যে,

যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥

যথা প্রকাশযেত্যেকঃ কৃৎস্নং লোক মিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশযতি ভারত॥

আকাশ যেমন সর্ব্বগত হয়েও সূক্ষ্মত্ব প্রযুক্ত অন্য বস্তুতে লিপ্ত হয় না, আত্মাও তেমনি দেহে অবস্থিত থেকেও দৈহিক কোন ধর্ম্মে অথবা কর্ম্মে লিপ্ত হন না। হে ভারত। এক সূর্য্যই যেমন সমস্ত লোক প্রকাশ করেন, সেই রকম ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মাই সমস্ত ক্ষেত্রকে অর্থাৎ শরীরকে প্রকাশ ক'রে থাকেন। ভগবদ্ বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, সূর্য্য যেমন উদয় হলেই সমস্ত বিশ্ব প্রকাশ পায়, এবং সাধারণতঃ লোকে সমস্ত দিন কাজ কর্ম্মে ব্যাপৃত থেকে তা সব সম্পন্ন করে, কিন্তু সূর্য্য অস্ত গেলেই সমস্ত বিশ্ব অন্ধকারে আবৃত হয় ও নিস্তব্ধ হয়। তেমনি আত্মা যতক্ষণে দেহে থাকেন ততক্ষণই জীবগণ জীবিত থাকে এবং দৈহিক কাজ কর্ম্ম সব সম্পন্ন হয়। অন্যথায় দেহ চির বিশ্রাম গ্রহণ করে।

শিষ্য। এই রকম আশ্চর্য্য স্বভাব সম্পন্ন আত্মা যে কেমন, সে সম্বন্ধে আমি মনে কিছুই ধারণা করতে পাচ্ছি না।

গুরু। আত্মাকে শাস্ত্রে যে কি বলে তা আগে শোন, তাহ'লে কতকটা ধারণা হবে। আত্মা হচ্ছেন

স্থূল সূক্ষ্ম কারণ শরীরাদ্ ব্যতিরিক্ত পঞ্চকোশাতীত সন্
অবস্থাত্রয় সাক্ষী সচ্চিদানন্দ স্বরূপ সন্ যস্তিষ্ঠতি স আত্মা।

স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিন প্রকার শরীর হ'তে ভিন্ন, আর অন্নময়াদি পঞ্চকোষের অতীত, এবং জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার সাক্ষী রূপে, সৎ চিৎ ও আনন্দের স্বরূপ যিনি দেহের মধ্যে অবস্থান ক'রছেন তিনিই আত্মা। আত্মার স্বভাব ত আশ্চর্য্য বটেই। শরীরের মধ্যে আত্মা

থাক্‌লেও তাঁকে কেও দেখ্‌তে পায় না কিম্বা জানতে পাবে না। সেই জন্য ভগবান আত্মা সম্বন্ধে গীতাব ২য় অধ্যায়েব ২৯শ শ্লোকে বলেছেন যে,

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন
মাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈন মন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ॥

এই আত্মাকে কেও আশ্চর্য্যবৎ দেখেন, কেও ইহাঁকে আশ্চর্য্যবৎ বলেন, কেও বা ইহাঁকে আশ্চর্য্যবৎ শুনেন্, কিন্তু কেহই ইহাঁকে জান্‌তে পাবেন্ না। ভগবদ্বাক্যেব তাৎপর্য্যার্থ এই যে, আত্মার কার্য্যকেও আশ্চর্য্যের ন্যায় দেখেন, কেও তাঁকে আশ্চর্য্যেব ন্যায় বলেন্, কেও বা তাঁব কথা আশ্চর্য্যেব ন্যায় শুনেন, কিন্তু কেহই, তাঁকে প্রকৃত পক্ষে জান্‌তে পারেন্ না। আত্মা প্রাকৃতিক গুণ, প্রাকৃতিক ধর্ম্ম কিম্বা প্রাকৃতিক নিয়মেব অধীন নন্। সকলেই তাঁব অধীন।

শিষ্য। আত্মা যে প্রকৃতিব অধীন নন্ তা বুঝলাম্, কিন্তু প্রকৃতিটা যে কি আমাকে বুঝিয়ে দিন।

গুরু। প্রকৃতি শব্দেব অর্থ আগে শোন, তার পব জিনিসটা কি তাও বোঝ। প্র মানে সত্ত্ব, কৃ মানে বজঃ এবং তি মানে তম। এই সত্ত্বরজস্তম তিন গুণেব সমষ্টিকে প্রকৃতি বলে। ইহাঁকে ত্রিগুণাত্মিকা মায়া, আদ্যাশক্তি, মহামায়া প্রভৃতিও বলে, এবং তিনি নানারূপে পূজিতাও হ'য়ে থাকেন। ফলতঃ পরমাত্মাব এই শক্তি, মায়া বা প্রকৃতি প্রভাবেই সৃষ্টি প্রলয়াদি বিশ্বেব যাবতীয় কাজ চিবদিন সম্পন্ন হচ্ছে ও হবে।

শিষ্য। আচ্ছা, এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়া বা প্রকৃতি সৃষ্ট্যাদি কাজ

সব কচ্ছেন, কিন্তু তিনি থাকেন্ কোথায়? পরমাত্মা ত সমগ্র বিশ্ব ব্যেপে রয়েছেন।

গুরু। প্রকৃতির একটী নাম শক্তি। এখন শক্তি বল্‌লেই একজন শক্তিমান চাই, অর্থাৎ একটা আধার চাই। নইলে শক্তি থাকে কোথায়? শক্তি, শক্তিমানকে আশ্রয় ক'রেই থাকে ও শক্তিমানের নিয়োগক্রমে কাজ করে, এবং সেই শক্তিমানের নামেই পরিচিত হয়। যেমন ভীমের শক্তিতে অমুক অমুক কাজ হ'য়েছে। এই ইঞ্জিন্‌টী ৪০ ঘোড়ার শক্তি বিশিষ্ট, রামমূর্ত্তির শক্তিতে ৬খানা মটরকার টেনে ধ'রে রাখে ইত্যাদি এই সব শক্তি যেমন কোন ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষকে আশ্রয় ক'রে থাকে ও তাদের নিয়োগক্রমে কাজ করে, এবং তাদেরই নামে পরিচিত হয়, তেম্‌নি পরমাত্মার শক্তি বা প্রকৃতিও পরমাত্মাকে আশ্রয় ক'রে থাকেন ও পরমাত্মার নিয়োগক্রমে কাজ করেন, এবং পরমাত্মার শক্তি বলেই পরিচিত হন।

শিষ্য। প্রকৃতির দ্বারায় যখন সমস্ত কাজ সম্পন্ন হ'চ্ছে, তখন আত্মার ভূতগণের দেহের মধ্যে বদ্ধাবস্থায় অবস্থানের প্রয়োজন কি? যদি প্রাকৃতিক কাজের দ্রষ্টারূপে থাকেন, তা হ'লেই বা দেহের মধ্যে থাকার দরকার কি? তিনি দেহের বাইরে থেকেও ত প্রকৃতির কাজ সব দেখ্‌তে পারেন্। যে হেতু আত্মাই ঈশ্বর, সুতরাং তিনি সর্ব্বদর্শী তার দৃষ্টির অবরোধ ত কোথাও নাই।

গুরু। ঈশ্বরের দৃষ্টির অবরোধ কোথাও নাই বটে, কিন্তু প্রয়োজন বশতঃই তিনি দেহের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করেন।

শিষ্য। প্রয়োজনটা কি?

গুরু। আচ্ছা, বল দেখি একটা নতুন ঘড়ী বাজার থেকে কিনে এনে বৈঠকখানায় টাঙ্গিয়ে রাখলে কি সময় দেবে?

শিষ্য। কি ক'রে সময় দেবে?

গুরু। কেন দেবেনা? নতুন ঘড়ী কল কারখানা সব ঝক্ ঝক্ করছে, সময় দেবে না কেন?

শিষ্য। ঘড়ীতে দম্ না দিলে কি কখন সময় দেয়?

গুরু। আত্মাও ঠিক সেই দম্ স্বরূপ। দমের যেমন আকার নাই, খুঁজলে কিছু পাওয়া যায় না, কেবল কার্য্যেতে প্রকাশ পায়। আত্মারও তেম্নি কোন আকার নাই, খুঁজলে কিছু পাওয়া যায় না, কেবল কার্য্যেতে প্রকাশ পান। ঘড়ীর যেমন সব কল কারখানা মজুত থাক্লেও এক দম্ ভিন্ন অচল হয়, শরীরেও তেম্নি কল কারখানা রূপ যন্ত্রাদি মজুত থাক্লেও এক আত্মা ভিন্ন অচল হয়। আত্মার অধিষ্ঠান হেতুই শারীরিক প্রাকৃতিক কাজ সব চ'লে থাকে। অন্যথায় সব একবারে বন্ধ হ'য়ে যায়। দেহের মধ্যে আত্মার অধিষ্ঠান হেতুই ভূতগণ জীবিত থাকে, কিন্তু আত্মার অনধিষ্ঠানে সেই মৃতদেহ জড়বৎ প'ড়ে থাকে। এখন বুঝে দেখ শরীরের মধ্যে আত্মার অধিষ্ঠানের কি প্রয়োজন।

শিষ্য। আপনি বল্‌ছেন যে, আত্মা দেহের মধ্যে নিষ্ক্রিয় নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করছেন, আবার বলছেন্ যে, আত্মা যতক্ষণ দেহের মধ্যে দ্রষ্টারূপে অবস্থান করছেন, ততক্ষণই প্রাকৃতিক কাজ সব চ'লে থাকে, এবং প্রকৃতিই যে সব করছেন তাও পূর্ব্বে ব'লেছেন। এ কথায় কিন্তু আমার বড় ধাঁধা লাগ্‌ছে। এখন প্রকৃত কর্ত্তা কে তাই আমাকে বলুন।

গুরু। ঈশ্বর অর্থাৎ আত্মাই একমাত্র সর্ব্বময় কর্ত্তা, সুতরাং তিনিই সব করছেন, কিন্তু প্রকৃতির আড়ালে থেকে।

শিষ্য। প্রকৃতির আড়ালে থেকে কি রকমে সব করছেন বুঝ্‌তে পারলাম না।

গুরু। যেমন একটা হাড়ীতে জল চ'ড়িয়ে, তাতে চা'ল, ডা'ল,

আলু পটল প্রভৃতি ছেড়ে দিয়ে হাঁড়ীর তলায় জ্বাল দিলে ক্রমে জল ফুটে ওঠে, তখন ঐ চা'ল ডা'ল ইত্যাদি হাঁড়ীর মধ্যে মহা বেগে আন্দোলন ক'রে ঘু'রে বেড়ায়, কিন্তু হাড়ীর তলার জ্বালটা টেনে নিলেই অমনি সব স্থির হ'য়ে যায়। যেমন আগুণের আশ্রয় হেতু হাড়ীর মধ্যস্থ পদার্থ সব ক্রিয়াশীল হয়, এবং ঐ আশ্রয়ের অভাব হ'লেই সব স্থির হ'য়ে যায়। তেম্নি আত্মার আশ্রয় হেতু প্রকৃতিও ক্রিয়াশীলা হন্ এবং তার অনধিষ্ঠানে প্রকৃতি স্থির হ'য়ে যান।

শিষ্য। আত্মাই যখন কর্ত্তা এবং তিনি তাঁর প্রকৃতির দ্বারায় সব কাজ করিয়ে থাকেন, এখন তিনি নিষ্ক্রিয়, নির্লিপ্ত হ'তে পারেন কি ক'রে? আমরাও ত আমাদের শক্তি দ্বারা কাজ করিয়ে থাকি।

গুরু। আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা বাহ্যতঃ নিষ্ক্রিয়ই বটেন, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন কাজেই হস্তক্ষেপ করেন না। তবে তাঁর শুদ্ধ সঙ্কল্প হেতু কোন কাজের জন্য ইচ্ছা করা মাত্রই তৎক্ষণাৎ সেই কাজ আপনিই সম্পন্ন হয়। ইচ্ছা, শক্তি বা প্রকৃতি একই জিনিস। ইচ্ছা মাত্র কার্য্য সম্পন্ন হয় ব'লে তার একটী নাম ইচ্ছাময়। ভগবান অসীম ঐশ্বর্য্যশালী ও ক্ষমতাশালী, এবং অঘটন ঘটনাকারী। আমাদের মত কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারায় তাঁকে কোন কাজ করতে হয় না, এবং সেইজন্য তাঁকে বাহ্যতঃ নির্লিপ্তই দেখায়।

শিষ্য। বড় আশ্চর্য্য কথা। ভগবানের ইচ্ছাতেই সব কাজ সম্পন্ন হয়?

গুরু। আশ্চর্য্য ত বটেই। ভগবানের সকল বিষয়ই আশ্চর্য্যজনক, এবং তিনি নিজেও আশ্চর্য্যময়। ভগবান ১১শ অধ্যায়ের ৮ম্ শ্লোকার্দ্ধে তাই ব'লেছেন যে, "দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্"। হে অর্জ্জুন। তোমাকে আমি দিব্য চক্ষু দিচ্ছি, (কেননা, তোমার চক্ষে তুমি দেখতে পারে না) আমার অসাধারণ যোগৈশ্বর্য্য অর্থাৎ অঘটন ঘটনা সামর্থ্য

দেখ। সে ত অনেক দূরের কথা, জগতে তাঁর সৃষ্ট পদার্থেই যখন তাঁর সেই শক্তি বিকাশ পায়, তিনি সেই শক্তির পূর্ণাধার, তখন তাঁর সম্বন্ধে কি আর কোন কথা আছে? বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ত তাঁথেকেই উৎপন্ন হ'য়েছে। তাঁতে যা আছে বিশ্বেও তাই আছে, তবে আংশিকরূপে।

শিষ্য। জগতের কোন্ পদার্থে ভগবানের সেই নির্লিপ্ত থেকে কাজ করার শক্তি প্রকাশ পায়?

গুরু। কেন? চুম্বক লোহা। চুম্বকখানা এক স্থানেই প'ড়ে থাকে কিন্তু দূর থেকে ছুঁই প্রভৃতি লোহার জিনিস টকাটক্ এসে তাতে লাগে। চুম্বক কিন্তু নড়ে চড়ে না, অথচ আকর্ষণের কাজটী চুম্বকই করছে। চুম্বক যেমন না ন'ড়ে আকর্ষণের কাজ করে, ঈশ্বরও তেম্নি না ন'ড়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় কাজ করেন। তিনি বাহ্যতঃ নির্লিপ্ত থেকে তাঁর শক্তি বা প্রকৃতির দ্বারায় যে সব কাজ করাচ্ছেন গীতার ৯ম্ অধ্যায়ের ১০ম্ শ্লোকে তাই ব'লেছেন যে,

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতি সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥

হে কৌন্তেয়। প্রকৃতি আমার অধিষ্ঠান মাত্র লাভ ক'রে অর্থাৎ আমাকে আশ্রয় ক'রে, এই সচরাচর বিশ্ব প্রসব ক'রছেন। তার মানে সৃষ্টি ক'রছেন এবং আমার অধিষ্ঠান অর্থাৎ আশ্রয় হেতুই এই জগৎ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে। তাহ'লেই দেখ প্রকৃতি সব ক'রছেন বটে, কিন্তু ঈশ্বরের নিয়োগ ক্রমে এবং তাঁকে আশ্রয় করেই সব ক'রছেন।

শিষ্য। ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য ক্ষমতাদি মনে ধারণ ক'রতে পারা যায় না, প্রকাশ করা ত দূরের কথা।

গুরু। সেই জন্যই ত তিনি অচিন্ত্য, অব্যক্ত, অনন্ত এবং অসীম। তিনি পলকে কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি প্রলয় করতে পারেন।

শিষ্য। তা সম্পূর্ণ সত্য। আচ্ছা, ভগবানের সৃষ্টির কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না?

গুরু। না—তা পাওয়া যায় না। কবে এবং কি প্রণালীতে যে তিনি সৃষ্টি ক'রলেন, তার কোন ইতিহাস পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। লোকে ঘটনা দেখে ইতিহাস লেখে, ঈশ্বরের সৃষ্টি ত কেও দেখেনি, সুতরাং ইতিহাস হবে কি ক'রে? কেন না, তিনি অবিনাশী, অনাদি ও অনন্ত। যখন এই সৃষ্টির নামগন্ধও ছিল না কেবল এক পরমাত্মাই ছিলেন, তখন তিনি সৃষ্টি ক'রলেন, কাজেই সেই সময়ে দর্শক ত ছিল না যে ইতিহাস লিখ্‌বে? তা ছাড়া, ঈশ্বরের কোন কাজই মানুষের বোধগম্য নয়। ঈশ্বর যদি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য স্থূল পদার্থ হ'তেন, তাহ'লে লোকে তাঁর কার্য্যপ্রণালীর রহস্য বুঝ্‌তে পারত, এবং তাঁকেও জান্‌তে পা'রত। সেই কথা তিনি গীতার ১০ম্ অধ্যায়ের ২য় শ্লোকে ব'লেছেন যে

> ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
> অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশ ॥

হে অর্জ্জুন! দেবগণ ও মহর্ষিগণও আমার প্রভাব জানেন না অর্থাৎ আমাকে জানেন না। যেহেতু, আমি তাঁদের আদি ও উৎপত্তির কারণ। যদি বল সপ্ত ঋষি আগে সৃষ্টি ক'রেছেন সুতরাং সেই ঋষিরা সৃষ্টির তত্ত্ব অনেকটা জ্ঞাত হ'য়েছেন। না—ঋষিরাও জানেন না। ঋষি ত ঋষি, ব্রহ্মা যখন সৃষ্ট হ'লেন তখন তিনি কিছুই বুঝ্‌তে না পেরে আকাশ পাতাল ভাব্‌তে লাগলেন। তারপর ভগবান কৃপা ক'রে যখন নিজেকে জানালেন এবং উপদেশ দিলেন তখন ব্রহ্মা তপস্যা ক'রতে লাগলেন।

যিনিই হ'ন না কেন, ভগবানকে সম্যক্ প্রকারে কেহই জানেন না। সুতরাং তাঁর কার্য্যের ইতিহাস হ'তে পারে না। তবে ভগবান প্রয়োজন বিশেষের জন্য অবতাররূপে অবতীর্ণ হয়ে, কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত থেকে যখন কাজ সম্পন্ন করেন, তখন অবশ্য লৌকিক বা অলৌকিক যা কিছু ঘটনা ঘটে, তা লোকে দেখ্‌তে পায়, এবং তার বিবরণও পুরাণাদিতে বর্ণিত আছে।

শিষ্য। কেন? পুরাণাদিতে সৃষ্টিতত্ত্ব অর্থাৎ জগতের সৃষ্টিপ্রণালী ত লেখা আছে।

গুরু। হাঁ—তা আছে বটে, কিন্তু সেটা চাক্ষুষ্ দেখে লেখা নয়। ঐ সব লিখিত বিষয় সাধন-লব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে লিখিত। আমি স্বীকার করি যে দেবতা ও মহর্ষিগণ ভগবানের অলৌকিক কার্য্য প্রত্যক্ষ ক'রতে পারেন, কিন্তু যখন আদৌ সৃষ্টি হয়নি, ভগবান একাকীই ছিলেন, এমন অবস্থায় সৃষ্টি ক'রলেন তখন অন্য দর্শক কৈ? কেননা, আর ত দ্বিতীয় পদার্থ ছিল না। সেই জন্য ব'লছি পুরাণাদি লিখিত সৃষ্টিতত্ত্ব অপরোক্ষানু-ভূতির সাহায্যে লিখিত। তবে আদিম রাজাদের বংশাবলী ও তৎকালীন সামাজিক তত্ত্ব যা পুরাণাদিতে পাওয়া যায়, তা অবশ্য দেখে লেখা, সুতরাং সে সব ইতিহাস বটে।

শিষ্য। ভগবানের অবতারের সময় পুরাণাদি কল্পিত লীলার মধ্যে যদি কোন অলৌকিক ঘটনা ঘ'টে থাকে, তাই শোনবার জন্য আমার বড় কৌতূহল হ'চ্ছে। আপনি দয়া ক'রে সে সম্বন্ধে যদি কিছু বলেন, তাহ'লে বড় আনন্দ পাই।

গুরু। পুরাণাদিতে ভগবানের সকল অবতারেরই অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ আছে। ভগবানের ব্রজলীলার সময়ে একদিনকার একটী ঘটনা বলি শোন। একদিন ভগবান রাখালদের সঙ্গে গোচারণের মাঠে আছেন,

এবং এক জায়গায় সকলকে নিয়ে ব'সে খাওয়া দাওয়া করছেন; গরু বাছুর সব দূরে দূরে জঙ্গলে চ'রে বেড়াচ্ছে। ইতিমধ্যে ব্রহ্মা ভগবানকে পরীক্ষা করবার জন্য, গরু বাছুর সব হরণ ক'রে যোগ নিদ্রায় শুইয়ে দিলেন। এদিকে রাখালেরা খেতে খেতে দূরে আর একটাও গরু বাছুর না দেখ্‌তে পেয়ে মনে সন্দেহ হওয়াতে ভগবানকে বল্‌লে যে, ভাই কানাই। গরু বাছুর ত আর একটাও দেখা যাচ্ছে না, আমরা দেখে আসি কোথা গেল। অন্তর্যামী ভগবান ব্রহ্মাকে নিজের পরিচয় দেবার জন্য, তিনি রাখালদের বল্‌লেন যে, তোমরা ভাই সবাই খাও, আমি একলাই দেখে আস্‌ছি। এই ব'লে ভগবান যেমন সেখান থেকে উ'ঠে দেখ্‌তে গিয়েছেন, আর অমনি ব্রহ্মা রাখালগণকে হরণ ক'রে যোগ নিদ্রায় শুইয়ে দিলেন। ভগবান ফিরে এসে দেখলেন রাখালগণও হত হ'য়েছে। তখন তিনি একটু হেঁসে তন্মুহূর্ত্তেতেই ঠিক সেই গরু বাছুর, রাখালগণকে সৃষ্টি ক'রে আবার সেই রকম লীলা কর্‌তে লাগ্‌লেন। তারপর ব্রহ্মা এক বৎসর বাদ এসে গরু বাছুর রাখালগণকে ফিরিয়ে দিয়ে ভগবানের স্তব স্তুতি ক'রতে লাগলেন ইত্যাদি। যিনি পলকে কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করতে পারেন, তাঁর পক্ষে এই গরু বাছুর কি রাখালগণ সৃষ্টি অতি সামান্য কাজ। পরন্তু সামান্য কাজই বৃহৎ কাজের পরিচায়ক।

শিষ্য। ভগবান বাঁ হাতের কেনে আঙ্গুলে সাতদিন সাতরাত ক্রমান্বয়ে গোবর্দ্ধন পাহাড় ধারণ ক'রে ব্রজবাসীদের ঝড়বৃষ্টি থেকে রক্ষা ক'রেছিলেন শুন্‌তে পাই। এটাও ত একটা অলৌকিক ঘটনা।

গুরু। হাঁ, অলৌকিক ঘটনা ত বটেই। যাঁর ইচ্ছায় এই বিশ্বের মধ্যে কোটী কোটী পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্রাদি আবহমানকাল আকাশমার্গে শূন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাঁর ইচ্ছায় যে একটা ছোট পাহাড় সাত দিন সাত রাত শূন্যে খাড়া থাকবে সেটা আর আশ্চর্য্য কি? লোককে

দেখাবার জন্য আঙ্গুল ঠেকিয়ে রেখেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর ইচ্ছাতেই পাহাড় শূন্যে ছিল।

শিষ্য। আজ্ঞা হঁা, এখন আমি বুঝতে পারছি যে, ভগবানের ইচ্ছায় না হয় এমন কাজই নাই। এখন আমার আগেকার সংশয়ের মীমাংসা করুন।

গুরু। আজ থাক্ আবার কা'ল হবে।

——

তৃতীয় দিন।

গুরু। তুমি যে কাল ব'লছিলে আগেকার সংশয় মেটাবার কথা, সে সংশয়টা কি ?

শিষ্য। আত্মা ভূতগণের দেহেতে নিষ্ক্রিয়, নির্লিপ্ত ও নির্ব্বিকার ভাবে অবস্থান কর্‌ছেন বল্‌লেন। আমি কিন্তু তার কিছুই ধারণা করতে পাচ্ছিনা। আত্মা দেহের মধ্যে সমস্ত বৃত্তি ও ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে সর্ব্বদা জড়িত থেকেও যে কি ক'রে নির্লিপ্ত হ'তে পারেন তাই ভাবছি।

গুরু। কেন ? সেদিন ত তোমাকে ব'লেছি যে, আত্মা আকাশের মত নির্লিপ্ত থাকেন। যেমন আকাশ সকল পদার্থে অবস্থান ক'রেও কোন পদার্থ দ্বারা উপলিপ্ত হয় না, তেমনি আত্মা ভূত সকলের দেহেতে অবস্থান ক'রেও দৈহিক পাপ পুণ্য কি দোষ গুণ দ্বারা উপলিপ্ত হন না।

শিষ্য। আত্মা দেহের মধ্যে নির্লিপ্ত ভাবে থাকেন, এমন কি দৈহিক পাপ পুণ্যের দ্বারাও উপলিপ্ত হন না। প্রাকৃতিক কার্য্যের দ্রষ্টার ন্যায় অবস্থান কর্‌ছেন, আপনি ব'লছেন। তবে কি কেবল প্রকৃতির কাজ দেখবার জন্যই ভূতগণের দেহেতে বাস করেন ?

গুরু। আত্মা কেন যে দেহের মধ্যে থাকেন, তা ভগবান গীতার ১৩শ অধ্যায়ের ৩৩শ শ্লোকে ব'লেছেন যে,

যথা প্রকাশয়ত্যেক কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥

হে ভারত! যেমন একমাত্র সূর্য্যই সমগ্র বিশ্বকে প্রকাশ করে,

তেমনি একমাত্র আত্মাই দেহরূপী ক্ষেত্রকে প্রকাশ করেন, অর্থাৎ জীবিত রাখেন।

শিষ্য। আত্মা যে নির্লিপ্ত নির্ব্বিকার অবস্থায় থাকেন ব'লছেন, আপনার এই কথায় কিন্তু আমার সংশয় যাচ্ছে না।

গুরু। এর আবার সংশয়টা কি ?

শিষ্য। আত্মা যদি নির্লিপ্ত নির্ব্বিকার ভাবেই ভূতগণের দেহেতে থাকেন, তাহ'লে তিনি প্রাণীগণের সুখ দুঃখের কারণ বশতঃ হর্ষ বিষাদের অধীন হন কেন ?

গুরু। সুখ দুঃখাদি অনুভবের কারণ হচ্ছে অহংকার। অহং জ্ঞানের অভিমানে জীবকে সুখ দুঃখাদি বোধ করায়, আমি সুখী, আমি দুঃখী ইত্যাদি। এই অনুভবের সঙ্গে আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই। প্রাকৃতিক অবিদ্যাজনিত অহং জ্ঞানের বুদ্ধিতে জীবকে ঐ রকম অনুভব করায়। কারণ সাধারণ অজ্ঞান লোক নিজেকে (আত্মাকে) জানতে না পেরে প্রকৃতি প্রসূত স্থূল দেহটাকেই আমি সাব্যস্ত করে। কাজেই তা'রা সুখ দুঃখের অধীন হ'য়ে হর্ষ শোকাদি অনুভব করে। বাস্তবিক পক্ষে, আত্মাতে সুখ দুঃখাদি কিছু স্পর্শ হয় না। আত্মা কোন ভাবেরই অধীন নন্, তিনি সর্ব্বদা সচ্চিদানন্দ স্বরূপে স্বীয় স্বভাবেই অবস্থান করেন। আত্মা কারও সঙ্গে মেশেন না ব'লে শ্রুতি ব'লছেন যে, "অসঙ্গোহয়ং পুরুষঃ।"

শিষ্য। আত্মা যে সর্ব্বদা সচ্চিদানন্দ স্বরূপে স্বীয় স্বভাবেই থাকেন তার কোন প্রমাণ পাওয়ার উপায় নাই, সুতরাং আপনি যা ব'লছেন তাই মেনে নিতে হবে।

গুরু। না—তোমাকে কেবল আমার কথায় মেনে নিতে বল্‌ছি না। আত্মার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ অবস্থা জীবেতে সর্ব্বদা প্রকাশ পাচ্ছে।

শিষ্য। কিসে যে সে ভাব প্রকাশ পাচ্ছে, আমি ত তার কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

গুরু। আচ্ছা, আমি বলি শোন এবং মনে বিচার ক'রে দেখ তাহ'লে বুঝ্‌তে পারবে। সচ্চিদানন্দ শব্দের মানে আগে বোঝ, তা'হলে সেই সচ্চিদানন্দের ভাব লোকেতে যে প্রকাশ পাচ্ছে তাও বুঝ্‌তে পার্‌বে। সৎ মানে অবিনাশী, অর্থাৎ যাঁর কখন নাশ নাই। চিৎ মানে জ্ঞান, অর্থাৎ অজ্ঞান যাঁকে স্পর্শ কর্‌তেও পারে না, এবং আনন্দ মানে নিরতিশয় সুখ, অর্থাৎ বিকার রহিত সুখ। এই তিনটী অবস্থা পরমাত্মাতে পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান আছে ব'লে, তাঁকে সচ্চিদানন্দ পুরুষ বলে। এমন কি কোন দেবতারও এই সচ্চিদানন্দ অবস্থা নাই। পরমাত্মা ও জীবাত্মা দুইই এক, কেবল নামের বিভিন্নতা মাত্র, সুতরাং জীবাত্মাতে এই তিনটী ভাবই পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান আছে, এবং লোকেতে সে ভাব প্রকাশও পাচ্ছে।

শিষ্য। এখন কিসে যে সেভাবে লোকে প্রকাশ পাচ্ছে, সেইটা জান্‌বার জন্য আমার বড় কৌতূহল হ'চ্ছে।

গুরু। তা শোন। দেখ, শত শত লোক মর্‌ছে, তা সকল লোকেই দেখ্‌ছে, কিন্তু কেও কখন ভাবে যে আমি মর্‌ব? একথা আদৌ কারও মনে উদয় হয় না, উদয় হলেও মনে ধারণা হয় না। এইটীতে জীবাত্মার সৎএর ভাব অর্থাৎ অবিনাশীভাব ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। লোক যতই কেন অজ্ঞান কিম্বা মূর্খ হ'ক না, সে কখনই মনে করে না যে, অন্যাপেক্ষা সে কম বুঝে। সকলের চেয়ে আমি বেশী বুঝি এবং আমার জ্ঞান বেশী এ ধারণা সকলের মনেই আছে। এইটীতে চিৎ অর্থাৎ জ্ঞানের ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। আর জীব সর্ব্বদা আনন্দ অর্থাৎ সুখের প্রয়াসী। এমন কি দশার ফেরে সুখ না ঘটলেও লোক মনে মনে সুখ কল্পনা করেও

আনন্দানুভব করে। এইটীতে আনন্দের ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। এখন বুঝে দেখ, জীবাত্মার সচ্চিদানন্দ ভাব জীবেতে প্রকাশ পাচ্ছে কি না।

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ বুঝ্‌লাম। পরন্তু সুখ দুঃখাদি যদি কিছুই আত্মায় স্পর্শ না হয়, তাহ'লে হর্ষ বিষাদাদিতে আত্মার অবস্থান্তর অর্থাৎ তাঁকে বিকারগ্রস্থ দেখায় কেন?

গুরু। আত্মার আবার বিকার কি?

শিষ্য। আত্মা হর্ষ বিষাদাদিযুক্ত না হ'লে লোকের মুখ দেখে কি ক'রে জান্‌তে পারা যায় যে ইনি সুখী ইনি দুঃখী ইত্যাদি? লোকের মুখ দেখেই আত্মার অবস্থা জান্‌তে পারা যায়। কারণ, মুখমণ্ডল আত্মার দর্পণ স্বরূপ কেন না, মুখেতেই তাঁর প্রতিবিম্ব পড়ে। আত্মা হর্ষ ভাব প্রাপ্ত হ'লে মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হয়, সহাস্যবদন হয়, মুখমণ্ডলের বর্ণ উজ্জ্বল হয়, এবং চক্ষুর্দ্বয় আনন্দ জ্যোতিতে পূর্ণ হয়। সেই আত্মা আবার বিষাদ ভাবপ্রাপ্ত হ'লে, মুখমণ্ডল ম্লান হয়ে যায়, মুখময় যেন কালি মাখিয়ে দেয়, চোখ দুটী দুঃখাশ্রুভাবাক্রান্ত হয়। এতেই ত আত্মার ভাবান্তর লক্ষিত হ'চ্ছে। আত্মার ভাবের পরিবর্ত্তন না হ'লে লোকের মুখের ভাবের কখনই পরিবর্ত্তন হয় না।

গুরু। বাস্তবিক, হর্ষ বিষাদাদি কিছুই আত্মাতে সংস্পর্শ হয় না, তত্রাচ আত্মাকে প্রফুল্লিত অথবা বিষাদিত দেখায়। তার কারণ এই যে, অবিদ্যাজনিত অহংকারের বশবর্ত্তী হওয়াতে, জীব অধ্যাস বশতঃ হর্ষ বিষাদাদির প্রতিবিম্ব আত্মায় প্রতিফলিত হ'তে দেখে, কাজেই সে ভাব মুখমণ্ডলে প্রকাশ পায়, সুতরাং আত্মাকেও তদনুরূপে দেখায়। যেমন একটী স্ফটিক পাত্রের নিকট যে রঙ্গের বস্তু ধরা যায়, তখন ঐ স্ফটিক পাত্রটীকে সেই রং বিশিষ্ট দেখায়। পরন্তু ঐ স্ফটিক পাত্রের সহিত উক্ত রঙ্গিন বস্তুর আদৌ সংস্পর্শ নাই, মধ্যে কিছু ব্যবধান আছেই, অথচ সাদা পাত্র

টীকে রঙ্গিন দেখায়। কারণ, রঙ্গিন বস্তুটীর প্রতিবিম্ব পাত্রে পড়ে। তেমনি অবিদ্যাধীন জীব অধ্যাস বশতঃ হর্ষ শোকাদির প্রতিবিম্ব আত্মায় দেখে থাকে, ফলতঃ আত্মা বিন্দুমাত্রও বিকার প্রাপ্ত হন্ না, সুতরাং তজ্জনিত কোন রকম বিকারও উৎপন্ন হয় না।

শিষ্য। দেহাদি জড় পদার্থের ক্রিয়া আত্মায় স্পর্শ হয় না। যেমন শরীরে জ্বর হ'লে তজ্জনিত উত্তাপ আত্মায় লাগেনা, আপনি এই ব'লছেন। কিন্তু কোন কোন স্থলে এমনও দেখা যায় যে, পদার্থের পরস্পর সংস্পর্শ না হ'লেও গুণ দ্বারা ব্যাপ্ত হ'য়ে পদার্থ বিকার প্রাপ্ত হয়। যেমন কড়াইতে পায়েস পাক হয়। আগুণ কেবল কড়াইকেই স্পর্শ করে, কিন্তু তাতেই চা'ল সিদ্ধ হয় এবং দুধ ঘন হ'য়ে পায়েসে পরিণত হয়। আগুণ সংস্পর্শ না হ'য়েও দুধ যেমন বিকার প্রাপ্ত হ'বে পায়েসে পরিণত হয়, তেমনি শারীরিক ক্রিয়া আত্মায় সংস্পর্শ না হ'লেও তার বিকার প্রাপ্তির সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।

গুরু। হাঁ, কড়াইতে পায়েস পাক করলে, দুধাদি অগ্নি সংস্পর্শ না হ'য়েও বিকার প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু শারীরিক ক্রিয়ার দ্বারা আত্মা সেরূপ বিকার প্রাপ্ত হন্ না। তার কারণ, সমধর্ম্মী পদার্থেই পরস্পর গুণের ও কর্ম্মের সম্বন্ধ থাকে, কিন্তু বিষমধর্ম্মী পদার্থে সে সম্বন্ধ থাক্‌তে পারেনা। সেইজন্য দৈহিক ঘটনায় আত্মার কোন সম্বন্ধ ঘটতে পারে না। কেননা, আত্মা সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম একমাত্র অবিনাশী সত্য পদার্থ। আর মায়াসম্ভূত ভূতাদি জগৎ প্রপঞ্চ যাবতীয় পদার্থই নাশশীল অর্থাৎ মিথ্যা। এখন সত্য ও মিথ্যা পদার্থে কি করে এক হ'তে পারে? তার মানে এক গুণের অধীন হ'য়ে ক্রিয়া জনিত বিকার প্রাপ্ত হ'তে পারে?

শিষ্য। জগৎ মিথ্যা কিসে? জগৎ পরমাত্মা থেকেই ত উৎপন্ন হ'য়েছে। পরমাত্মা কারণ আর জগৎ তার কার্য্য। জগৎ ও পরমা-

আতে যখন কার্য্য কারণ সম্বন্ধ, তখন জগৎ মিথ্যা হয় কিসে? যেমন মাটী কারণ ঘট তার কার্য্য, ঘট কি মিথ্যা?

গুরু। তুমি মাটী ও ঘটের যে উদাহরণ দিচ্ছ সেই উদাহরণেই তোমাকে আমি বোঝাচ্ছি। আগে মিথ্যা শব্দের মানে বোঝ, তাহ'লে এই বিষয়টী বুঝ্তে পারবে। এখানে মিথ্যা মানে যার চিরদিন অস্তিত্ব থাকে না অর্থাৎ যা নাশশীল পদার্থ তাই মিথ্যা। জগৎ নাই ব'লে যে মিথ্যা তা নয়, জগৎ আছে সত্য কিন্তু থাক্‌বে না। এখন তোমার উদাহরণের কথাই ধর। ঘটরূপী কার্য্য নষ্ট হ'য়ে যায়, কিন্তু মাটী সে তার কারণ সে'টা থাকে। পরমাত্মা ও জগতে কার্য্য কারণ সম্বন্ধ স্থূল ও সূক্ষ্মা-সূক্ষ্মরূপী কারণই স্থূলরূপী কার্য্যে পরিণত হয়েছে। সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম পরমাত্মা কারণ স্থূল জগৎ তার কার্য্য। এই মায়া প্রপঞ্চ জগৎ থাকবে না ব'লে একে মিথ্যা বলে। সেই জন্য তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষের নিকট জাগতিক সমস্ত বিষয়ই মিথ্যা ব'লে প্রতীয়মান হয়। যিনি সত্যকে জেনেছেন তিনিই কেবল মিথ্যাকে জান্‌তে পারেন। নইলে সত্য মিথ্যা বাছ্‌বেন কি করে? একমাত্র সত্য যে আত্মা তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ তাঁকেই জেনেছেন; সুতরাং সুখ দুঃখ ভাল মন্দ এ জগতের কোন ঘটনাতেই কিছু আসে যায় না। অর্থাৎ সুখ দুঃখাদি কিছুতেই তিনি অভিভূত হন্ না।

শিষ্য। তাহ'লে সুখ দুঃখ অনুভবে আসেনা এমন মানুষও আছেন?

গুরু। নিশ্চয় আছেন। যিনি তত্ত্বজ্ঞানী অর্থাৎ যে মহাত্মা আত্মাকে জেনেছেন্, তিনি দেখেন যে, প্রকৃতির দ্বারায় সব কাজ হচ্ছে, আমার (আত্মার) সঙ্গে কর্ম্মের কোন সংশ্রব নাই, সুতরাং কোন স্বার্থও নাই। কাজে কাজেই তিনি সকল অবস্থাতেই নির্ব্বিকার চিত্তে অবস্থান করেন। ভগবান গীতার ৫ম অধ্যায়ের ১৩শ শ্লোকে ব'লেছেন যে,

সর্ব্ব কর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখংবশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন ন কারয়ণ্॥

তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ মনে মনে সকল কর্ম্মের কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ ক'রে নবদ্বার বিশিষ্ট দেহপুরে সুখে অবস্থান করেন। তিনি স্বয়ং কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন না এবং অন্যকেও প্রবৃত্ত করেন না।

শিষ্য। কোন দুর্ঘটনা উপস্থিত হ'লে মনকে অবিচলিত রাখা আমার অসম্ভব ব'লে মনে হয়। তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষেরা যে কি ক'রে অবিচলিত থাকেন আমি তাই ভাবছি।

গুরু। অধিকারী পুরুষের পক্ষে মন অবিচলিত রাখা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। কর্ম্মের সঙ্গে আমার কোন সংশ্রব নাই মনে এই ধারণাটী দৃঢ় হ'লে, অর্থাৎ এইটা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস হ'লে, মনে আর কোন গোল থাকে না। লোকের শরীর, স্ত্রী কি সন্তানের প্রতি নিজের ব'লে যেমন পূর্ণ বিশ্বাস থাকে, এক্ষেত্রেও ঠিক সেই রকম দৃঢ় বিশ্বাস থাকা চাই। সাধারণ কথায় তোমাকে বোঝাচ্ছি তা হ'লে বুঝ্‌তে পার্‌বে। মনে কর দাওরায় জজ্ সাহেবের এজ্‌লাসে একটী সঙ্গীন মোকদ্দমা চল্‌ছে। এখন বাদী ও প্রতিবাদী পক্ষীয় লোকেরা ঐ মোকদ্দমার ফলাফলের জন্য উদ্বিগ্ন-চিত্তে বিচার ফল প্রতীক্ষা কর্‌ছে। কেন না, এই মোকদ্দমায় তাদের স্বার্থ জড়িত আছে। পরন্তু, সহরের অন্যান্য লোকেরা যে এই মোকদ্দমার বিচার দেখ্‌তে এসেছে, তারা কিন্তু নিরুদ্বিগ্ন মনে দাঁড়িয়ে বিচার দেখ্‌ছে। বিচারে বাদীর জিৎ হ'ল, সুতরাং তৎপক্ষীয় লোকেরা মহা আনন্দ কর্‌তে লাগ্‌ল, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদী পক্ষীয় লোকেরা মহা শোকগ্রস্ত হ'ল। কিন্তু সহরের লোকেরা যারা দ্রষ্টারূপে দাঁড়িয়ে বিচার দেখছিল, তাদের মনে কোন উদ্বেগই নাই। কেন না, পূর্ণ

বিশ্বাসের সহিত তাদের মনে এই দৃঢ় ধারণা আছে যে, তাদের সঙ্গে এই মোকদ্দমার কোন সংশ্রব নাই, সুতরাং কোন স্বার্থও নাই। তারা যে কেবল এই মোকদ্দমার বিচার দেখ্‌তে এসেছে তাদের মনের ধারণা তাই থাকে। সহরের লোক যেমন মোকদ্দমা দেখ্‌তে এসে, সেই মোকদ্দমার ফলাফলের জন্য মনে কোন উদ্বেগ প্রাপ্ত না হ'য়ে অবিচলিত মনে থাকে, তেম্‌নি তত্ত্বজ্ঞানীগণও কোন ঘটনাতেই বিচলিত না হ'য়ে অবিচলিত চিত্তে অবস্থান করেন। কেননা, পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত তাঁদের মনে ধারণা থাকে যে, সমস্ত কর্ম্মই প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ জড়িত কর্ম্মের সঙ্গে তাঁদের কোন সংশ্রব নাই সুতরাং স্বার্থও নাই, তাঁরা কেবল দ্রষ্টারূপে থাকেন মাত্র। এখন ভেবে দেখ, যে আত্মাকে জেনে তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষেরা কি মহান্‌ অবস্থা প্রাপ্ত হন আর সেই আত্মা স্বয়ং কি মহান্‌ ভাব সম্পন্ন অবস্থায় ভূতগণের দেহের মধ্যে প্রকৃতির কার্য্যের দ্রষ্টারূপে অবস্থান কর্‌ছেন ?

শিষ্য। জ্ঞানী পুরুষের মন কেন যে বিচলিত হয় না এবং জ্ঞানী ও অজ্ঞানেতে কি পার্থক্য তা আমি বুঝ্‌লাম। এখন জীবাত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধে আমার যে সংশয় আছে তাই মিটিয়ে দিন।

গুরু। তোমার কি সংশয় বল।

শিষ্য। আপনি সেদিন ব'ল্‌লেন যে পরমাত্মা কর্ত্তা, আবার ব'ললেন যে আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মাই কর্ত্তা। এখন আমাকে বলুন জীবাত্মা ও পরমাত্মা পৃথক না এক, যদি আলাদা হন তা হ'লে সে পার্থক্যই বা কেমন ?

গুরু। প্রশ্নটী বড়ই কঠিন। আসল তত্ত্ব বুঝ্‌তে গেলে অদ্বৈতজ্ঞানের আশ্রয় নিতে হয়। পরন্তু, মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে অদ্বৈতজ্ঞানের আশ্রয় নিয়ে আসল তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা এক রকম অসম্ভব। সাধারণের পক্ষে দ্বৈতজ্ঞানই অনুকূল। সুতরাং দ্বৈতজ্ঞানের আশ্রয় নিয়ে আপাততঃ

এই বিষয়টী বোঝাবার চেষ্টা করছি। তবে অদ্বৈতজ্ঞানের আশ্রয় নিয়েও তোমাকে আসল তত্ত্ব বোঝাবার আর একদিন চেষ্টা করব। এখন শোন, জীবাত্মা ও পরমাত্মা বস্তুতঃ কোন পার্থক্য নাই, দুইই এক। কেবল অবস্থানের পার্থক্য হেতু নামের বিভিন্নতা মাত্র। যেমন আবাদের জন্য গঙ্গা থেকে খাল্ কেটে জল নিয়ে যায়, এবং গঙ্গার জলই খালে যায়, সুতরাং গঙ্গা ও খালের দুই জলই এক, তত্রাচ গঙ্গার গর্ভস্থিত জলকে লোকে গঙ্গাজল বলে, আর খালস্থিত গঙ্গাজলকে খালের জল বলে। তেম্‌নি পরমাত্মার যে অংশ ভূতগণের দেহে বদ্ধাবস্থায় অবস্থান্ কর্‌ছেন, তাঁকে জীবাত্মা বলে। আর যে অংশ মুক্তাবস্থায় সচরাচর বিশ্বে ব্যাপ্ত হ'য়ে আছেন্ তাঁকে পরমাত্মা বলে। ভগবান গীতার ১০ম্ অধ্যায়ে বিভূতি যোগে ব'লেছেন যে, "অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্ব ভূতাশয় স্থিতঃ" হে অর্জ্জুন। আমি ভূতগণের দেহেতে আত্মারূপে অবস্থান কর্‌ছি। একথা বলার তাৎপর্য্য এই, ভগবান বল্‌ছেন্ যে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ব্যেপে আমি ত আছিই, আবার ভূতগণেও আত্মারূপে আছি।

শিষ্য। তবে আর অবস্থার পার্থক্য হ'ল কৈ? তিনিই সচরাচর বিশ্বব্যেপে আছেন্, এবং ভূতগণের দেহের মধ্যেও আছেন্। তিনি ছাড়াত আর কেহ নাই।

গুরু। পার্থক্য আছে বৈ কি। যেমন জেলখানার কয়েদী ও জেলের বাহিরের অন্য লোক। লোকের জেল হ'লে হাতে পায়ে বেড়ী প'রে জেলখানার বাড়ীর মধ্যে বাস করে, কোন স্থানে যাওয়ার বা স্বাধীনভাবে কিছু কর্‌বার সাধ্য থাকে না, সেই জেলখানার ঘেরা বাড়ীর মধ্যেই থাকতে হয়। তখন সেই লোককে সবাই কয়েদী বলে। দেখ একই মানুষ অবস্থা ভেদে বিভিন্ন নাম প্রাপ্ত হচ্ছে। তেমনি এক পরমাত্মাই অবস্থা ভেদে জীবাত্মা ও পরমাত্মা ব'লে কথিত হন্।

শিষ্য। কয়েদীকে জেলখানার ঘেরা পাঁচীলে আটক্ করে রাখে, কিন্তু জীবাত্মাকে কিসে আটক্ ক'রে রাখে?

গুরু। কর্ম্মফলে আটক্ ক'রে রাখে। মানুষের কর্ম্মফল শরীরের মধ্যে সূক্ষ্মাবস্থায় জীবাত্মার চারিদিকে মেঘের মত হ'য়ে ঘিরে থাকে। যখন জীবাত্মা দেহত্যাগ করেন, তখন ঐ সকল সূক্ষ্মাবস্থার কর্ম্মফল জীবাত্মাকে চারিদিকে ঘেরাও ক'রে কর্ম্মোচিত যোনীতে নিয়ে গিয়ে হাজির করে। এই প্রাক্তন অর্থাৎ সূক্ষ্মাবস্থার কর্ম্মফল জীবাত্মাকে কখনই ত্যাগ ক'রে যায় না।

শিষ্য। কর্ম্মফল সূক্ষ্মাবস্থায় জীবাত্মার চারি দিকে ঘিরে থাকে কেন, এবং জীবাত্মা দেহত্যাগ কর্‌লে তাঁকে কর্ম্মোচিত যোনীতে নিয়ে গিয়ে হাজিরই বা করে কেন?

গুরু। ঐ ত অদৃষ্ট। ঐ প্রাক্তন ফল আছে ব'লেই ত জীবাত্মাকে দেহ ধারণ ক'র্‌তে হয় অর্থাৎ জন্ম নিতে হয়। কর্ম্মফল জীব সৃষ্টির বীজ স্বরূপ। কর্ম্মফল না থাকলে জীবের জন্মই হয় না। এই কর্ম্মফলকে সংস্কার বলে, এবং সেই সংস্কারানুসারে জীবের জীবনের যাবতীয় কাজ হ'য়ে থাকে।

শিষ্য। আচ্ছা, ঐ অদৃষ্ট, কর্ম্মফল বা সংস্কার যাই বলুন, সেগুলি কি আর জীবাত্মাকে কখন ছাড়্‌বে না? তাঁকে চিরকালই কি বদ্ধাবস্থায় থাকৃতে হবে?

গুরু। ভোগের দ্বারা ঐ সংস্কারগুলি ক্ষয় না হ'লে আর জীবাত্মার ত্রাণ নাই। ফলের আকাঙ্ক্ষা রেখে কর্ম্ম কর্‌লে লোকের এই দুর্দ্দশা ঘটে, কিন্তু নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম কর্‌লে, কর্ম্মফলের অভাব হেতু আর জন্ম হয় না। বীজ না থাকৃলে কি আর ফসল উৎপন্ন হয়? লোকে ভব যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে ব'লেই ভগবান গীতাতে নিষ্কাম কর্ম্মের এত উপদে

দিয়েছেন, এবং প্রশংসাও ক'রেছেন। গীতার ২য় অধ্যায়ের ৪৭শ শ্লোকে ভগবান যেন মাথার দিব্যি দিয়ে ব'লছেন যে,

কর্ম্মণ্যে বাধিকাবস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফল হেতু ভূর্মাতে অঙ্গোহস্ত কর্ম্মণি॥

হে অর্জ্জুন! কর্ম্মে তোমার অধিকার হ'ক অর্থাৎ কর্ম্ম কর, কিন্তু ফলে যেন কদাচ অধিকার না হয়, অর্থাৎ ফল কামনা যেন কদাচ না কর। তার মানে নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম কর। আর কর্ম্মফল যেন তোমার কর্ম্মে প্রবৃত্তির হেতু না হয়। অর্থাৎ ফলের লোভে যেন কর্ম্ম না কর। দেখ, ঈশ্বর জীবের কেমন কল্যাণ কামনা ক'রে থাকেন।

শিষ্য। লোকের কর্ম্মফল বা সংস্কার কি রকম ভাবে ক্ষয় হয়?

গুরু। তুমি ফণোগ্রাফের গান শুনেছ ত? যন্ত্রটী সাম্‌নে রাখে, সমস্ত রেকর্ডগুলি বাঁ দিকে এক জায়গায় থাক্ করা থাকে, এবং যে কয়খানি রেকর্ডের গান শুন্‌বে সেগুলি মোট রেকর্ড থেকে বেছে নিয়ে আলাদা ক'রে রাখে। যেখানে রেকর্ডগুলি থাকে সেখানে উপরি উপরি সাজান থাকে। তারপর ঐ বেছে রাখা রেকর্ডের এক এক খানি ক'রে মেসিনে চড়ায়, এবং ঘুরে ঘুরে গান হয়। এই রকম ভাবে বেছে রাখা রেকর্ডের সমস্তগুলির গান খতম্ হয়। যাকে অদৃষ্ট বলে, সেই সূক্ষ্মাবস্থার সংস্কার-রূপী কর্ম্মফলের অবস্থাও ঠিক তাই। প্রারব্ধ নামক কর্ম্মফলের রেকর্ড ক্ষয় করবার জন্যই, জীব এই দেহরূপ মেসিন পায় অর্থাৎ জন্ম হয়। গানের রেকর্ড যেমন তিন ভাগে বিভক্ত থাকে, অর্থাৎ মোট রেকর্ড এক জায়গায় মজুত থাকে, আর উপস্থিত গানের জন্য কয়েকখানি রেকর্ড আলাদা করা বাছা থাকে, এবং একখানি গানের জন্য মেসিনে ঘুর্‌তে থাকে। সংস্কাররূপী কর্ম্মফলের রেকর্ডও তেমনি তিন ভাগে বিভক্ত,

সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মান। বহু জন্ম জন্মান্তরের সংস্কার যা দেহের মধ্যে মজুত আছে তাকে সঞ্চিত বলে, আর ইহজীবনে ভোগের দ্বারা ক্ষয় করবার জন্য যে কয়খানি নির্দ্দিষ্ট রেকর্ড আছে, তাকে প্রারব্ধ বলে, এবং যে রেকর্ড খানির কাজ জীবনে উপস্থিত চলছে, তাকে ক্রিয়মান বলে। গানের রেকর্ড ও সংস্কাররূপী রেকার্ডে তফাৎ এই যে, গানের রেকর্ড গান হওয়ার পর মজুত থাকে, কিন্তু সংস্কাররূপী রেকর্ড ভোগ হ'লে আর থাকে না, ক্ষয় হ'য়ে যায়।

শিষ্য। আচ্ছা, লোকের ধর্ম্মে কি পাপে যে মতি হয়, তাও কি সংস্কাররূপী রেকর্ড অনুসারে হয়? আবার এমনও দেখা যায় যে, কোন লোক তার জীবনে বরাবর ধর্ম্ম কর্ম্ম করে আস্‌ছে, শেষে হয়ত বুড়ো বয়সে বিশেষ খারাপ কাজ ক'রে বস্‌ল, তার কারণ কি?

গুরু। হাঁ, জীবের পাপ অথবা পুণ্য কর্ম্মে মতি সংস্কারানুসারেই হ'য়ে থাকে। তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর, খারাপ রেকর্ডে হাত পড়া। মনে কর, লোকে ব'সে ফনোগ্রাফের গান শুনছে ও প্রীত হচ্ছে। এমন সময় একখানি খারাপ রেকর্ড মেসিনে চড়ল, রেকর্ডগুলি উপরি উপরি সাজান থাকে, উপরকার ভাল রেকর্ডগুলির গান খতম হ'লেই তার পর খারাপ রেকর্ডে হাত পড়ে। তখন শ্রোতারা খারাপ গান শুনে বিরক্তি প্রকাশ করে এবং গানেরও নিন্দা করে। তেমনি লোকেরও সংস্কাররূপী রেকর্ডের ভালগুলি খতম হ'য়ে গিয়ে পরে খারাপ রেকর্ডের কাজ সুরু হয় এবং লোকে তার সেই কৃত কর্ম্মের জন্য ছিছিক্কার নিন্দা করে। খারাপ রেকর্ডে হাত পড়েছে সে বেচারা করবে কি?

শিষ্য। লোকে ইহজীবনে যে কর্ম্ম করে, তার ফল সংস্কার বা অদৃষ্টরূপে পরজীবনে ভোগ হয়। আচ্ছা, ইহজীবনের কর্ম্মফল কি এই জীবনে ভোগ হয় না?

গুরু। হাঁ, স্থলবিশেষে ইহজীবনের কর্ম্মফল এই জীবনেই ভোগ হ'য়ে থাকে। তীব্র পাপ অথবা পুণ্য কর্ম্ম কর্‌লে তার ফল এই জীবনেই ভোগ হয়। যেমন জরুরী টেলীগ্রাম্। আর আর টেলীগ্রাম্ গুলি প'ড়ে থাকে, সময় মত পাঠায়, কিন্তু জরুরী তার গুলি বেছে নিয়ে তৎক্ষণাৎ পাঠায়। যেমন টেলীগ্রামের মধ্যে অন্যান্য গুলিকে ফেলে রেখে জরুরী গুলি তৎক্ষণাৎ পাঠায়, তেম্‌নি মানুষের তীব্র পাপ অথবা পুণ্য কর্ম্মের ফলও অন্যান্য কর্ম্মফলকে ফেলে আগে অর্থাৎ এই জীবনেই ভোগ হয়। সংসারে দেখ্‌তে পাওনা যে, লোকে তীব্র পাপ অথবা পুণ্য কর্ম্ম কর্‌লে হাতে হাতে তার ফল পায়। আর এক রকমেও ইহজীবনের কর্ম্মফল এই জীবনেই ভোগ হ'য়ে থাকে। প্রারব্ধ ভোগ খতম্ কর্‌তে যতদিন লাগে ততদিন লোকের পরমায়ু, অর্থাৎ প্রারব্ধ সমস্ত ভু'গে নিয়ে তবে লোকে দেহত্যাগ করে। এখন কোন লোকের প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট প্রারব্ধ ফল নির্দ্দিষ্ট পরমায়ুতে ভোগ হ'য়ে গেল, কিন্তু ঐ ব্যক্তি যোগাভ্যাস কি অন্য কোন সাধনা করাতে তার আয়ু আরও বাড়্‌ল, তাহ'লে তখন তার ভোগ হবে কি? নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মফল ত নির্দ্দিষ্ট পরমায়ুতে ভোগ হ'য়ে গিয়েছে। কাজেই তখন এ জীবনের কর্ম্মফলে হাত পড়ে। পরন্তু এ রকম ঘটনা কদাচিৎ ঘটে।

শিষ্য। মানুষের পরমায়ু কি বাড়ে কমে?

গুরু। হাঁ, কর্ম্ম বিশেষে বাড়ে এবং কর্ম্মবিশেষে ক্ষয় হ'য়ে ক'মেও যায়।

শিষ্য। আপনি ব'ল্‌ছেন যে, লোকের কৃত পাপপুণ্য কর্ম্মানুসারে দুখ সুখ ভোগ হ'য়ে থাকে। এ কথায় কিন্তু আমার মনে বিশেষ সংশয় হচ্ছে।

গুরু। সংশয়টা কি?

শিষ্য। লোকে পাপাচারী হ'য়েও সুখ সচ্ছন্দতা যে ভোগ করে এবং ধর্ম্ম পথে থেকেও যে কষ্ট পায়, তাতেই মনে হয় যে, সংসারে বুঝি পাপ পুণ্যের বিচার নাই।

গুরু। তোমার মনে কি বিষয়ের সংশয় হ'য়েছে সেইটা খুলে বল না।

শিষ্য। দেখুন, সংসারে দেখা যায় যে, কোন লোক মহা পাপকর্ম্ম সব করেও মহাসুখে কাল কাটাচ্ছে ধনে জনে সকল দিকেই সুখী এবং শরীরও নীরোগ। আবার কোন লোক পরম ধার্ম্মিক ও ভগবদ্‌পরায়ণ, তাঁর কিন্তু দুঃখের সীমা নাই। অন্ন বস্ত্রের কষ্টত আছেই, তার উপর পুত্র শোক উপস্থিত হ'ল, আবার হয়ত বাড়ীখানা পু'ড়ে গেল। এ রহস্যত আমি কিছুই বুঝতে পারছিনা।

গুরু। কেন? এ রহস্যত আমি তোমাকে পূর্ব্বেই ব'লেছি। ঐ পাপাচারী ব্যক্তি তার পূর্ব্বজন্মের অর্জ্জিত পুণ্যময় সংস্কারের জন্য এ জন্মে সে ঐহিক সুখ ভোগ করছে। আর এ জন্মে সে যে সব পাপ কর্ম্ম করছে, তার সংস্কাররূপী রেকর্ড তৈয়ার হচ্ছে। কেন না, পরজন্মে ভোগ হবে।

শিষ্য। আপনার এই কথার আমার মনে সংশয় আরও বাড়্‌ছে। যে ব্যক্তি পুণ্যময় সংস্কার নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে, তার নিশ্চয়ই সৎপথে ধর্ম্ম কর্ম্মে মতি হওয়া উচিত। তা না হ'য়ে ঠিক তার বিপরীত হচ্ছে, তবে আর পুণ্যময় সংস্কারের অর্থ কি?

গুরু। উপর উপর দেখ্‌লে সংশয় হয় বটে, কিন্তু বিষয়টী চিন্তা ক'রে দেখ্‌লে তবে এ রহস্য হৃদয়ঙ্গম হয়। মনে কর একজন রাজা খুব ঐশ্বর্য্য ভোগ করছেন্। দিবারাত্রি ইন্দ্রিয় সুখে মত্ত আছেন। কেবল মদ, রাড, পরদার প্রভৃতি পাপকর্ম্ম তাঁর আলোচ্য বিষয় হয়েছে। ভ্রমেও কখন ভগবানকে স্মরণ করেন না, অথবা সৎকর্ম্মে মতি হয় না। তার কারণ কি? তার কারণ এই যে, রাজাটী পূর্ব্বজন্মে কঠোর তপস্যা

ক'রেছিলেন, এজন্মে তার ফলস্বরূপ রাজভোগ পেয়েছেন। পরন্তু তিনি নিষ্কাম ভাবে তপস্যা করেননি, প্রবল আকাঙ্খার সহিত তপস্যা ক'রে-ছিলেন, কাজেই তাঁর চিত্তশুদ্ধি হয় নি ; সুতরাং হৃদয়স্থ ভোগাকাঙ্ক্ষা ও আসক্তি দ্বেষ-প্রভৃতি ময়লাগুলি তপস্যার সময় তাঁর মনে লেগেই ছিল। তপস্যা ফলের যখন সংস্কাররূপী রেকর্ড তৈয়ারি হ'য়েছে, তখন ঐ তপস্যা-কালীন ভোগাকাঙ্ক্ষাদি ময়লাগুলি যা তাঁর মনে লেগেছিল, সে গুলিও সূক্ষ্মাকারে সংস্কাররূপী রেকর্ডের সামিল্ হ'য়ে গিয়েছে। কাজেই সেগুলি এখন প্রকাশ পাচ্ছে।

শিষ্য। রাজাটী যখন কঠোরতা অবলম্বন ক'রে তপস্যা ক'রেছেন তখন ঐ সব ভোগাকাঙ্ক্ষাদি ময়লাগুলি মনে থাকবে কেন ?

গুরু। চিত্তশুদ্ধি লাভ না হ'লে মনের ময়লা কিছুতেই যায়না। হাঁজার তপই কর আর পূজাই কর কিছুতেই কিছু হবে না। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভের কোন সম্ভাবনা নাই। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে সূর্য্যদেব যেমন প্রকাশ পান্‌না, হৃদয়ে রাগ দ্বেষাদি ময়লাগুলি থাকলেও হৃদাকাশে তত্ত্বজ্ঞানরূপ সূর্য্য প্রকাশ পান্ না। নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম কর্‌লে লোকের চিত্তশুদ্ধি হয়, কিন্তু সকাম কর্ম্মে তদ্বিপরীত হ'য়ে থাকে। ঐ রাজাটী পূর্ব্বজন্মে যখন ঐহিক সুখভোগ ত্যাগ ক'রে কঠোরতার সহিত তপস্যা ক'রেছিলেন, তখন ঐসব ভোগাকাঙ্ক্ষাদি বৃত্তিগুলি বিষয় না পেয়ে, অর্থাৎ ভোগ্য বস্তু না পাওয়াতে, তাদের ক্ষমতা প্রকাশ কর্‌তে পারেনি ব'লে ইন্দ্রিয়গণ সংযতের ন্যায় ছিল ; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইন্দ্রিয়গণ সংযত হ'য়েছিল না। কেন না, চিত্তশুদ্ধি ভিন্ন ইন্দ্রিয়গণ কখন সংযত হয় না। এখন ঐ রাজাটীর তপস্যা ফলের যে রেকর্ড তৈয়ারী হয়েছে, তাতে রাজা হবে এবং রাজভোগ সব পাবে সুতরাং এজন্মে তিনি রাজা হ'য়ে রাজভোগ সব পাচ্ছেন বটে, কিন্তু সেই ভোগাকাঙ্ক্ষাদি ময়লা

গুলিও তাঁর সংস্কাররূপী রেকর্ডে মিশ্রিত আছে। কাজেই এখন তারা ভোগ্য বস্তু সামনে পেয়ে ভোগাভিলাসে আপন আপন ধর্ম্ম প্রকাশ করছে। আশা, তৃষ্ণা ও ইন্দ্রিয়াদির ধর্ম্ম এই যে ঈপ্সিত ভোগ যত পাবে উত্তরোত্তর তারা ততই বাড়বে। আগুনে ঘি দিলে যেমন আগুন প্রবল হয় আকাঙ্ক্ষাদিও ভোগ পেলে তেমনি প্রবল হয়। কাজে কাজেই নতুন নতুন পন্থা বা'র ক'রে লোকক্কে ভোগে আসক্ত করে এবং ভোক্তা-কেও শেষে নরকস্থ করে। তাতেই ভগবান গীতার ১৬শ অধ্যায়ের ১৬শ শ্লোকে ব'লেছেন যে,

অনেক চিত্ত বিভ্রান্তা মোহ জাল সমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কাম ভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥

অনেক বিষয় কর্ত্তৃক চিত্ত বিভ্রান্ত হ'য়ে মোহজাল সমাবৃত হওয়াতে, লোকে কাম ভোগে সমাসক্ত হয়, এবং শেষে তারা অপবিত্র নরকে পড়ে।

শিষ্য। পাপাচরণ করেও কেন যে লোক ঐহিক সুখ ভোগ ক'রছে সেটা বুঝলাম। এখন ঐ ধার্ম্মিক লোকটী কেন যে এত কষ্ট পাচ্ছেন তার কারণ কি?

গুরু। ঐ ধার্ম্মিক লোকটী পূর্ব্বজন্মে নিষ্কাম ভাবে তপস্যা ক'রেছেন, সুতরাং তাঁর মনে আকাঙ্ক্ষাদি কিছুই ছিল না, সেইজন্য তাঁর সংস্কারও বিশুদ্ধ পুণ্যময় তৈয়ারি হ'য়েছে, যার ফলে তিনি সাংসারিক কষ্টে প'ড়েও ধর্ম্ম পথ থেকে বিচলিত হন্ নি। আর পূর্ব্বজন্মে তাঁর ঐহিক সুখের কি কোন রকম ভোগের আকাঙ্ক্ষা ছিল না ব'লে, এজন্মে সে সব কিছু পাচ্ছেন্ না, (লোকে যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে দেহত্যাগ করে দেহান্তে সেই গতি প্রাপ্ত হয়), এবং তিনি তা

চান্‌ও না। কেন না, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে ঐহিক সুখ ভোগাসক্ত হ'লে, পরজন্মে পরম সুখের পরমানন্দ উপভোগ হয় না। ঐ ধার্ম্মিক লোকটী সেই পরমানন্দের প্রয়াসী ও অধিকারী, তাতেই তুচ্ছ ঐহিক সুখ তাঁর ভোগ হচ্ছে না। তবে গৃহ দাহ কি শোকাদি কষ্ট উপস্থিত হওয়ার কারণ এই যে, তাঁর পূর্ব্বজন্মের কৃত পাপের সংস্কারের ফলে ঐ সব কষ্ট ভোগ ক'রে সেই সংস্কারূপী রেকর্ড্ ক্ষয় ক'রছেন। তিনি কষ্টে প'ড়েও যখন ধর্ম্ম পথ ত্যাগ করেন্ নি, তখন তার ইহ জীবনের কৃত কর্ম্মের পুণ্যময় অতি বিশুদ্ধ সংস্কার তৈয়ারি হচ্ছে। যার ফলে তিনি অনন্ত সুখ ও পরমানন্দের অধিকারী হবেন্। দেখ চিত্তশুদ্ধির কি মাহাত্ম্য, কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্ম ভিন্ন চিত্তশুদ্ধি লাভ হয় না, বিশেষ গৃহীর পক্ষে। অতএব সকলেরই নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম ক'রতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

শিষ্য। আপনি পুনঃ পুনঃ চিত্তশুদ্ধির কথা ব'লছেন কিন্তু চিত্ত শুদ্ধি কাকে বলে তা আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

গুরু। চিত্তশুদ্ধি মানে নির্ম্মল চিত্ত। অর্থাৎ মনে কোন রকম আকাঙ্ক্ষা স্পৃহা, আশা, তৃষ্ণা রাগ, দ্বেষাদি উৎপন্ন না হওয়া, এবং কোন রিপুর বশ হ'য়ে মন বিচলিত না হওয়া। রাগ, দ্বেষ আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতিই হচ্ছে চিত্তের ময়লা ও আত্মোন্নতির বিশেষ অন্তরায়। মন সেই সব অন্তরায়ের বশবর্ত্তী না হ'য়ে প্রশান্ত এবং পবিত্র ভাব থাকলে তাকেই চিত্তশুদ্ধি বলে। দেখতে পাওনা কত সাধু, কত পণ্ডিত বেদান্ত উপনিষদাদি প'ড়ে কত বই লিখেছেন, শাস্ত্র বাক্যের উপদেশও খুব দেন, বিচারাদিও করেন, কিন্তু নিজের চিত্তশুদ্ধি লাভ না হওয়াতে উপরোক্ত ময়লা গুলি সব মনে লেগেই থাকে। কাজেই পড়া শোনা সব বৃথা হয়। কেন না, চিত্তশুদ্ধি ভিন্ন আসল তত্ত্ব কিছুই অনুভবে

আস্‌বে না। কারণ, হৃদয়াকাশ নির্ম্মল না হ'লে জ্ঞানালোক প্রকাশ পায় না। পাখীতে খাঁচায় ব'সে নানা রকম বুলি বলে, কিন্তু বেড়ালে ধরলেই ট্যাঁ ট্যাঁ করে। চিত্তশুদ্ধি বিহীন উপদেশদাতার দশাও ঠিক তাই।

শিষ্য তাহ'লে চিত্তশুদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন দেখ্‌ছি।

গুরু। নিশ্চয় প্রয়োজন। চাষারা যখন ফসল্‌ বোনে, শস্যের বীজের সঙ্গে শস্যের অনিষ্টকারী ঘাসের বীজ থাক্‌লে, সেগুলি চেলে নিয়ে ফেলে দিয়ে তবে গা বীজ বোনে। তার পরেও যদি জমীতে ফসলের সঙ্গে ঘাসাদি জন্মায়, তাহ'লে সেগুলিকে নিড়িয়ে তু'লে ফেলে দেয়। তেম্‌নি ভজন সাধন কি কোন ক্রিয়া কর্ম্ম করবার সময়, আশা, তৃষ্ণা, দম্ভ, অহঙ্কারাদির বীজগুলিকে বেছে ফেলে দিয়ে অর্থাৎ ত্যাগ ক'রে, হৃদয় ক্ষেত্রে কেবল সাধনের বীজ গুলিই বুন্‌তে হয়। তার মানে, ধ্যান ধারণা, জপাদি ভজন, কি যজ্ঞ দানাদি কর্ম্ম কর্‌বার সময়, মনে কোন ফলাকাঙ্ক্ষা কি দম্ভ অহঙ্কারাদি না ক'রে শুদ্ধচিত্তে কর্‌তে হয়। তবে গা মন ঈশ্বরে একাগ্র হয়, এবং ফলও পাওয়া যায়, নচেৎ ফল হয় না।

শিষ্য। মন একাগ্র ক'রে ব'সে ভজন কচ্ছি হঠাৎ মনে অন্য চিন্তা এসে চিত্তের বিক্ষেপ উপস্থিত করে তার উপায় কি ?

গুরু। তার উপায় ভগবান গীতার ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ২৬শ ও ৩৫শ শ্লোকে ব'লেছেন যে

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চল মস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বসং নয়েৎ ॥
অসংশয়ং মহা বাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥

চঞ্চল স্বভাব মন যে যে বিষয়ে যায়, তাকে সেই সেই বিষয় হ'তে প্রত্যাহরণ ক'রে আত্মাতে স্থির রাখতে হবে। অর্থাৎ ধ্যান জপাদি কর্‌বার সময় মনে বিক্ষেপ উপস্থিত হ'লে, তৎক্ষণাৎ সাবধান হ'য়ে মনকে পুনরায় ধ্যেয় বস্তুতে লাগাতে হবে। যতবার মনে এইরূপ বিক্ষেপ হবে ততবারই মনকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। হে কৌন্তেয়! স্বভাবত চঞ্চল মন যে দুর্নিগ্রহ তাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু হে মহাবাহো! অভ্যাস ও বিষয় বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে নিগ্রহ অর্থাৎ বশী-ভূত ক'র্‌তে হবে। অন্য বিষয়গামী বিক্ষিপ্ত মনকে পুনঃ পুনঃ আহরণ ক'রে ধ্যেয় বস্তুতে লাগানের নাম অভ্যাস। আর সদসৎ বিচারের দ্বারা, অর্থাৎ জগতের সবই মিথ্যা একমাত্র ভগবানই সত্য মনে এইরূপ বিচার ক'রে, সমস্ত বিষয়ের প্রতি আসক্তি ত্যাগের নাম বিষয় বৈরাগ্য। চাষারা যেমন ফসলের অনিষ্টকারী আগাছা-গুলিকে তু'লে ফেল্‌বার জন্য মাঝে মাঝে জমী নিড়িয়ে দেয়, উপা-সকেরও তেম্‌নি সাধনার অনিষ্টকারী বিষয় চিন্তা গুলিকে তু'লে ফেল্‌বার অর্থাৎ ত্যাগ কর্‌বার্‌ জন্য অভ্যাসের দ্বারা মাঝে মাঝে হৃদয় রূপ ক্ষেত্রকে নিড়িয়ে দিতে হয়।

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ, আপনি যা বললেন্‌ তা বুঝলাম। কিন্তু আমি এখন এই ভাবছি যে, ভাল সংস্কার নিয়ে জন্মগ্রহণ কর্‌লেও, চিত্তশুদ্ধ হয়নি ব'লে লোকে যখন আশা তৃষ্ণার বশ হ'য়ে ভোগে আসক্ত হওয়াতে অন্তে নরকে যায়, তখন আর লোকের কল্যাণের আশা কোথায়?

গুরু। কল্যাণের আশা আছে।

শিষ্য। কিসে আছে?

গুরু। পুরুষকারে অর্থাৎ পুরুষার্থে।

শিষ্য। পুরুষার্থ যে কেমন ক'রে কর্‌তে হবে তাত বুঝতে পাচ্ছি না।

গুরু। উদ্যম, যত্ন, চেষ্টা, তিতিক্ষা উপেক্ষা অর্থাৎ ত্যাগস্বীকার, এবং পাপ কর্ম্মের পরিণামে যে দুঃখের অবস্থা ঘটবে সেইটা চিন্তা ক'রে দেখা। এই গুলি অবলম্বন করার নাম এখানে পুরুষার্থ। এই সব উপায় অবলম্বন কর্‌লে মনকে কুপথ থেকে ফেরাতে পারা যায়। নচেৎ আগুণে পোকার পতনের মত মন গিয়ে পাপে পড়ে, এবং প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে ফলও ভোগ করে।

শিষ্য। প্রাকৃতিক নিয়মটা কি?

গুরু। ইহজীবনে পাপাচরণ ক'রে ঐহিক সুখ ভোগ কর্‌লে, পর-জীবনে নিশ্চয়ই দুঃখ ভোগ কর্‌তেই হবে। এইটী প্রকৃতির সংস্থাপিত দৃঢ় নিয়ম, কিছুতেই এ নিয়মের অন্যথা হয় না। যে ব্যক্তি ভোগ সুখে আসক্ত হ'য়ে ভোগ করে, অর্থাৎ যে সুখের জন্য লালায়িত হয়ে ভোগ করে, তাকে আবার পরজন্মে তেমনি দুঃখ পেতে হয়। কেননা, সুখ এবং দুঃখ এক জোড়ায় আগে পাছে চল্‌ছে। সেই জন্য একটা বচন আছে "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানিচ সুখানিচ"। দুঃখ এবং সুখ চাকার মত ঘু'রে ঘু'রে আস্‌ছে। শুধু সুখ দুঃখ ব'লে নয়, জগতের যাবতীয় ব্যাপারই এই নিয়মের অধীন। যেমন শুক্ল পক্ষের পর কৃষ্ণ পক্ষ দিনের পর রাত্রি ইত্যাদি। যেটা যায় তার পর ঠিক তার বিপরীতটা আসে, সুতরাং ইহ-জীবনে ঐহিক সুখে আসক্ত হ'লেই পরজীবনে দুঃখ ভোগ করতেই হবে। প্রাকৃতিক নিয়মে একটী ক্রিয়া হলেই তার পর তার প্রতিক্রিয়া নিশ্চয় হবে।

শিষ্য। জগতের যাবতীয় জিনিস বিপরীত ধর্ম্ম সম্পন্ন ক'রে ভগবান জোড়া জোড়া সৃষ্টি করলেন কেন?

গুরু। এইটী হচ্ছে ঈশ্বরের সৃষ্টি কৌশল। এ কৌশল না থাক্‌লে বিশ্বের সামঞ্জস্য থাকে না। সেই সামঞ্জস্য রাখ্‌বার জন্যই ভগবান বিশ্বের

সকল জিনিস বিপরীত ধর্ম্ম সম্পন্ন জোড়া জোড়া সৃষ্টি ক'রেছেন। যেমন ভগবান ও মায়া এক জোড়া। সুখ দুঃখ, ভাল মন্দ, শীত উষ্ণ, কৃষ্ণপক্ষ শুক্লপক্ষ, দিন রাত্রি, অর্থ ও পরমার্থ ইত্যাদি।

শিষ্য। বাস্তবিক, জগতের সকল বিষয়েই এই রকম বিপরীত ধর্ম্ম সম্পন্ন হ'যে সৃষ্টি হওয়ার কারণ কি ?

গুরু। তার কারণ, ভগবান সৃষ্টির প্রথমেই বিপরীত ধর্ম্ম সম্পান্না মায়াকে নিয়ে নিজে জোড়া হ'লেন, তারপর সমস্ত সৃষ্টি হ'তে লাগল। সুতরাং সমস্ত সৃষ্টি সেই অনুসারে হ'য়েছে, কাজেই বিশ্বের যাবতীয় ব্যাপারেই বিপরীত ধর্ম্ম সম্পন্ন এক এক জোড়া দেখ্‌বে। এখন শোন, ভগবান আর একটী নিয়ম ক'রেছেন এই যে, জোড়ার মধ্যে একটী যেখানে উপস্থিত থাকবে অপরটী সেখানে থাকবে না, তার মানে, একটী সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হ'য়ে না গেলে অপরটী আস্‌তে পারে না। কেন না, সকলেই জোড়া জোড়া অবস্থায় আগা পাছা হ'য়ে চল্‌ছে, অর্থাৎ কার্য্য নির্ব্বাহ করছে। সেই জন্য দিনের বেলায় রাত্রি আসে না সুখের সময় দুঃখ আসে না ইত্যাদি। প্রকৃতির যখন যেমন কাজ হবে, তার পরে ঠিক তার বিপরীতটী হবে। প্রাকৃতিক পদার্থেও সেই সামঞ্জস্য দেখ্‌তে পাওয়া যায়। দেখ হিমালয়ের শৃঙ্গ যত উচ্চ, সমুদ্রও তত গভীর ইত্যাদি। এখন প্রাকৃতিক এই নিয়মানুসারে যেখানে অর্থের অবস্থান পরমার্থ সেখানে আসতে পারেন না। তার মানে এই যে অর্থে যার আসক্তি থাকে ভগবানে তার আসক্তি জন্মিতে পারে না, সেই জন্য বিষয়ী লোকের কদাচিৎ ভগবৎ প্রেম লাভ হয়।

শিষ্য। আপনি ব'লছেন যে, ঐহিক সুখভোগ করলে দুঃখ ভোগ করতে হবে, তা'হ'লে সংসারে কেও সুখভোগ করবে না ?

গুরু। তুমি আমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারনি। সংসারের লোক

সুখভোগ কর্‌বে না কেন? সুখ কি সংসার থেকে চলে যাবে? তবে কি সুখের জিনিস লোকে সব ত্যাগ: কর্‌বে? তা নয় প্রারব্ধবশে যে সুখ-ভোগ হয় তা নিষিদ্ধ নয়। তবে যতটা সম্ভব অনাসক্ত ভাবে ভোগ করা উচিত; অর্থাৎ এটা না হ'লে আমার চল্‌বেই না এ রকম ভাব না থাকে। অসদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জন ক'রে ঐহিক সুখের চেষ্টা করা, অথবা পাপ বৃত্তির বশবর্ত্তী হয়ে গর্হিত আচরণের দ্বারা ঐহিক সুখে রত হওয়া নিতান্ত অনুচিৎ। যদি কারও মনে সে রকম বেগই হয়, তাহলে উল্লি-খিত পুরুষার্থ ক'রে মনকে পাপ বিষয় থেকে ফেরাতে হয়। লোকের মনও যদি পাপ বিষয়ে যায়, তত্রাচ শরীর্ ন'ড়াতে নেই। অর্থাৎ মনে পাপ চিন্তা হ'লেও তদনুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'তে নেই। মহাত্মা কবীর দাস সেই সম্বন্ধে একটী দোঁহা ব'লেছেন যে,

মন যায়তো যানে দেও মত্ যানে দেও শরীর।
বিনা কামানি খিঁচে কেইসে ছুটে গা তীর।
সব কৈ এইসা কর ভাই কহে দাস কবীর।

মন যদি পাপ চিন্তা করে ক'রতে দাও, কিন্তু শরীরকে সেই পাপ কাজে প্রবৃত্ত ক'র না। মানে এই যে, মনের পাপ মনেতেই লয় কর, খবরদার কাজে হাত দিও না। মহাত্মা কবীর দাস সকলকে এই রকম আচরণ ক'রতে উপদেশ দিয়েছেন্। মনে অবশ্য কাম ক্রোধাদির বেগ উঠতে পারে, কিন্তু সেই বেগ উঠ্‌লেই যে তার বশ হ'য়ে তদনুসারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হ'তে হবে তা নয়। সে বেগ সহ্য ক'রে মনের বেগ মনেই লয় ক'রতে হবে। ভগবান গীতার ৫ম্ অধ্যায়ের ২৩শ শ্লোকে তার উপকারিতা সম্বন্ধে ব'লেছেন যে,

কক্রোতীহৈব যঃ সোঢ়ং প্রাক্‌শরীর বিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥

যে ব্যক্তি শরীর ত্যাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ আজীবন কাল, কাম ক্রোধের বেগ সহ্য ক'রতে পারেন্, অর্থাৎ মনে কাম ও ক্রোধের উৎপত্তি হ'লেও তাদের বশবর্ত্তী হ'য়ে তদনুরূপ কাজ না করেন, তিনিই যোগী এবং তিনিই সুখী। কাম ক্রোধের বেগ সহ্য করা কি সহজ কথা? যেমন ব'ল্‌লাম্ সেই রকম পুরুষার্থ ক'রে প্রথম প্রবল বেগটা সামলাতে পার্‌লেই, শেষে মন আপনিই শান্ত হ'য়ে আসে।

শিষ্য। পুরুষার্থ করা উচিৎ বটে, কিন্তু দুর্ব্বল হৃদয়ে পুরুষার্থ ক'রে পাপ থেকে নিবৃত্ত থাকা, সাধারণের সাধ্যায়ত্ত ব'লে আমার মনে হয় না।

গুরু। তবে আর একটী পুরুষার্থের কথা বলি শোন, এটী সবল দুর্ব্বল সকল হৃদয়েই হ'তে পারে, এবং যত রকম পুরুষার্থ আছে, তার মধ্যে এইটীই শ্রেষ্ঠ। পুরুষার্থটী এই যে সেই সময়ে ভগবানের শরণ নেওয়া মনে পাপের বেগ প্রবল হ'লে পরে, সেই পাপ কর্ম্ম থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হৃদয়ে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা। যিনি যে মূর্ত্তির উপাসনা করেন, অথবা যাঁর যে মূর্ত্তির প্রতি প্রীতি আছে, তাঁর সেই মূর্ত্তির ধ্যান ক'রে উপস্থিত পাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করা। কোন রকম ক'রে বেগের প্রথমটা সাম লাতে পারলেই রক্ষা পাওয়া যায়। রামায়ণে সেই মর্ম্মে রাবণ লক্ষ্মণকে উপদেশ দিয়েছেন যে, "শুভস্য শীঘ্রং অশুভস্য কাল হরণম্" মনে পাপ ইচ্ছা হ'লে, সেই ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে বিলম্ব করবে। কেননা, বিলম্ব হ'লে শেষে পাপ ইচ্ছাটা আর থাকবে না।

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ, শেষের পুরুষার্থটা এবং প্রথম বেগ সহ্য করার উপদেশটা আমার ভাল ব'লেই বোধ হচ্ছে।

গুরু। হাঁ, এই রকম পুরুষার্থ অবলম্বন ক'রে পাপে বিরত থাক্‌লে লোকের কল্যাণ হয়। কেননা, তাহ'লে লোকে বিনা বাধায় ভগবানের দিকে ক্রমেই এগিয়ে যেতে পাবে।

শিষ্য। ক্রমেই ভগবানের দিকে এগিয়ে যেতে পাবে এ কথার অর্থ আমি কিছু বুঝতে পার্‌লাম না।

গুরু। আজ থাক্ সে অনেক কথা কা'ল হবে।

চতুর্থ দিন।

শিষ্য। আমার কা'লকার প্রশ্নটীর উত্তর আজ বলুন। কি ক'রে লোকে ভগবানের দিকে এগিয়ে যায়?

গুরু। যিনি ঐ রকমে পাপ বৃত্তি দমন করতে পারেন, তাঁকে পাপ কর্ম্মে লিপ্ত হ'য়ে নীচে নামতে হয় না। তিনি যদি ভজন সাধন ক'রতে নাও পারেন, তবুও তিনি ক্রমেই ভগবানের দিকে এগিয়ে যাবেন। পাপ হচ্ছে ভগবদ্ রাস্তার প্রতিরোধক।

শিষ্য। ভজন সাধন না ক'রেও যে কি ক'রে লোকে ভগবানের দিকে এগিয়ে যাবে, সে বিষয় খুলে না ব'ল্‌লে আমি বুঝতে পার্চ্ছি না।

গুরু। জগতের যাবতীয় প্রাণীই প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্ত্তী হ'য়ে, আপন আপন যোনীর গতি অনুসারে ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কারণ যেখান থেকে উৎপত্তি হ'য়েছে আবার সেইখানে ফিরে গিয়ে নিবৃত্তি হবে। এইটী বিশ্ব রাজ্যের প্রাকৃতিক সুদৃঢ় নিয়ম। এই সচরাচর বিশ্ব পরমাত্মা থেকে উৎপন্ন হ'য়েছে, চক্র পথ ঘুরে আবার তাঁতেই গিয়ে নিবৃত্তি হবে। পৃথিবী থেকে ঢিল ছুঁড়্‌লে, ঢিলটী আবার পৃথিবীতেই ফিরে আস্‌বে। তুমি যেটী নিক্ষেপ ক'রবে, সেটী আবার ফিরে তোমার কাছেই আস্‌বে। অর্থাৎ তুমি লোকের প্রতি যেমন ব্যবহার ক'রবে—লোকেও তোমার প্রতি সেই রকম ব্যবহার কর্‌বে। তুমি যদি সমস্ত প্রাণীর প্রতি হিংসাত্যাগ কর, তাহলে সমস্ত প্রাণীও তোমার প্রতি হিংসা ত্যাগ কর্‌বে। এমন কি হিংস্রক প্রাণীরাও তোমার হিংসা কর্‌বেনা। সেই কথা পতঞ্জল ঋষি যোগসূত্রের সাধন পাদের ৩৫শ শ্লোকে ব'লেছেন যে,

অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং
তৎসন্নিধৌ বৈর ত্যাগঃ ॥

যার হৃদয়ে সম্পূর্ণরূপে হিংসা ত্যাগ হয়েছে, তাঁর নিকট সমস্ত প্রাণীই হিংসা ত্যাগ করে। তাঁর ত হিংসা করেই না, এমন কি তাঁর নিকটে হিংস্রক প্রাণীরাও তাদের পরস্পরের মধ্যেও হিংসা ত্যাগ করে। পুরাণে শোন না যে, ঋষিদের আশ্রমে বাঘ, ভালুক, হরিণ, সাপ প্রভৃতি পরস্পর হিংসা ত্যাগ ক'রে এক সঙ্গে খেলা ক'রত। তার কারণ, ঐ প্রাণীরা অহিংসা প্রতিষ্ঠিত ঋষিদের কাছে থাকৃত ব'লে তাদের মনে হিংসার উদ্রেক্ হ'ত না।

শিষ্য। জগতের যাবতীয় প্রাণীই প্রাকৃতিক নিয়মে ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ব'ল্লেন্, কিন্তু কি ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেইটা শোন্-বার জন্য বড়ই কৌতুহল হচ্ছে।

গুরু। যেখান থেকে উৎপত্তি হয় সেইখানেই আবার ফিরে গিয়ে লয় হয় এটা বুঝেছ ত?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ তা বুঝেছি।

গুরু। বৃষ্টি এবং সৃষ্টির নিয়ম একই রকম। সমুদ্র থেকে বাষ্প উঠে মেঘ সঞ্চার হয়, পরে সেই মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়, এবং সেই বৃষ্টির জল নদ নদী দিয়ে ব'য়ে গিয়ে আবার সমুদ্রেই মেশে। সমুদ্র থেকে বাষ্প উৎপন্ন হ'য়ে নানা আকারে চক্র ঘু'রে শেষে যেমন গিয়ে সমুদ্রেই মেশে, এই সচরাচর বিশ্ব পরমাত্মা থেকে উৎপন্ন হ'য়ে নানা আকারে চক্র পথ ঘু'রে শেষে পরমাত্মাতেই মেশে অর্থাৎ লয় হয়। এই বিশ্ব যখন ঈশ্বরেতে মেশবার জন্য চক্রপথে যাচ্ছে, তখন কাজেই বিশ্বের সমস্ত প্রাণীই সেই সঙ্গে সঙ্গে আপন আপন যোনীর গতি অনুসারে ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

শিষ্য। জগতস্থ সমস্ত প্রাণী আপন আপন যোনীর গতি অনুসারে কি রকম ভাবে ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে?

গুরু। রেলে, ষ্টীমারে অথবা হাঁটা রাস্তায় গেলে তোমাকে এক কথায় বুঝাতে পার্‌তাম্ কিন্তু এ বিষয়টী তেমন নয়। ক্রমে বিবরণ বলে যাই তুমিও ক্রমে বুঝ্‌তে থাক। শাস্ত্রে ব'লছে ৮৪ লাখ যোনী আছে, অর্থাৎ ৮৪ লক্ষ প্রকার প্রাণী আছে। তার মধ্যে মনুষ্য যোনীই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেননা, মানুষই কেবল কর্ম্মের দ্বারা ভক্তিলাভ ক'রে তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হ'য়ে, অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বরূপ জেনে, মায়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়, মানে মুক্তি পায়। ৮৪ লক্ষ যোনী ঘু'রে এসে সর্ব্বশেষে এই মনুষ্য যোনীতে জন্ম হয়। সেই জন্য মনুষ্য জন্মকে দুর্লভ জন্ম বলে। এমন কি, দেবতারাও মনুষ্যজন্মের আকাঙ্ক্ষা ক'রে থাকেন। কারণ, তাঁদেরকেও মনুষ্যজন্ম নিয়ে তদনুরূপ কর্ম্মের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ ক'রে তবে মুক্তিলাভ কর্‌তে হয়।

শিষ্য। বড় আশ্চর্য্য কথা। দেবযোনী মানুষের চেয়ে উচ্চ যোনী, তবে তাঁদের আবার মনুষ্যজন্ম নিতে হবে কেন?

গুরু। কর্ম্ম ক'রে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতঃ মুক্তি পাওয়ার জন্য দেবতাদের মনুষ্যজন্ম নিতে হয়। স্বর্গলোক কেবল ভোগের স্থান, সুতরাং সেখানে কর্ম্ম নাই কেবল ভোগ আছে। মানুষ পুণ্যকর্ম্মের ফলভোগের জন্যই স্বর্গে দেবতারূপে বাস করেন, এবং দেবভোগ্য ভোগসকল উপভোগ করেন। যেমন ইন্দ্রকে শতক্রতু বলে, অর্থাৎ যিনি শত অশ্বমেধ্ যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সমাপন কর্‌তে পারেন্ তিনিই ইন্দ্র হন্ ইত্যাদি। পরন্তু, পুণ্য ক্ষয় হ'লে অর্থাৎ পুণ্য কর্ম্মজনিত সুখ ভোগ শেষ হ'লে আবার মর্ত্ত্যলোকে এসে মনুষ্যজন্ম নিতে হয়। ভোগাকাঙ্ক্ষা কাম্যকর্ম্মীদের এই রকম দশা ঘ'টে থাকে। পরন্তু নিষ্কামকর্ম্মীদের কর্ম্মফল ভোগের অভাব হেতু

তাঁদের আর জন্ম নিতে হয় না। কাম্যকর্ম্মীদের সে স্বর্গ থেকে ফিরে আস্‌তে হয় ভগবান তা গীতার ৯ম্‌ অধ্যায়ের ২০শ ও ২১শ শ্লোকে বলেছেন যে,

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূত পাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থযন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্‌ দিবি দেব ভোগান্‌॥
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গ লোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ী ধর্ম্ম মনু প্রপন্না
গতাগতং কাম কামা লভন্তে॥

হে অর্জ্জুন! বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান পর, সোমপায়ী বিগত পাপ মহাত্মাগণ যজ্ঞ দ্বারা আমার অর্চ্চনা করতঃ দেবলোক লাভের প্রার্থনা করেন এবং অতি পবিত্র দেবলোক প্রাপ্ত হ'য়ে উৎকৃষ্ট দেব-ভোগ সব উপভোগ ক'রে থাকেন। সেই বিপুল, স্বর্গ সুখ ভোগ ক'রে পুণ্যক্ষয়ে, পুনর্ব্বার মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করেন অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করেন। কোন স্বর্গেই নিস্তার নাই। সেইজন্য ভগবান গীতার ৮ম্‌ অধ্যায়ের ৬শ শ্লোকে ব'লেছেন যে,

আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥

হে কৌন্তেয়! পুণ্য ক্ষয় হ'লে, ব্রহ্মলোক থেকেও পুনর্ব্বার ফিরে আস্‌তে হয়, অর্থাৎ মনুষ্য জন্ম নিতে হয়। পরন্তু আমাকে পেলে

অর্থাৎ জানলে তার মানে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করলে আর জন্ম নিতে হয় না।

শিষ্য। ভগবান যে ব'ললেন্ ব্রহ্মলোক থেকেও ফিরে আসতে হয়, তাহ'লে স্বর্গ কটা আছে?

গুরু। ভূর্লোক এই পৃথিবী এবং ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক বা ব্রহ্মলোক। এই উর্দ্ধস্থ ছয়টী লোককেই স্বর্গ বলে। তার মধ্যে সত্য বা ব্রহ্মলোক সর্ব্বোপরি। ভগবান ব'লছেন যে, সকাম পুণ্যকর্ম্মকারী যদি সেই ব্রহ্মলোকও প্রাপ্ত হন কিন্তু পুণ্য ক্ষয় হ'লে তাঁকেও পুনরায় মর্ত্ত্যে ফিরে আসতে হবে, অর্থাৎ মনুষ্য জন্ম নিতে হবে।

শিষ্য। স্বর্গ ত শুনলাম এখন পাতাল কটা তাও অনুগ্রহ ক'রে বলুন।

গুরু। তল, অতল, বিতল, নিতল, তলাতল, মহাতল এবং সুতল। এই সাতটী অধোভুবন এবং পৃথিবী থেকে ব্রহ্মলোক এই সাতটী উর্দ্ধ ভুবন এই মোট চোদ্দভুবন। আর একটা বিষয় তোমাকে বলি জেনে রাখ। পাতাল ব'ললেই যে, পৃথিবীর মধ্যদেশে সেই সব পাতাল আছে তা যেন ভেব না। পাতাল পৃথিবীর বাইরে। সেখানেও পাতালবাসী জীব আছে তারাও ৮৪ লাখ্ যোনীর অন্তর্গত।

শিষ্য। মানুষ যাঁরা পুণ্যকর্ম্মের ফল ভোগের জন্য স্বর্গে যান্, তাঁরাই না হয় পুণ্য ক্ষয় হ'লে পুনরায় মর্ত্ত্যে এসে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু দেবতাদের ত সে রকম করতে হয় না।

গুরু। স্বর্গে অর্থাৎ দেবলোকে দেবতা ভিন্ন অন্য যোনীর প্রাণীর বাসের অধিকারই নাই। সুতরাং দেবলোকে যাঁরা বাস করেন তাঁরা সকলেই দেবতা। তবে অবশ্য ছোট বড আছে। কোন দেব-

তার ঐশ্বর্য্য বেশি, কোন দেবতার ঐশ্বর্য্য কম, কোন দেবতার দীর্ঘ-কাল স্থিতি, কোন দেবতা অল্পকাল স্থায়ী, ফলতঃ ফিরতে হবে সবাই-কেই। ভোগাকাঙ্ক্ষী মানুষই পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হন, এবং দেবলোকে বাস করেন, এবং দেবভোগ সব উপভোগ করেন। স্বর্গের সঙ্গে দেবতাদের কেবল ভোগের সম্বন্ধ, কিন্তু মুক্তিলাভ করতে হ'লেই আবার মানুষ হ'তে হবে।

শিষ্য। মানুষ ও দেবতা সম্বন্ধে এই বুঝ্‌লাম যে সকলকেই তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ ক'রে মুক্তি নিতে হবে কিন্তু অন্যান্য প্রাণীদের সম্বন্ধে কি রকম?

গুরু। মনুষ্যেতর প্রাণীর তত্ত্বজ্ঞান লাভের অধিকার নাই সুতরাং তাদের মুক্তিলাভের কোন সম্ভাবনা নাই। সেই জন্য ঐ সকল প্রাণীর যোনীকে মূঢ় যোনী বলে। মূঢ় যোনীর প্রাণীরা পর পর সমস্ত যোনী ঘু'রে, অর্থাৎ সকল যোনীতে জন্ম নিয়ে সর্ব্বশেষে মনুষ্য যোনীতে জন্ম-গ্রহণ করে।

শিষ্য। তবে আপনি যে বললেন জগতস্থ সমস্ত প্রাণীই প্রাকৃতিক নিয়মে ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মূঢ় যোনীর প্রাণীর যখন মুক্তি-লাভের অধিকারই নাই, তখন আর তারা ঈশ্বরের দিকে এগুবে কি ক'রে? মুক্তি মানে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া।

গুরু। প্রাকৃতিক নিয়মে জগৎ যখন ঈশ্বরের দিকে যাচ্ছে, তখন জগতস্থ সমস্ত প্রাণীরাও আপান আপন যোনীর গতি অনুসারে সেই সঙ্গে যাচ্ছে।

শিষ্য। আপনি যে ব'লেছেন প্রাণীরা আপন আপন যোনীর গতি অনুসারে যাচ্ছে তার মানে কি?

গুরু। প্রাণীদের যাওয়ার গতি দ্রুত এবং মৃদু দুই রকমই আছে,

অর্থাৎ যারা শীঘ্র পৌঁছিবে তাদের গতি দ্রুত আর যারা বিলম্বে পৌঁছিবে তাদের গতি মৃদু। যাবতীয় প্রাণীর মধ্যে মানুষই কেবল ঈশ্বরের নিকট শীঘ্র পৌঁছিতে পারবে।

শিষ্য। এখানে আমার একটা সংশয় হচ্ছে। আপনি ব'লছেন যে জগতস্থ সমস্ত প্রাণীই প্রাকৃতিক নিয়মে ঈশ্বরের দিকে যাচ্ছে, কিন্তু যোনীর গতি অনুসারে চ'লেছে কেও দ্রুত কেওবা মৃদু। তাহলে মনুষ্য এবং মনুষ্যেতর প্রাণীর তারতম্য রৈল কৈ ?

গুরু। মনুষ্য এবং মনুষ্যেতর প্রাণীতে তারতম্য আছে বৈ কি। ঈশ্বরের নিকট পৌঁছান মানে এবং ঈশ্বরকে জানা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ মানে বিভিন্ন তুমি ব্যস্ত না হ'য়ে শোন সমস্ত বিষয়ই পরে ক্রমে খুলে ব'লছি। আগে যে ব'ললাম মানুষ ঈশ্বরের নিকট শীঘ্র পৌঁছতে পারবে। তার মানে এই যে মানুষেরই কেবল ঈশ্বরকে জানবার অধিকার আছে মনুষ্যেতর প্রাণীর সে অধিকার নাই। মানুষ সমস্ত যোনী অতিক্রম করে শেষে যে যোনীতে জন্ম নিয়ে ভগবানের দর্শন পাবে সেই মনুষ্য যোনীতে জন্মেছে, সেই জন্য মনুষ্য যোনীর প্রাণীর গতি দ্রুত। আবার মৃদু যোনীর প্রাণীর মধ্যেও যোনী অনুসারে গতির তারতম্য আছে। কেননা, যারা মনুষ্য যোনীর কাছাকাছি এসেছে, তাদের গতি অপেক্ষাকৃত দ্রুত ব'লতে হবে।

শিষ্য। তবে কি মনুষ্য মাত্রেরই গতি দ্রুত ?

গুরু। মনুষ্যেতর প্রাণী অপেক্ষা মানুষের গতি নিশ্চয় দ্রুত তার কারণ আগে বললাম। আবার মনুষ্যের মধ্যেও গতির তারতম্য আছে। তারতম্য এই যে, সাধারণ চক্রপথে না গিয়ে পাগ্‌ডাণ্ডী (সোজাসুজি) রাস্তায় মানুষ আরও শীঘ্র ঈশ্বরের নিকট পৌঁছিতে পারে। এই পাগ্‌ডাণ্ডী (সোজাসুজি) রাস্তায় মনুষ্যেতর প্রাণীর যাওয়ার অধিকার নাই।

শিষ্য। এই বিশ্ব যে ঈশ্বরের দিকে যাচ্ছে তা বুঝ্‌লাম, কিন্তু সাধারণ চক্রপথ, পাগডাণ্ডী রাস্তা যে কি তা বুঝ্‌তে পারলাম না।

গুরু। মনে কর, সাধারণ রাস্তাটা ঘোড়দৌড়ের রাস্তার মত চক্রাকার। এই বিশ্ব ঈশ্বর থেকে উৎপন্ন হ'য়ে চক্রপথে চ'লেছে, এবং সমস্ত রাস্তাটা ঘু'রে অতিক্রম ক'রে গিয়ে পুনরায় ঈশ্বরেতে লয় হবে। এখন কল্পনা কর, চক্রপথের মধ্যভাগে এক খণ্ড গোলাকার জমী আছে। যেমন ঘোড়দৌড়ের মাঠে থাকে। সেই জমীতে একটী দুরারোহ পাহাড় আছে, এবং ঐ পাহাড়ের উপর দিয়ে পাগডাণ্ডী (সোজাসুজি) রাস্তা আছে। ঐ পাহাড়ে ওঠা প্রথমটা বড় কষ্টকর, কিন্তু কষ্টে সৃষ্টে ঐ পাগডাণ্ডী রাস্তার খানিকটা উঠতে পারলে শেষে আনন্দের সহিত যাওয়া যায়, এবং ভগবানের নিকট খুব শীঘ্র পৌঁছান যায় ও তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান হয় অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। বুদ্ধিমান, তিতিক্ষু, নির্ভীক এবং ভাগ্যবান লোকেরাই ঐ রাস্তায় যেতে চেষ্টা করেন। প্রকৃতি দেবী সাধারণ চক্রপথে জগতকে নিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু বরাবর সেই রাস্তায় যেতে গেলে, ভগবানের নিকট পৌঁছিতে যে কত যুগ যুগান্তর লাগ্‌বে তার ঠিক কি, এবং প্রকৃতির অধীনে গিয়েই বা লাভ কি?

শিষ্য। প্রকৃতির অধীনে গিয়ে লাভ নাই কেন?

গুরু। প্রকৃতির অধীনে গেলে ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হবে না। সজ্ঞানে গঙ্গালাভ হ'ল এক জিনিস আর ম'লে মৃতদেহটা গঙ্গায় ফেলে দেওয়া আর এক জিনিস। পরে সব খুলে বলছি শোন।

শিষ্য। সাধারণ চক্রপথে ত সবাই যাচ্ছে, এখন কি উপায়ে পাগডাণ্ডী রাস্তায় যেতে পারা যায়?

গুরু। অষ্টাঙ্গ যোগসাধন, শাস্ত্র এবং গুরু বাক্য শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, নিষ্কাম কর্ম্মযোগ, তীব্র বৈরাগ্য ও উর্জ্জিতা ভক্তিলাভ প্রভৃতি

হচ্ছে ঐ পাগডাণ্ডী রাস্তায় যাবার উপায়। বুদ্ধিমান লোকেরাই ঐ রাস্তায় যেতে প্রযত্ন করেন এবং রাস্তাটীও নিরাপদ।

শিষ্য। সাধারণ রাস্তায় আবার আপদ কি, এবং পাগডাণ্ডী রাস্তাটী নিরাপদই বা কিসে?

গুরু। পাপ,—কাম, ক্রোধ, লোভাদি অনুচরগণকে সঙ্গে নিয়ে ঐ সাধারণ চক্রপথে, চা বাগিচার কুলীর ডিপোর আড্‌কাটীর মত ঘু'রে বেড়াচ্ছে, এবং অনুচরগণকে মানুষের পেছনে লাগিয়ে দিয়ে বা'গাতে পার্‌লেই অমনি নিয়ে গিয়ে নরকে হাজির কর্‌ছে। কেননা, নরকটী পাপের স্থাপিত উপনিবেশ স্বরূপ। কাজেই পিয়ারা দেশটী যাতে ভাল আবাদ হয় অর্থাৎ গুলজার থাকে, পাপ সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টিত আছে। সাধারণ চক্রপথের আপদ এই, কিন্তু পাগডাণ্ডী রাস্তায় পাপ অথবা তদনুচরগণের প্রবেশের অধিকারই নাই, কাজেই এই রাস্তাটী নিরাপদ। অতএব লোকের কোন রকমে পাপের সংশ্রবে না যাওয়াই উচিৎ।

শিষ্য। প্রকৃতি দেবী যখন জগতস্থ সমস্ত প্রাণীকেই চক্রপথে নিয়ে যাচ্ছেন, তখন পাপ যে কেবল মানুষকেই নরকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা কর্‌ছে অন্য প্রাণীকে যে কিছু বলে না তার কারণ কি?

গুরু। মূঢ় যোনীর প্রাণীরা যে নরকেই বাস ক'চ্ছে, তাদের আবার নিয়ে যাবে কোথায়?

শিষ্য। তবে প্রকৃতি দেবী নরকও নিয়ে যাচ্ছেন?

গুরু। নরক আবার রেখে যাবেন কোথা? প্রকৃতি সমগ্র বিশ্ব পরমাত্মা থেকে নিয়ে বেরিয়েছেন, পুনরায় সেই বিশ্ব পরমাত্মাতে পৌঁছে দেবেন এইটী তাঁর কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সমগ্র বিশ্ব যখন যাচ্ছে তখন নরক কি আর বিশ্ব ছাড়া? নরকও যাচ্ছে।

শিষ্য। তাহ'লে নরকের যাথার্থ্য রৈল কৈ? কারণ, নরকটা

কেবল দুঃখময় স্থান। পাপীদের শাস্তি দেবার জন্যই নরকের সৃষ্টি। সেই নরক যদি ঈশ্বরের নিকট যায় তাহ'লে আর নরকে দুঃখ থাকে কি ক'রে?

গুরু। হাঁ, কল্পান্তে নরকও ঈশ্বরের নিকট পৌঁছিবে। কেননা, সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতি দেবীকে পৌঁছে দিতে হবে, কাজেই নরকও সেই সঙ্গে যাবে। কিন্তু গেলে কি হয়? সেই সময়ে জগতস্থ যাবতীয় অজ্ঞান প্রাণীই প্রকৃতি কর্ত্তৃক মোহাচ্ছন্ন হ'য়ে চৈতন্য রহিত অবস্থায় নীত হবে। যেমন কোন লোককে ক্লোরোফরম দ্বারা অজ্ঞান ক'রে যদি জগন্নাথদেবের মন্দিরে নিয়ে যাওয়া যায়, তাহ'লে তার জগন্নাথ দর্শন হয়, না—জগন্নাথ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান হয়? প্রকৃতি যখন বিশ্ব নিয়ে পরমাত্মাতে মিশ্‌বেন, তখন বিশ্বস্থ যাবতীয় প্রাণীই অচৈতন্য অবস্থায় থাক্‌বে। জ্ঞানরহিত মূঢ় যোনীর প্রাণী প্রকৃতি কর্ত্তৃক সততই মোহাচ্ছন্ন হ'য়ে আছে, তাদের দশাত খারাপ হবেই অর্থাৎ প্রকৃতি কর্ত্তৃক অচৈতন্য ত হবেই, তার ত কোন কথাই নাই। এখন অজ্ঞান মানুষকেও যে প্রকৃতি দেবী সেই সময়ে মূঢ় যোনীর প্রাণীর সমান অবস্থা ক'রে রেখে দেবেন। দেখ, সর্ব্বোৎকৃষ্ট মনুষ্যজন্ম নিয়েও জ্ঞানের অভাবে মানুষকে মূঢ় যোনীর অবস্থা প্রাপ্ত হ'তে হয়। তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন ঈশ্বরকে কিছুতেই জানা যাবে না। তার প্রমাণ দেখ, অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সখা, একত্র আহার বিহারাদি ক'রতেন এবং সতত একত্র বাস ক'রতেন, তথাচ ভগবান অর্জ্জুনকে ব'লছেন যে, তুমি এই রকম কর তাহ'লে আমাকে পাবে, অর্থাৎ আমার স্বরূপ জান্‌তে পার্‌বে। কেন এ রকম বলেছেন? কারণ, অর্জ্জুন তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন না। অর্জ্জুন যখন সদা সর্ব্বদা এক সঙ্গে থেকেও তত্ত্বজ্ঞান না থাকা হেতু তাঁকে জানতে পারেন নি, তখন প্রকৃতি কর্ত্তৃক অজ্ঞান জীব ঈশ্বরের নিকট নীত হ'লেই বা কি ক'রে তাঁকে জান্‌তে পার্‌বে? যে তত্ত্বজ্ঞানই

হ'ল ঈশ্বরকে জানার একমাত্র পদার্থ, সেই তত্ত্বজ্ঞানবিহীন হ'লে মনুষ্য এবং মনুষ্যেতর প্রাণীর অবস্থা সমানই হ'য়ে থাকে।

শিষ্য। অজ্ঞান মানুষ ও মূঢ় যোনীর অবস্থা যদিও সে সময়ে সমান হয়, তত্রাচ মনুষ্য যোনী যে উৎকৃষ্ট তা ত স্বীকার কর্‌তে হবে।

গুরু। হাঁ, মনুষ্য যোনী ত উৎকৃষ্ট বটেই, কিন্তু ব্যক্তিগত উৎকৃষ্টতা অপকৃষ্টতাও ত আছে। যারা ইন্দ্রিয়ারাম অর্থাৎ বিবেকহীন হ'য়ে কেবল ইন্দ্রিয় সুখেই রত থাকে, মানুষ হ'লেও তারা পশ্বাদির সমান, শাস্ত্র এই কথা ব'ল্‌ছে। কারণ, মনুষ্যেতর প্রাণীরও ইন্দ্রিয়াদি সবই ঠিক মানুষের মত আছে, কেবল এক বিবেক (বিচারশক্তি) নাই। সেই বিবেক নিয়েই মনুষ্যত্ব, তা যার নাই সে পশুর সমান নয় ত কি? সেই জন্য মনু ব'লেছেন,

> আহার নিদ্রা-ভয় মৈথুনঞ্চ সামান্য
>
> মেতৎ পশুভির্নরানাম্।
>
> জ্ঞানংনরানামধিকো বিশেষ যে তেন
>
> হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ ॥

আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনাদি মানুষ এবং পশু উভয়েরই সমান, কেবল বিবেক মানুষের বেশির ভাগ আছে। সেই বিবেক যার নাই সে পশুর সমান। এখন ভেবে দেখ বিবেক নিয়েই মনুষ্যত্ব। অতএব সকলেরই বিবেকানুসারে চলা উচিত।

শিষ্য। মানুষ কত রকম শিল্প কাজ কর্চ্ছে, ভাল খায় ভাল জায়গায় বাস করে, ভাল অবস্থায় থাকে কেবল এক বিবেকটা না থাক্‌লেই কি পশুর সমান হবে?

গুরু। হাঁ, বিবেক ছাড়া আর বৃত্তিগুলিই মানুষ ও পশুর সমান।

মানুষের যেমন দশটী ইন্দ্রিয় ও কাম ক্রোধাদি রিপুগণ আছে, ইতর প্রাণীরও ঠিক তাই আছে। যে বুদ্ধিবলে মানুষে উপার্জ্জন ক'রে নিজে খায় ও স্ত্রী পুত্রাদিকে খাওয়ায়, সেই বুদ্ধিবলে ইতর প্রাণীরাও খাদ্য সংগ্রহ ক'রে নিজে খায় ও সন্তানাদিকে খাওয়ায়। মানুষে যেমন নানাবিধ উপায় অবলম্বন ক'রে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে, ইতর প্রাণীরাও তেম্‌নি নানাবিধ উপায় অবলম্বন ক'রে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে। মানুষে যেমন কোন বস্তু নিয়ে ঝগ্‌ড়া মারামারি কি মাম্‌লা মোকর্দ্দমা করে ই·র প্রাণীরাও তেম্‌নি খাদ্যদ্রব্য কি বাসস্থান নিয়ে পরস্পর ঝগড়া মারামারি করে। মানুষে সুখ দুঃখে যেমন হর্ষ শোক প্রাপ্ত হয়, ইতর প্রাণীরাও তেমনি সুখ দুঃখে হর্ষ শোক প্রাপ্ত হয়। ইতর প্রাণীর নিকটে স্ব শ্রেণীর প্রাণী এলে যেমন সিং দিয়ে গু'তোয় কিম্বা ঘেও ঘেও করে এবং কাছে আস্‌তে দেয়না, মানুষেও তেম্‌নি রেলের থার্ড ক্ল্যাস গাড়ীতে কেও উঠ্‌তে গেলে কিছুতেই তাকে উঠ্‌তে দেয় না, অথবা কাছে ভিড়্‌তে দেয় না। মানুষে যেমন ভাল ভাল শিল্প কাজ করে, ইতর প্রাণীরাও তেম্‌নি বাসস্থান প্রভৃতি নির্ম্মাণ বিষয়ে অসাধারণ শিল্প-নৈপুণ্য দেখায়, যা মানুষের পক্ষেও করা সম্ভবপর নয়। এখন ভেবে দেখ মনুষ্য এবং মনুষ্যেতর প্রাণী সমান ভাবেই জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ কর্‌ছে। তবে যোনী অনুসারে সেই উপার্জ্জনের পন্থা, ভোগ্য বস্তু ও বাসস্থানাদির বিভিন্নতা আছে মাত্র, কিন্তু বিষয় পরস্পর সমান।

শিষ্য। মনুষ্য এবং মনুষ্যেতর প্রাণীর অবস্থাটা এই বুঝলাম যে, বিবেক ছাড়া মনুষ্য ও মনুষ্যেতর প্রাণীর বিষয় সব পরস্পর সমান, কিন্তু অদৃষ্ট ত সমান নয়।

গুরু। কথাটা নিতান্ত নির্ব্বোধের মত ব'ললে। অদৃষ্ট কি কখন সমান হ'তে পারে? দুরদৃষ্ট বশতই ত মূঢ় যোনীতে জন্ম হ'য়েছে।

তা ছাড়া ভগবদ্ প্রদত্ত একটী বিশেষ অধিকার আছে যে, মানুষ পুরুষার্থের দ্বারা ভাবী অদৃষ্টের উন্নতি সাধন করতে পারে, এবং বর্ত্তমান অদৃষ্টের ফলও সম্যক প্রকারে পেতে পারে।

শিষ্য। মানুষে পুরুষার্থের দ্বারা অদৃষ্ট ফল সম্যক প্রকারে পেতে পারে, আপনার এই কথায় আমার সংশয় হচ্ছে যে, মানুষ যখন অদৃষ্ট ফলই ভোগ করে, তখন পুরুষার্থ করবার প্রয়োজন কি ?

গুরু। হাঁ, অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে, তার বেশী কিছু হবে না। তবে বিনা পুরুষার্থে অদৃষ্ট ফল সম্যক প্রকারে পাওয়া যায় না। ব্যাসদেব নারদ ঋষিকে ঠিক এই প্রশ্নই ক'রেছিলেন। নারদ ঋষি উত্তর দিলেন যে, পুরুষার্থ ভিন্ন অদৃষ্ট ফল সম্যক প্রকারে পাওয়া যায় না। যেমন আগুনে কাঠ দিলে পুঁড়ে ধোয়া হয়, কিন্তু ফুঁ না দিলে জ্বলে না কিম্বা অভীষ্ট কাজ সম্যক প্রকারে পাওয়া যায় না; তেমনি বিনা পুরুষার্থে অদৃষ্ট ফলও সম্যক প্রকারে পাওয়া যায় না। মানুষের সাধ্যমত পুরুষার্থ করা উচিৎ, ফল যেমনই হ'ক। সেইজন্য একটী বচন আছে যে, "যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ। যত্ন চেষ্টা ক'রেও যদি ফল না পাওয়া যায় তাহ'লে জানতে হবে যে অদৃষ্টে নাই। অদৃষ্ট ভেবে ব'সে থাকা কাপুরুষের কার্য্য।

শিষ্য। আমার মনে একটী সংশয় হচ্ছে এই যে, আপনি ব'লছেন যে, সকল লোকের পুরুষার্থ করা উচিৎ, আমি তা মান্‌লাম্, কিন্তু জীব সংস্কার অনুসারেই চ'লে থাকে, যদি সংস্কারে থাকে তবেই ত পুরুষার্থ অবলম্বন করতে মন যাবে, নইলে যাবে কেন ?

গুরু। পুরুষার্থ যে কি তা তুমি এখনও বুঝতে পারনি। পুরুষার্থ আবার সংস্কারে থাক্‌বে কি ? পুরুষার্থের দ্বারাই ভাল সংস্কার তৈয়ারি হয়। লোকের ভাল সংস্কার হচ্ছে পুরুষার্থ সাপেক্ষ। পুরুষার্থ মানে

উদ্যম, চেষ্টা ও যত্ন, সুতরাং এই গুলিকে অবলম্বন ক'রে কর্ম্ম করলে সে কর্ম্মের ফল অর্থাৎ সংস্কার ভাল হয়। আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য হ'ক আর সাংসারিক উন্নতির জন্যই হউক, সকলেরই পুরুষার্থ করা উচিৎ। পুরুষার্থ হীন মানুষ মানুষই নয়।

শিষ্য। সাংসারিক উন্নতির জন্য পুরুষার্থ করা যায়, এবং করলে ফলও পাওয়ার সম্ভব, কেন না, মন তাতে লাগে। পরন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য পুরুষার্থ করা বিশেষ কঠিন ব'লে বোধ হয়। কারণ মন আদৌ সেদিকে যায় না।

গুরু। হাঁ, কঠিন বটে, কিন্তু করাও ত চাই। না করলে যে শেষে মহদ্দুঃখ পেতে হবে। রুগী ওষুধ খেতে না চাইলে তাকে যেমন জোর ক'রে ওষুধ খাওয়াতে হয়, মনকেও তেমনি জোর ক'রে ভগবানে লাগাতে হয়। এরই নাম পুরুষার্থ।

শিষ্য। রুগীকে না হয় ধ'রে বেঁধে ওষুধ খাওয়ান যায়, মনকে ত আর ধ'রতে ছুঁতে পারা যায় না।

গুরু। দেখ, মানুষের বুদ্ধিই হচ্ছে মনরূপ হাতীকে চালাবার এক মাত্র মাহুৎ। পরন্তু, বুদ্ধি সু এবং কু দু রকম আছে। সুবুদ্ধি সুপথে নিয়ে যায় এবং কুবুদ্ধি কুপথে নিয়ে যায়। অতএব সকলেরই সুবুদ্ধি অনুসারে চলা উচিত। বুদ্ধি মানুষের মিত্র আবার বুদ্ধিই মানুষের শত্রু। সেই জন্যই ত ভগবান গীতার ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৫ম শ্লোকে ব'লেছেন যে,

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মন বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মন॥

আত্মার দ্বারা আত্মাকে সংসার থেকে উদ্ধার ক'রবে, আত্মাকে অবসন্ন ক'রবে না। আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার শত্রু। এই

শ্লোক কথিত প্রথম আত্মার মানে বুদ্ধি, তাহ'লে ভগবদ্বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ হচ্ছে এই যে, সুবুদ্ধি অনুসারে চ'লে আত্মাকে সংসার থেকে উদ্ধার করতে হবে এবং কুবুদ্ধি অনুসারে চ'লে আত্মাকে আবদ্ধ ক'রতে হবে না। কাজে কাজেই সুবুদ্ধি আত্মার মিত্র এবং কুবুদ্ধি আত্মার শত্রু।

শিষ্য। লোকে সুবুদ্ধি অনুসারে চ'ল্‌লে যখন ভাল হয়, তখন সেই সুবুদ্ধি হয় কিসে?

গুরু। সৎসঙ্গ, সদালাপ, সৎচিন্তা ও সদ্‌গ্রন্থপাঠ, এইগুলি হচ্ছে সুবুদ্ধি হওয়ার উপায়। অবশ্য সেই সঙ্গে এদের বিপরীতগুলিকেও ত্যাগ করতে হবে। কারণ, যে ব্যক্তি যেমন সঙ্গে থাক্‌বে এবং যে রকম আলোচনা ও চিন্তা কর্‌বে, তার বুদ্ধিও তদনুরূপ হবে।

শিষ্য। এখন আমি বেশ বুঝ্‌লাম যে, লোকের সুবুদ্ধি অনুসারে চলা একান্ত কর্ত্তব্য এবং এটাও বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি যে, অদৃষ্ট ও পুরুষার্থ এই দুইটীকেই আশ্রয় ক'রে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কর্‌তে হবে। অদৃষ্টের ভরসা ক'রে পুরুষার্থ ত্যাগ কর্‌লে লোকের দুর্গতির সম্ভাবনা।

গুরু। তাত নিশ্চয়ই। পাখী যেমন দুটী পাখার আশ্রয় নিয়ে উ'ড়ে বেড়ায়, একটী পাখায় পারে না; মানুষেরও তেম্‌নি অদৃষ্ট ও পুরুষার্থ এই দুটীকে আশ্রয় ক'রে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কর্‌তে হয়, একটীর দ্বারা হয় না।

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ, আমি এই বিষয়টা বুঝ্‌লাম। এখন আমার আগেকার বিষয়ের একটু গোল আছে সেইটা মিটিয়ে দিন। আপনি সে দিন বল্‌লেন যে, ভোগের দ্বারা প্রারব্ধ ক্ষয় হয়। তা হ'লে লোকে যে এত ভজন সাধন করেন, তাঁদেরও কি বিনা ভোগে প্রারব্ধ ক্ষয় হবে না?

গুরু। তোমার এ প্রশ্নটী বড় কঠিন। এর উত্তর এক কথায় দিতে পারা যায় না কারণ বিষয়টা অতীব জটিল, তাতে আবার প্রত্যক্ষ

প্রমাণ কিছু নাই। ঋষিরা এক একটী বিষয় নিয়ে গবেষণা ক'রেছেন, এবং ধ্যানের দ্বারা সে সম্বন্ধে অনুভব জ্ঞান লাভ ক'রে তবে তাঁরা তার মীমাংসায় উপনীত হ'য়েছেন। তোমার এই প্রশ্নের তিনটী উত্তর অর্থাৎ তিন প্রকার মীমাংসা শাস্ত্রে আছে। তার মানে এই যে অধিকারী ভেদে তিন প্রকারে প্রারব্ধ ক্ষয় হ'য়ে থাকে। এখন সেই তিনটী মীমাংসার নাম দেওয়া যাক্ যে, সাধারণ নিয়ম, অসাধারণ নিয়ম ও নিয়মাতীত অর্থাৎ নিয়ম বহির্ভূত।

শিষ্য। এখন এই তিনটী মীমাংসার কোন্‌টী ঠিক?

গুরু। তিনটী মীমাংসাই ঠিক।

শিষ্য। তাও কি কখন হয়? একজন প্রারব্ধ ভোগ ক'র্‌বে আর একজন ভোগ কর্‌বে না। একটা কথার উত্তর হাঁ এবং না দুই ত হ'তে পারে না, এক্‌টাই হবে।

গুরু। প্রারব্ধ ভোগ সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম এই যে, ভোগ ভিন্ন কিছুতেই ক্ষয় হবে না। অসাধারণ নিয়ম এই যে, বিনা ভোগেও ক্ষয় হবে, অর্থাৎ ভোগ থেকে রেহাই পাবে, এবং নিয়মাতীত এই যে ভোগ করেও ভোগ করেন্ না।

শিষ্য। প্রাকৃতিক নিয়ম অপরিবর্ত্তনীয় কিন্তু প্রারব্ধ ভোগ সম্বন্ধে নিয়মের পরিবর্ত্তন হচ্ছে। তাহ'লে প্রাকৃতিক নিয়মের সামঞ্জস্য রৈল কৈ?

গুরু। এতে প্রাকৃতিক নিয়মের অসামঞ্জস্য কিছু দেখা যায় না। এই তিনটী মীমাংসাই প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে তিন রকম অধিকারীর পক্ষে নির্দ্দিষ্ট হ'য়েছে। যে যেমন কর্ম্ম করবে সে তেমন ফল ভোগ কর্‌বে এটা যেমন প্রাকৃতিক নিয়ম, আবার যে যেমন অধিকারী হবে তার প্রারব্ধ সেই রকমে ক্ষয় হবে, সেটাও তেমনি প্রাকৃতিক নিয়ম।

শিষ্য। আমি এই বিষয়টী বুঝতে পাচ্ছিনা, যাতে এ রহস্য বুঝ্তে পারি সেই ভাবে ঠিক করে বলুন।

গুরু। আমি ঠিকই ব'লেছি। এ প্রশ্নের উত্তর হাঁ এবং না দুইই বটে। এক বিষয়ই ব্যক্তিবিশেষের কাছে হাঁ হচ্ছে, এবং ব্যক্তিবিশেষেব কাছে না হচ্ছে। এখন এই তিনটী মীমাংসা সম্বন্ধে শাস্ত্রে যা ব'ল্ছে তা শোন। প্রাক্তন ফল বা সংস্কার তিন ভাগে বিভক্ত সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মান। বহু জন্মজন্মান্তরের সংস্কার যা দেহেব মধ্যে মজুত্ হ'য়ে আছে তাকে সঞ্চিত বলে। তার মধ্যে থেকে যে কয়খানি সংস্কাররূপী রেকর্ড খতম্ করবার জন্য এই দেহরূপ মেসিন্ পাওয়া গিয়েছে, অর্থাৎ জন্ম হ'য়েছে তাকে প্রারব্ধ বলে। আর যে সংস্কাররূপ রেকর্ডখানি দেহরূপ মেসিনে ঘু'র্ছে, অর্থাৎ জীবনের যে কর্ম্ম উপস্থিত চ'ল্ছে তাকে ক্রিয়মান বলে। বেদান্ত ব'ল্ছেন্ যে, প্রারব্ধ ফল অর্থাৎ যে ফলভোগ কর্‌বার জন্য জন্ম হয়েছে, তা ভোগ ক'র্‌তেই হবে। তাতেই তিনি ব'ল্ছেন যে,

অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং।
নভুক্তং ক্ষীযতে কর্ম্মকল্প কোটী শতৈরপি॥

মনুষ্যের কৃত পুণ্য অথবা পাপ কর্ম্মের ফল অবশ্যই ভুগ্‌তে হবে। শত কোটী কল্প গত হ'লেও বিনা ভোগে সেই কর্ম্মফল ক্ষয় হবে না। যেমন নিক্ষিপ্ত শর লক্ষ্য ভেদ না ক'রে নিবৃত্তি হয় না, প্রারব্ধ ফলও তেম্‌নি ভোগ না হ'য়ে নিবৃত্ত অর্থাৎ ক্ষয় হয় না।

শিষ্য। আপনি নিক্ষিপ্ত শরের সঙ্গে প্রারব্ধ ফলের উদাহরণ দিলেন আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লাম না।

গুরু। মনে কর, একজন ক্ষত্রিয় বীর পাহাড় অঞ্চলে জঙ্গলে শীকার কর্‌তে গিয়েছে। ক্ষত্রিয় গো-ব্রাহ্মণেব রক্ষাকারী, সুতরাং শীকারে গরু

অবধ্য। শীকারীটী পাহাড়ের উপর উ'ঠে নীচের চারিদিকে জঙ্গল সব চেয়ে দেখ্‌ছে, এমন সময় দেখ্‌তে পেল যে, একটা ঝোঁপের মধ্যে একটী হরিণ চ'রছে, আর সে অমনি একটী শর মেরেছে। শরটী ধনুক থেকে যেমন ছেড়েছে, আর তৎক্ষণাৎ সেই লাল রঙ্গের গরুটা মাথা তু'লেছে। তখন সেই শীকারীটী ব্যস্ত ও অনুতপ্ত হ'ল, কিন্তু যে শর সে ছেড়েছে তা আর ফেরাবার উপায় নাই। তেমনি প্রারব্ধ রূপ যে শর জীবনের সঙ্গে ভোগের জন্য নিক্ষিপ্ত হয়েছে অর্থাৎ এসেছে, তাও ভোগ না হ'য়ে নিবৃত্ত হবে না অর্থাৎ ক্ষয় হ'বে না। এইটী প্রাকৃতিক সাধারণ নিয়ম।

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ, এটা বুঝ্‌লাম। অসাধারণ নিয়মটী কি ?

গুরু। যিনি ভগবানের পরাভক্তি লাভ করেন, তিনি প্রারব্ধ ভোগ থেকে রেহাই পান। ভগবদ্ভক্তি লাভ কর্‌লে যে কেবল প্রারব্ধ ক্ষয় হবে তা নয়, সমস্ত প্রাক্তন ফলই ধ্বংস হ'য়ে যায় সংস্কারের নামগন্ধও থাকে না। সেই সম্বন্ধে ভগবান শ্রীমদ্‌ভাগবতে উদ্ধবকে ব'লছেন যে,

যথাগ্নি সুসমিদ্ধার্চি করত্যে ধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈ ধাংসি কৃতস্নসঃ॥

হে উদ্ধব! আগুন যেমন কাঠকে পুড়িয়ে ভস্মসাৎ ক'রে ধ্বংস করে, আমার ভক্তি লাভ কর্‌লে (অবশ্য এ ভক্তি পরাভক্তি) আমার ভক্তেরও তেমনি পাপরাশি ধ্বংস হ'য়ে যায়। এখন ভগবদ্বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ বুঝ। ভগবান ব'লছেন যে, আমার ভক্তি লাভ কর্‌লে আমার ভক্তের সমস্ত পাপ ধ্বংস হ'য়ে যায়। লোকের পাপ ব'লে কোন জিনিস অথবা পাপ কর্ম্ম ত মজুত থাকে না। পাপ কর্ম্মের ফলই সংস্কাররূপে থাকে। কেন না, পরজন্মে ভোগ হবে। তাহ'লে দেখ, প্রারব্ধ বা সংস্কার বিনা ভোগে ক্ষয় হ'য়ে যাচ্ছে।

শিষ্য। তা হলে আপনি এখনি যা বললেন এটা কিন্তু তার বিপরীত হচ্ছে, অর্থাৎ জীবনের সঙ্গে নিক্ষিপ্ত প্রারব্ধরূপ শর লক্ষ্যভেদ না করেই নিবৃত্ত হচ্ছে।

গুরু। পুরাণে শুনতে পাওনা যে একজন যোদ্ধার নিক্ষিপ্ত শর তার প্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধার শরের দ্বারা শূন্যমার্গেই বিনষ্ট হয়। সে বাণ আর লক্ষ্যভেদের জন্য লক্ষ্যের নিকট পৌঁছিতেই পারে না। সংগ্রামের সময় যেমন এক যোদ্ধার নিক্ষিপ্ত শরকে অপর যোদ্ধা কেটে দেয় অর্থাৎ ব্যর্থ করে। তেমনি জীবন সংগ্রামের প্রারব্ধরূপ নিক্ষিপ্ত শরও ভগবদ্কৃপা-রূপ শর দ্বারা বিনষ্ট হ'য়ে যায়। ভগবান শঙ্করাচার্য্যও শ্রুতির উল্লেখ ক'রে বলেছেন যে,

ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে।
বহুত্বং তন্নিষেধার্থং শ্রুত্যা গীতং যতঃ স্ফুটম্ ॥

শ্রুতিতে স্পষ্টরূপে উক্ত আছে যে, সেই পরাৎপর পরমাত্মার দর্শন-লাভ হলে (দৃষ্টে মানে কৃপা হ'লে) সমস্ত কর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মফল ক্ষয় হ'য়ে যায়। তার মানে সংস্কার সমূহ বিনা ভোগেই ক্ষয় হয়। কর্ম্মফল বা সংস্কার সমূহ তিনভাগে বিভক্ত, সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মান, সুতরাং এই বহু শব্দ প্রাক্তন ফল সম্বন্ধে, ঐ তিনটারই অভাব প্রতিপাদনের জন্য প্রয়োগ হয়েছে। ভগবানও গীতার ১৮শ অধ্যায়ের ৬৬টি শ্লোকে ব'লেছেন্ যে,

সর্ব্ব ধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ ॥

হে অর্জ্জুন! সমস্ত ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে একমাত্র আমারই শরণ নেও,

তা'হলে আমি তোমায় সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত ক'র্ব, অর্থাৎ মুক্তি দিব। তুমি কোন চিন্তা ক'র না।

শিষ্য। ভগবান সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত কর্বেন, কিন্তু মুক্তির কথাত কিছু ব'ল্ছেন্ না।

গুরু। হাঁ, সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত ক'রব মানেই হ'ল মুক্তি দিব। জন্ম মৃত্যু যন্ত্রণা যে পাপের ফল। সংসারে সেই জন্ম মৃত্যু রহিত হ'লেই ত সব মিটে গেল। এখন শোন, যতক্ষণ সংস্কার সমূহের (সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মান) গন্ধ মাত্র থাক্বে, ততক্ষণ মুক্তির সম্ভাবনা কিছুমাত্র নাই। সংস্কারই জীবকে ভববন্ধনে বাঁধবার দড়ী স্বরূপ, সেই সংস্কাররূপী দড়ী ধ্বংশ না হ'লে ভববন্ধন থেকে ছুট্বার্ উপায় নাই। ভগবদ্ভক্তি লাভ ক'রেও যদি কর্ম্মফল ভোগ কর্তে হয়, তাহ'লে ভগবদ্বাক্য ও শ্রুতিবাক্যের কোন অর্থ নাই, এবং ভক্তিরও কোন মাহাত্ম্য নাই। এ দিকে লৌকিক ব্যবহার অনুসারে বিচার ক'রে দেখলেও দেখা যায় যে, ভগবদ্ কৃপায় বিনাভোগে কর্ম্মফল সব ক্ষয় হ'য়ে ভক্তে মুক্তি পেতে পারে।

শিষ্য। কি রকম ভাবে সে মুক্তি পেতে পারে ?

গুরু। মনে কর একজন দোষী আসামীর হাইকোর্ট থেকে ফাঁসির হুকুম হ'য়েছে, তার উপর আর আপিল নাই, সুতরাং ফাঁসি নিশ্চয়। পরন্তু, ঐ আসামীটী কাঁদাকাটা ক'রে জীবন ভিক্ষার প্রার্থনায় বিলাতে রাজার নিকট একখানি দরখাস্ত ক'রল, রাজাও দয়া ক'রে তার মুক্তি দিলেন। সুতরাং ঐ মৃতকল্প লোকটী খালাস পেয়ে প্রাণে বাঁচ্ল। একে রাজকৃপা বলে। দোষী ব্যক্তি আইনানুসারে দণ্ডনীয় হ'লেও, রাজার শরণ নিয়ে যেমন দণ্ডভোগ থেকে রেহাই পায়। তেম্নি পাপী ব্যক্তি প্রাকৃতিক আইনানুসারে অর্থাৎ নিয়মানুসারে দণ্ডস্বরূপ কর্ম্মফল ভোগের

যোগ্য হ'লেও, বিশ্বরাজ্যের রাজা ভগবানের শরণ নিলে কর্ম্মফল ভোগ থেকে রেহাই পায় অর্থাৎ মুক্তি পায়।

শিষ্য। আমার মনে একটা বিশেষ সংশয় হ'য়েছে। ভগবান সমস্ত ধর্ম্মত্যাগ কর্‌তে ব'ল্‌ছেন কেন? যে ধর্ম্ম রক্ষা কর্‌বার জন্য তিনি স্বয়ং অবতাররূপে অবতীর্ণ হন, সেই ধর্ম্ম তিনি ত্যাগ কর্‌তে ব'ল্‌ছেন? ধর্ম্মই সকলকে ধারণ করে, অর্থাৎ পোষণ করে ও রক্ষা করে। যে ধর্ম্ম ত্যাগ কর্‌বে তার নিশ্চয় নাশ হবে। দয়াময় ভগবান জীবের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী হ'য়ে এমন অহিতকর উপদেশ দিচ্ছেন?

গুরু। ভগবদ্বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ আগে বোঝ, তার পর সিদ্ধান্ত ক'র। ভগবান ধর্ম্মত্যাগ কর্‌তে বল্‌ছেন ঠিকই, কিন্তু কোন্ ধর্ম্ম আগে সেইটা জান তবে ত বুঝবে। সর্ব্ব ধর্ম্মান্ এখানে সকল ধর্ম্ম কি? প্রাকৃতিক সকল ধর্ম্ম। প্রকৃতির ধর্ম্ম কি? প্রকৃতির ধর্ম্মের মূল হচ্ছে আসক্তি। কেননা, প্রকৃতি বা মায়া লোক্‌কে কেবলই বিষয়ে আসক্ত করে, নইলে সংসার টেঁকে না। আসক্তিই সংসার গারদে বাধবার বেড়ী স্বরূপ। স্ত্রী পুত্রাদি আত্মীয়ের প্রতি, গৃহ, ধনাদি অর্থের প্রতি, লোক আকৃষ্ট হওয়াতেই আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম ভু'লে গিয়ে, চিরকাল দাসানুদাসের ন্যায়, ঐ সকল পরিবারবর্গের বশবর্ত্তী হ'য়ে থাকে। সেই জন্য ভগবান ব'ল্‌ছেন যে, হে অর্জ্জুন! প্রকৃতি বা মায়া প্রভাবে দুঃখদায়ী নশ্বর পার্থিব পদার্থ সকলে আসক্ত হ'য়ে আমাকে ভু'লে আছ, এখন সেই প্রকৃতি বা মায়ার ধর্ম্ম সব ত্যাগ ক'রে আমার শরণ নেও। ভগবান যে, সর্ব্ব শব্দ ব্যবহার ক'রেছেন, তার কারণ এই যে, মূল আসক্তি থেকেই শাখা স্বরূপ রাগ, দ্বেষ, কাম ক্রোধাদি উৎপন্ন হয়, সুতরাং সব গুলিই প্রাকৃতিক ধর্ম্ম, কাজেই সর্ব্ব শব্দ ব্যবহৃত হ'য়েছে। এই শ্লোকের সার এই যে, ভগবান বল্‌ছেন, হে অর্জ্জুন! যাবতীয় নশ্বর পার্থিব পদার্থের আসক্তি ত্যাগ ক'রে আমাতে

সর্ব্বতোভাবে আসক্ত হও, আমি তোমায় মুক্ত ক'র্‌ব। ভগবানগীতার ৮ম্ অধ্যায়েব ১৪শ শ্লোকেও এই ভাবই প্রকাশ করছেন। তাতে ব'ল্‌ছেন যে,

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্য যুক্তস্য যোগিনঃ॥

হে পার্থ। অনন্যচিত্ত হ'য়ে, অর্থাৎ অন্য বিষয়ে চিত্ত না দিয়ে, যে কেবল সর্ব্বদা আমাকে স্মরণ করে আমি তার পক্ষে সুলভ এবং সেই নিত্য যুক্ত যোগী, অর্থাৎ সেই আমাতে ঠিক মিলেছে। এখন দেখ, অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে অনাসক্ত হ'য়ে, কেবল এক ভগবানে আসক্ত হ'তে পার্‌লে তবে পাওয়া যাবে।

শিষ্য। আসক্তি যে প্রাকৃতিক ধর্ম্মেব মূল ব'ল্‌ছেন, সেইটা আমাকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিন।

গুরু। এক মায়াজনিত আসক্তিতেই সাংসাবিক সমস্ত ধর্ম্ম-পালন হ'য়ে থাকে। সাংসারিক যাবতীয় কাজেব মূলেই আসক্তি নিহিত আছে। যেমন পিতা সন্তানকে পালন ক'বে পিতৃ ধর্ম্ম পালন কবছে, স্ত্রী স্বামীর সেবা ক'রে স্ত্রী ধর্ম্ম পালন ক'বছে ইত্যাদি। সাংসাবিক লোক এক আসক্তিতে আবদ্ধ হ'য়েই আপন আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করতঃ সাংসারিক (প্রাকৃতিক) ধর্ম্ম পালন ক'বে থাকে।

শিষ্য। আচ্ছা, এ জগতে এই রকম সমস্ত ধর্ম্মত্যাগ ক'রে, অর্থাৎ পার্থিব সমস্ত পদার্থের আসক্তি ত্যাগ ক'রে কেও ভগবানে সর্ব্বতোভাবে আসক্ত হ'তে পেরেছে?

গুরু। হাঁ, ব্রজগোপীবা পেবেছে। ব্রজগোপীদের মনের ভাব ও তদনুসারে তখন তারা যে আচরণ করেছে, তা যদি বিচার ক'রে দেখা

যায়, তা হ'লে স্পষ্ট বুঝতে পাবা যায় যে, প্রকৃতই তাবা সমস্ত ধর্ম্ম ত্যাগ ক'বে একমাত্র ভগবানেতেই আসক্ত হ'য়েছিল।

শিষ্য। এই বিষয়টী খু'লে বলুন। আমাব বড় কৌতুহল হচ্ছে।

গুরু। শ্রীকৃষ্ণ যখন বাঁশী বাজাতেন্ তখন ব্রজগোপীবা যে, যে কাজে থাকৃত সে তাই ত্যাগ্ ক'বে শ্রীকৃষ্ণেতে সর্ব্বতোভাবে আকৃষ্ট হ'য়ে তৎক্ষণাৎ তাব নিকটে গিয়ে উপস্থিত হ'ত। ব্রজগোপীদেব মধ্যে কেও গাই ছু'চ্ছে, কেও পাক্ ক'রছে, কেও সন্তানকে কোলে নিয়ে স্তন পান করাচ্ছে, কেও স্বামাকে খেতে দিচ্ছে, কেবল পাতে রুটী দিয়েছে ডা'ল তবকাবি কিছু দেয়নি, কেও চুল বাধতে সুরু ক'বেছে, কেও কাপড পব্ছে, কেবল ঘাঘ্বাটা পবা হ'য়েছে কাঁচ ওড়্না পবা হয় নি, কেও হয়ত চোখে কাজল পবছে কেবল এক চোখে পরা হ'য়েছে ইত্যাদি কাজে গোপীবা সব ব্যাপৃত আছে। এমন সময় তাবা যেমন শ্রীকৃষ্ণের বংশীবব শুন্‌তে পেল, তখন যে গোপী যে কাজে ব্যাপৃত ছিল তা তৎক্ষণাৎ ত্যাগ ক'রে, অর্থাৎ তাদেব সকল ধম্ম ত্যাগ ক'বে শ্রীকৃষ্ণেতে সব্বতো-ভাবে আসক্ত হ'য়ে তন্মুহূর্ত্তে ভগবানেব নিকট গিয়ে উপস্থিত হ'তো। এবই নাম অনন্য শবণ, অনন্যচিত্ত এবং ঈশ্ববে সর্ব্বাপন। এখন ভগবদ্ কথিত সর্ব্ব ধম্মান্ পবিত্যাজ্য শ্লোকের অর্থ বেশ বুঝ্‌তে পাব্‌বে।

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ আমি বুঝ্‌লাম্। এখন প্রাবব্ধ ভোগেব নিয়মাতীত মীমাংসাটী বুঝিয়ে দিন।

গুরু। প্রাবব্ধ ভোগেব নিয়মাতীত মীমাংসাটী হ'চ্ছে তত্ত্বজ্ঞান পুরুষের সম্বন্ধে। ভগবান যেমন সব ক'রেও কিছু করেন না, সর্ব্বময় কর্ত্তা হয়েও অকর্ত্তাবৎ মনে কবেন। তেমনি তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষেবাও সব কবেও কিছু কবেন না, সুতরাং তাঁবা প্রারব্ধ ভোগ করেও করেন না। রাজা যেমন তাঁর বাজ্য পরিচালনার আইনে বাধ্য নন। বিশ্ব বাজ্যেব রাজা

ভগবানও তেমনি তাঁর বিশ্বরাজ্য পরিচালনার প্রাকৃতিক আইনে অর্থাৎ নিয়মে বাধ্য নন, তার মানে অধীন নন। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষেরাও প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন নন। কেন না, তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ ভগবানেরই স্বরূপ। কাজেই তাঁরা সব ক'রেও অকর্ত্তাবৎ থাকেন, সুতরাং মায়া-জনিত অহংকারের বশবর্ত্তী হয়ে সুখ দুঃখের অধীন হন না। তাঁরা প্রারব্ধ ভোগ করেন বটে, কিন্তু তাঁদের মনে সংসার মিথ্যা ব'লে ধারণা থাকায়, সে ভোগ কিছু অনুভবে আসে না। যে জিনিস মিথ্যা তার আবার ভোগ কি? ভগবান শঙ্করাচার্য্য তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষের প্রারব্ধ ভোগ সম্বন্ধে ব'লেছেন যে,

দেহস্যাপি প্রপঞ্চত্বাৎ প্রারব্ধাবস্থিতিঃ কুতঃ।
অজ্ঞান জন বোধার্থং প্রারব্ধং বক্তি বৈশ্রুতিঃ॥

দেহ প্রপঞ্চ অলীক কল্পনা মাত্র, সুতরাং কি ক'রে তাতে প্রারব্ধের অবস্থিতি হ'তে পারে? অজ্ঞান লোককে বোঝাবার জন্য শ্রুতিতে প্রারব্ধের উক্তি আছে। জ্ঞানীরা প্রারব্ধ ভোগ ক'রেও কেন যে ভোগ করেন্ না, এবং তখন তাঁদের অবস্থা কেমন হয় শঙ্করাচার্য্য তাও ব'লেছেন যে,

তত্ত্বজ্ঞানোদয়াৰ্দ্ধং প্রারব্ধ নৈব বিদ্যতে।
দেহাদিনাম সত্ত্বাৎ যথা স্বপ্ন বিবোধতঃ॥

নিদ্রা হ'তে জাগ্রত ব্যক্তির নিকট স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের যেমন অস্তিত্ব থাকে না, মোহনিদ্রা হ'তে জাগ্রত তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষের নিকটেও, তেমনি মায়া প্রপঞ্চ অলীক দেহাদির কোন অস্তিত্ব থাকে না। যখন দেহাদিরই অস্তিত্ব নাই, তখন আর প্রারব্ধের অস্তিত্ব কি ক'রে থাকে?

জ্ঞানীরা জীবনটা স্বপ্নবৎ জ্ঞান করেন, সুতরাং তদানুসঙ্গিক সমস্ত বিষয়ই মিথ্যা ব'লে বিবেচনা করেন। জ্ঞানীরা ভোগ করেও যে করেন না শ্রীমদ্ভাগবতে তার উল্লেখ আছে। শ্রীকৃষ্ণ বহু বিবাহ ক'রেও বাল ব্রহ্মচারী ছিলেন। দুর্ব্বাসা ঋষি ব্রজে গিয়ে ভোজন করেও ব'লেছিলেন যে তিনি খান্ নি।

শিষ্য। প্রারব্ধ ভোগ সম্বন্ধে এক রকম বুঝলাম্। এখন আমার কর্ম্মফল ভোগ সম্বন্ধে আর একটা সংশয় আছে।

গুরু। আজ থাক আবার কা'ল হবে।

পঞ্চম দিন।

শিষ্য। আমার সংশয় এই যে, আপনি যে কা'ল ব'ল্লেন্ ভগবানের অনন্য শরণ যে নেয়, সেই প্রারব্ধ ভোগ থেকে রেহাই পায় এবং মুক্তিও পায়। মহাপাতকী যদি তাঁর শরণ নেয়, তাহ'লে সেও কি মুক্তি পাবে? তার পাপের শাস্তি হবে না?

গুরু। না,—সে পাপের শাস্তি পাবে না। যেমন পাপীই হ'ক না কেন, ভগবানের অনন্য শরণ নিলে তখন সে সাধু ব'লে গণিত হয়, এবং তার কৃত পাপ অথবা পুণ্যকর্ম্মের ফলভোগ থেকে রেহাই পেয়ে মুক্তি পায়। ভগবান গীতার ৯ম্ অধ্যায়ের ৩০শ শ্লোকে ব'লেছেন যে

> অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্য ভাক্।
> সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥

হে অর্জ্জুন! জগতে যে অত্যন্ত দুরাচার পাপী, সে যদি অনন্য মনে আমার ভজনা ক'রে অর্থাৎ একমাত্র আমারই শরণ নেয়, তা হ'লে সে আর পাপী থাকে না। তখন তাঁকে সাধু ব'লেই জেন। তখন তাঁর অবস্থা যে কেমন হয় পরের শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে তাই ব'লছেন যে,

> ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।

তিনি শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হন্ ও দিন দিন তাঁর ধর্ম্মভাব প্রবল হয়, এবং উত্তরোত্তর শান্তিলাভ করেন। পাপী হ'ক আর পুণ্যবান হ'ক,

ভগবানের শরণ নিলে যে কারও দুর্গতি হবে না উক্ত শ্লোকের শেষার্দ্ধে তাই ব'লেছেন যে,

কৌন্তেয় প্রতি জানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।

হে কৌন্তেয়। তুমি নিশ্চয় জানিও আমার ভক্ত কখন নষ্ট হয় না, অর্থাৎ দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। এখন বুঝ্‌লে যে মহাপাতকীও ভগবদ্ কৃপায় উদ্ধার হয়।

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ বুঝ্‌লাম্। এখন আগেকার একটী বিষয় বুঝিয়ে দিন। আগে কথা হচ্ছিল যে সুবুদ্ধি অনুসারে কাজ কর্‌লে ভাল সংস্কার হয় এবং তাতে কল্যাণ হয়। আর কুবুদ্ধি অনুসারে কাজ কর্‌লে মন্দ সংস্কার হয়, সুতরাং তাতে দুঃখ হয়। আমি দেখ্‌ছি মনই কাজ করবার কর্ত্তা, অতএব মনটা ভাল হ'লেই লোকের কল্যাণ হয়।

গুরু। তুমি বিষয়টা ঠিক বুঝ্‌তে পারনি। মন কাজ করবার প্রকৃত কর্ত্তা নয় মন স্বাধীন ভাবে কিছুই কর্‌তে পারে না। মন বুদ্ধির অধীন হ'য়ে ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা কাজ করায়। মন নিজে ঠিক পেস্‌কারের কাজ করে।

শিষ্য। মন কোন্ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে গুন্তি হয়, অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় না কর্ম্মেন্দ্রিয়?

গুরু। কেহ কেহ মনকে ইন্দ্রিয় বলেন, কিন্তু কোন ইন্দ্রিয় তা বলেন না তার মন নিয়ে একাদশ ইন্দ্রিয় গুন্তি করেন। কেওবা মনকে বাদ দিয়ে দশেন্দ্রিয়ের গুন্তি করেন্। পরন্তু, বিচার ক'রে দেখ্‌লে দেখ যায় যে মন ইন্দ্রিয় হ'তে উপরে আছে। কেননা, রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ এই যে পাঁচটী বিষয়, এদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মন কোন কাজ করে না। বিষয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যোগ হওয়াই হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের

ধর্ম্ম। মন ইন্দ্রিয়গণের উপরিস্থ কর্ম্মচারী। কেননা, ইন্দ্রিয়গণ যে সকল কার্য্য করে, তা সব মনের অনুমতিক্রমে ও মনের সাহায্য নিয়েই ক'রে থাকে। মনকর্ত্তৃক যারা উল্লিখিত বিষয় পাঁচটাতে সংযুক্ত হয় তারা জ্ঞানেন্দ্রিয়। আর জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়ের কার্য্য সকল সম্পন্ন করবার জন্য বিষয়ের সহিত যাহারা সংযুক্ত হয়, তারা কর্ম্মেন্দ্রিয়। এই দশটাই ইন্দ্রিয়।

শিষ্য। মন ইন্দ্রিয়গণের উপরে থেকে পেস্কারের কাজ কি ক'রে করে?

গুরু। জ্ঞানেন্দ্রিয়েরা যে যে বিষয়ে আকৃষ্ট হয়, সেই সেই বিষয় তারা মনের কাছে এনে হাজির করে। মন তখন সেই সব বিষয়গুলি নিয়ে গিয়ে বুদ্ধির কাছে উপস্থিত হয়, এবং বুদ্ধি বিচার ক'রে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করে দিলে পর, তখন মন কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা তদনুসারে কাজ করিয়ে নেয়। এখন বুঝলে? প্রাকৃতিক কার্য্যকারকদের মধ্যে বুদ্ধি সর্ব্বোপরি, তার নীচে মন এবং মনের নীচে পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়। মন যদি স্বাধীন হ'ত তাহ'লে সে ভাল হ'লে কল্যাণ হ'তে পা'রত, মন যে বুদ্ধির অধীন। বুদ্ধি ভাল হ'লে তবে মানুষের কল্যাণ হয়। সেইজন্য ভগবান গীতার ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৫ম শ্লোকে ব'লেছেন যে,

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মান মবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মন ॥

আত্মাকে আত্মা দ্বারা উদ্ধার করবে। আত্মাকে অবসন্ন করবে না। আত্মাই আত্মার বন্ধু, আবার আত্মাই আত্মার শত্রু। এই শ্লোকের প্রথম কথিত আত্মা মানে বুদ্ধি। ভগবান ব'লছেন বুদ্ধির দ্বারা আত্মাকে সংসার থেকে উদ্ধার করবে।

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ, সুবুদ্ধি অনুসারে চ'ললে যে লোকের কল্যাণ

হয় তা বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লাম্‌। মন সম্বন্ধে আমার ধারণা ছিল যে মনই সব, কিন্তু এখন দেখছি তা নয়।

গুরু। তা'হলে তুমি ভুল বুঝেছ। মন পেস্কারের কাজ করে ব'লেছি ব'লে তোমার হয়ত ধাঁদা লাগছে। মন বুদ্ধির নীচে বটে, কিন্তু আর সকলেরই উপরে। জীবের জীবনে কাজ করাবার কর্ত্তা হ'ল মন, তার অনুমতি ভিন্ন কোন কাজ হয় না।

শিষ্য। এখন প্রারব্ধ ও পুরুষার্থ সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।

গুরু। কি জিজ্ঞাস্য আছে বল।

শিষ্য। আমার বিশ্বাস পুরুষার্থ করা বৃথা। অদৃষ্ট ফলই পাওয়া যায়। একটা বচনও আছে। "ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্রং ন চ বিদ্যা ন চ পৌরুষম্‌।"

গুরু। এ বিশ্বাস তোমার কি জন্য হ'লো সেইটা আমাকে বল দেখি।

শিষ্য। দেখুন, কলেজ থেকে এক সঙ্গে একই গ্রেডে এমে পাশ ক'রে চারটী ছেলে বেরুল। তাদের অদৃষ্টানুসারে, একজন বাজার হালে কাটাচ্ছে, একজন স্কুল মাষ্টারি ক'রে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ ক'রছে, একজন চাকরীর উমেদারিতে ঘু'রে বেড়াচ্ছে, এবং একজন হয়ত জাল করার অপরাধে জেল খাটছে। এখন বিচার ক'রে দেখুন, বিদ্যা শিক্ষার জন্য সকলেই সাধ্যমত পুরুষার্থ ক'রেছে বটে, কিন্তু তারা অদৃষ্ট ফলই পাচ্ছে। তাতেই মনে হয় অদৃষ্টে যা থাকে তাই হয়, পুরুষার্থ করা বৃথা।

গুরু। পুরুষার্থ কথন বৃথা হয় না। পুরুষার্থের দ্বারা অদৃষ্ট ফল সম্যক প্রকারে পাওয়া যায়। তবে অদৃষ্টে না থাকা হেতু পুরুষার্থ ক'রে ঈপ্সিত ফল না পেলেও, কিন্তু তার দ্বারা জীবনে অন্য মহৎ ফল লাভ হয়।

তা তোমাকে ভেঙ্গে বলছি মন দিয়ে শোন। এক সঙ্গে সমান শিক্ষা পেয়ে, সমান বিদ্বান হ'য়ে সকলেই কলেজ থেকে বেরুল। তবে অদৃষ্ট ফলের তারতম্য হেতু, তারা বিভিন্ন দশাগ্রস্ত হ'ল বটে, কিন্তু শিক্ষার যে ফল তা সকলেই সমান পেয়েছে। কারণ, তারা সত্য, বিনয়, বিবেক, নম্রতা ও দয়া প্রভৃতি কতকগুলি সদ্গুণের অধিকারী হ'য়েছে। সেই জন্য তারা সাধারণ লোকের মত অসঙ্কোচে পাপ কর্ম্মে লিপ্ত হ'তে পারবেনা। কেননা, ঐ সদ্গুণগুলি পাপ কর্ম্মের প্রতিরোধক স্বরূপ হবে। এখন দেখ পাপ কর্ম্মে নিবৃত্ত থাকা কি জীবনের মহৎ ফল নয়?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ, এক্ষেত্রে কতকটা ফল হয় বটে, কিন্তু যারা শিক্ষিত হ'য়েও পাপ কর্ম্মে রত হয় তাদের পুরুষার্থ ত বৃথাই হয়।

গুরু। যারা শিক্ষিত হ'য়েও পাপে রত হয়, তারা কেবল প্রবল সংস্কারের বশেই পাপকর্ম্ম করে। সুতরাং তারা যদি বৈকুণ্ঠেও বাস করে তবুও তারা পাপে বিরত হবে না।

শিষ্য। তবে সে রকম লোকের কি কল্যাণের কোন উপায় নাই?

গুরু। উপায় আছে। তাদেরও পুরুষার্থ ক'রে ভাল সংস্কারের জন্য চেষ্টা ক'রতে হবে। মনে পাপের বেগ প্রবল হ'লেও, তদনুসারে কাজে প্রবৃত্ত হ'তে নেই। সেখানে কবির দাসের উপদেশ মত চলতে হয়। মনে পাপ চিন্তা হয় হ'ক, আমি কিছুতেই যাব না। এইরূপ কিছুদিন করলে ক্রমে পাপের প্রবল বেগ কম হ'য়ে আসে, এবং সময়ে কিছুই থাকে না। যে রকম লোকই হ'ক না কেন, পুরুষার্থ সকলেরই করা উচিত। পুরুষার্থ-হীন লোকের অবস্থা জলমগ্ন অবসন্ন লোকের মত হয়।

শিষ্য। কাশীতে গঙ্গার সব ঘাটে অনেক সাধু একবারে পুরুষার্থ-হীন হ'য়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকেন। তাঁদেরও ত খাবার সেইখানেই উপস্থিত হচ্ছে।

গুরু। দেখ, জগতে পুরুষার্থ হীন প্রাণী নাই, কেও বা জানিত ভাবে কেও বা অজানিত ভাবে পুরুষার্থ করছে, ফলতঃ জীবমাত্রেই পুরুষার্থ কর্‌ছে। কেননা, প্রাকৃতিক কাজ সম্পন্ন হওয়ার জন্য প্রাণীদের পুরুষার্থ অপরিহার্য্য। তুমি যে পুরুষার্থহীন সাধুদের কথা বল্‌লে, তাঁরাও কিন্তু পুরুষার্থহীন নন, তাঁরাও পুরুষার্থ কর্‌ছেন্। তোমাকে তা বলি শোন। তাদের প্রথম পুরুষার্থ হচ্ছে গঙ্গার ঘাটের নিকট ব'সে থাকা, কেননা, লোকে দেখ্‌বে এবং খাবার এনে দেবে। যদি বল কোন সাধু হাত দিয়ে কিছু খাননা, অপর লোকে খাইয়ে দেয়, তত্রাচ তাকে পুরুষার্থ কর্‌তে হয়, কেননা, চিবিয়ে গলাধঃকরণ করার যে পুরুষার্থ তাত তাকে কর্‌তেই হবে। দেখ, নির্জ্জন স্থানে ধ্যান ধারণাদি ভাল হয়, তা না ক'রে পুরুষার্থ অবলম্বন ক'রে গঙ্গার ঘাটের নিকট বসা। এখন ভেবে দেখ পুরুষার্থ কেও ত্যাগ কর্‌তে পারে না। পুরুষার্থ যখন পরিত্যাজ্য নয় তখন যাতে নিজের কল্যাণ হবে সেই ভাবে পুরুষার্থ করাই উচিৎ।

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ, এখন আমি বুঝ্‌লাম যে পুরুষার্থ করা একান্ত কর্ত্তব্য। প্রারব্ধ ভোগ সম্বন্ধে আমার এই সংশয় হচ্ছে যে, কোন কোন স্থানে বহু লোকের এক রকম অদৃষ্ট ফল দেখা যায়। তাহ'লে তারা সকলেই এক রকম কর্ম্ম ক'রে এক নিয়তির অধীন হ'য়েছে?

গুরু। বহুলোকের এক নিয়তি কিসে দেখলে?

শিষ্য। কেন? নৌকা ডুবি, জাহাজ ডুবি, রেল সংঘর্ষ, বজ্রপাত প্রভৃতি ঘটনায়, বহু লোকের এক সঙ্গে একস্থানে এবং একই সময়ে প্রাণত্যাগ হয়। তা হ'লে সকলেই কি এক রকম কাজ ক'রে এক সঙ্গে তার ফল ভোগ করে?

গুরু। সকলেই যে এক রকম কর্ম্ম ক'রে, এক সঙ্গে একই সময়ে তার ফল ভোগ করে তা নয়। যেমন কেও রাজদ্রোহী, কেও লোক

পীড়নকারী ডাকাত, কেও খুনী আসামী ইত্যাদি বহু আসামীর দ্বীপান্তর হ'ল। তখন তাদেরকে এক জাহাজে ক'রে নিয়ে গিয়ে শাস্তি ভোগের জন্য সকলকে এক সঙ্গে এক সময়ে একই স্থানে যেমন ছেড়ে দেয়। বহু লোকের এক সঙ্গে প্রাকৃতিক কর্ম্মফল ভোগও ঠিক সেই রকম। কর্ম্ম ও ক্ষেত্র বিভিন্ন হ'লেও সেই সকল কর্ম্মফল এক সঙ্গে ভোগ হয়ে থাকে।

শিষ্য। আপনার কথা মানি, কিন্তু এমনও দেখা যায় যে, নৌকা-ডুবীতে একশ' লোক জলে ডুব্‌ল, তার মধ্যে হয়ত দুজন বেঁচে উঠ্‌ল। সকলে যদি এক নিয়তির অধীন এক সঙ্গে ফলভোগই কর্‌তে যায়, তা'হলে তাদের মধ্যে ইতর বিশেষ হয় কেন?

গুরু। এক সঙ্গে গেলেই যে সকলেরই এক নিয়তি হবে এমন ব'লতে পারা যায় না। সুতরাং নৌকাডুবীতে যে দুজন বাচ্‌ল, তাদের নিয়তি মৃত ব্যক্তিদের নিয়তির সঙ্গে এক নয়। কাজেই তারা বেঁচে গেল। আর যদি বল যে, পুরুষার্থ ক'রে ঐ দুজন বাচ্‌ল, কিন্তু সে কথাও বলা ঠিক নয়। কেন না, প্রাণবিয়োগের সম্ভাবনা উপস্থিত হ'লে, প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করতে কেও ত্রুটী করে না। লোকে মনের আবেগে গলায় দাড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ে, শেষে সেই লোকই প্রাণ বাচাবার জন্য হাত পা নেড়ে বিশেষ চেষ্টা করে। আত্মার তুল্য প্রিয়তর জগতে আর কিছুই নাই। এমন কি পেটের ছেলেকে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ ক'রেও মা আপনি বাঁচবার চেষ্টা করে। এক্ষেত্রেও ঐ জলনিমগ্ন একশ' লোকই প্রাণ বাচাবার জন্য পুরুষার্থ ক'রেছে। কোন দুর্ঘটনায় এক সঙ্গে বহু লোকই মরুক না কেন, কিন্তু তার মধ্যে যদি একটা লোকেরও নিয়তি বিভিন্ন হয়, তাহ'লে সে বেচে যাবে। তোমাকে একটা ঘটনা বলি শোন। বাঙ্গলা দেশে বীরভূম জেলার অধীন একটা গ্রামের নিকট ঘটিয়াছিল। ঘটনা

এই যে, সেই গ্রামের বাহির দিয়ে ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের রাস্তা বরাবর গিয়েছে এবং রাস্তার অপর পারে আবাদী জমীর মাঠ। গ্রামের বাইরে রাস্তার ধারে কৃষকদের রোদ বৃষ্টিতে আশ্রয় নেবার জন্য একখানি ছোট ঘর ছিল। জ্যৈষ্ঠ মাসে হঠাৎ একদিন বিকাল বেলায় ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল, এবং ঘন ঘন বিদ্যুৎ চম্‌কাতে লা'গল ও মেঘ গর্জ্জন হ'তে লাগ্‌ল। এমন সময় ক্রমে আটজন পথিক সেই ঘরে এসে আশ্রয় নিল। পরন্তু, এমন ভয়ানক মেঘ গর্জ্জন হ'তে লাগ্‌ল ও বিদ্যুৎ চম্‌কাতে লাগ্‌ল যে, তাদেখে ঐ ঘরের পথিকেরা অত্যন্ত ভীত হ'ল। অনেকক্ষণ ধ'রে মেঘগর্জ্জন হয় কিন্তু বজ্র পড়ে না দেখে তারা অনুমান করল যে, তাদের মধ্যে কোন পাপী আছে, তারই উপর বজ্র পড়ার জন্য এই ব্যাপার হচ্ছে। এখন সেই বজ্রপাত না হ'লে এই দুর্য্যোগ কিছুতেই থাম্‌বে না অতএব একে একে সকলেই চল, গিয়ে ঐ দূরের আম গাছটা ছুঁয়ে আসা যাক্‌, যার অদৃষ্টে আছে তার উপর পড়্‌বে। এই যুক্তি ঠিক হ'লে, একে একে সকলেই গিয়ে সেই গাছটা ছুঁয়ে আসতে লাগ্‌ল। এই রকমে সাত জন গাছ ছুঁয়ে এল কিন্তু বজ্র পড়্‌ল না। যে লোকটী শেষে ছিল সে তার নিশ্চয় মৃত্যু জেনে অত্যন্ত ভীত হ'ল এবং কিছুতেই গাছ ছুঁতে গেল না। তখন সকলেরই ধারণা হ'ল যে বজ্র তার উপরেই পড়্‌বে। এখন সেইটা পড়ে গেলেই এই দুর্য্যোগ থাম্‌বে, এই আশায় সবাই সেই লোকটীকে গাছ ছুঁতে যা'বার জন্য জেদ কর্‌তে লাগ্‌ল, কিন্তু কিছুতেই সে লোকটী গেল না। তখন সকলে মি'লে তাকে ধ'রে টেনে নি'য়ে গিয়ে সেই গাছতলায় ফেলে দিয়ে, সকলে প্রাণপণে দৌড়ে এসে সেই ঘরে ঢুক্‌ল, আর তৎক্ষণাৎ সেই ঘরে বজ্র প'ড়ে ঐ সাত জন লোকই মারা গেল। যে লোকটীকে তারা গাছতলায় ফেলে দিয়ে এসেছিল, সেও সকলের পেছনে দৌড়ে আসছিল, কিন্তু একটু দূরে ছিল ব'লে সকলের সঙ্গে ঘরে ঢুক্‌তে

পারেনি; তাতেই বাইরে মূৰ্চ্ছিত হ'য়ে প'ড়ে গিয়েছিল এবং প্রাণেও বেঁচেছিল। আচ্ছা, এখন বল দেখি নিয়তি কেমন আপনার হক্ টেনে নিলেন। তাতেই বলে "নিয়তি কেন বাধ্যতে"। সাধারণ লোককে অদৃষ্টফল ভোগ কর্‌তেই হবে।

শিষ্য। কেবল মানুষকেই অদৃষ্টফল ভোগ কর্‌তে হবে, মূঢ় যোনীর প্রাণী কি অদৃষ্টফল ভোগ করে না?

গুরু। ক'র্‌বে না কেন? অদৃষ্টফল ভোগ কর্‌বার জন্যই ত মূঢ় যোনীতে জন্ম নিয়েছে অর্থাৎ নরকে প'ড়েছে। তবে মূঢ় যোনীতে এসে কৃতকর্ম্মের ফলভোগ হয় না। মূঢ় যোনীর প্রাণী জন্ম মৃত্যুর দ্বারা পর পর যোনী পরিবর্ত্তন ক'রে মনুষ্য যোনীতে উঠ্‌বার সিঁড়ির চৌরাশী লক্ষ ধাপের কেবল এক একটী ধাপ মাত্র উঠে। আর কর্ম্মদোষে যারা মনুষ্য যোনী হ'তে একবারে মূঢ় যোনীতে আসে, তারা যতটা ধাপের নীচে এসে পড়ে, তাদেরকে আবার সেখান থেকে বাকী ধাপগুলি উত্তীর্ণ হ'য়ে অর্থাৎ বাকী যোনীগুলিতে জন্ম নিয়ে শেষে মনুষ্য যোনীতে আস্‌তে হয়।

শিষ্য। মূঢ় যোনীর প্রাণীদের মধ্যে এক প্রাণী অন্য প্রাণীকে মেরে খায় এবং দ্বেষ হিংসাও করে। তা'হলে এ সব পাপকর্ম্মের ফলভোগ কি তারা কর্‌বে না?

গুরু। মূঢ় যোনীর প্রাণীরা বিবেকহীন, সুতরাং তারা তাদের কৃতকর্ম্মের কোন ফলভোগ করে না।

শিষ্য। আমি এই বিষয়টা ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌লাম না।

গুরু। বিবেকী প্রাণীরই কৃতকর্ম্মের ফলভোগ কর্‌তে হয়। কেন না, মৃত্যুর পর তাদের জীবনের কৃতকর্ম্মের ফল অনুসারে গতি হয়, অর্থাৎ প্রকৃতিদেবী তাদেরকে কর্ম্মোচিৎ যোনীতে পাঠান, এবং যোনী অনুসারে সুখ দুঃখের ব্যবস্থাও করেন।

শিষ্য। আমি এখনও এই বিষয়টী পরিস্কার বুঝ্‌তে পারলাম না।

গুরু। লোকে জীবন ভ'রে যে কর্ম্ম করে, তদনুসারেই গতি হয়। এখন সারা জীবনের কর্ম্মত আর বর্ত্তমান থাকে না, সে সকল কর্ম্মের ফলই সূক্ষ্মাবস্থায় বর্ত্তমান থাকে। কেননা, সেই ফলানুসারেই লোকের গতি হবে। এখন কর্ম্মফলের জন্য দায়ী কোন্ প্রাণী? বিবেকী প্রাণী। বিবেকী প্রাণী কে? মনুষ্য। মানুষেরই কেবল কর্ম্মফলের প্রয়োজন। কেন প্রয়োজন? কেননা, সমস্ত জীবনের কৃতকর্ম্মের ফলানুসারেই গতি হবে। মনুষ্যেতর প্রাণীকে ভগবান বিবেক দেননি, সুতরাং তাদের কৃতকর্ম্মের বিচারও হয় না। কাজে কাজেই তারা কর্ম্মফলের জন্য দায়ী নয়। এক বিচারের জন্যই কর্ম্মফলের প্রয়োজন, যেখানে বিচার নাই সেখানে কর্ম্মফলের খোঁজও নাই।

শিষ্য। মানুষের এক বিবেক আছে ব'লে মানুষ চোরদায়ে ধরা প'ড়েছে। আর মনুষ্যেতর প্রাণীর বিবেক নাই, সুতরাং তারা কোন কৈফিয়তের তলে নাই বেশ আছে। এতে ভগবানের পক্ষপাতিত্ব দেখা যাচ্ছে, কোন প্রাণীকে কিছুই ব'লছেন না, আবার কোন প্রাণীকে নিয়ে টানাটানি কর্‌ছেন।

গুরু। আচ্ছা, তোমাকে সোজা কথায় বোঝাই। মনে কর এক-জন জমীদার তাঁর একজন আমলাকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে কোন একটী কাজের জন্য পাঠালেন এবং সঙ্গে দশ বার জন পা'ক বরকন্দাজও পাঠালেন। তার পর আমলাটী কাজ সম্পন্ন ক'রে পা'ক বরকন্দাজ নিয়ে জমীদারের বাড়ীতে ফিরে এসে ঐ পাঁচ হাজার টাকার জমা খরচ জমীদারের নিকট দাখিল কর্‌ল। কেননা, টাকা তার জিম্মাতেই জমীদার দিয়েছিলেন। এখন ঐ আমলাটীর প্রদত্ত জমা খরচে দু'শ

টাকার খরচের গরমিল হ'ল। তখন জমীদারটী ঐ আমলাটীকেই ধমকা'তে লাগলেন এবং শেষে তাকেই ঐ টাকার জন্য দায়ী করলেন। পরন্তু, সঙ্গে যে পা'ক বরকন্দাজ পাঠিয়েছিলেন, তাদেরকে কিছুই জিজ্ঞাসাও করলেন না অথবা কিছু বল্লেন না। আমলাটীর পা'ক বরকন্দাজ অপেক্ষা উচ্চপদ, সুতরাং জমীদার টাকাটা আমলাটীর জিম্মাতে দিয়েছিলেন এবং তাকেই দায়ী করলেন। ভগবানও তেমনি মানুষকে বিবেক দিয়ে পাঠিয়েছেন ব'লে মানুষকেই কেবল কর্ম্মফলের জন্য দায়ী করেন। মনুষ্যেতর প্রাণীকে ভগবান বিবেক দিয়ে পাঠাননি, কাজেই তাদের কৃতকর্ম্মের জন্য কিছু বলেন না, সুতরাং তাদের কর্ম্মফলও প্রয়োজন হয় না। ভগবান মানুষকে যেমন বিবেক দিয়ে দায়ী ক'রেছেন, তেমনি মনুষ্য-জীবনে মহৎ ফললাভের ব্যবস্থাও ক'রেছেন। কেননা, বিবেকানুসারে সৎকর্ম্ম করলে ক্রমে তার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ ক'রে লোকে মুক্তি পেতে পারে।

শিষ্য। মূঢ় যোনীর প্রাণীর যদি কর্ম্মফলই নাই, তবে তাদের মধ্যে অবস্থার তারতম্য দেখা যায় কেন?

গুরু। অবস্থার কি রকম তারতম্য দেখ্‌লে?

শিষ্য। গরু, ঘোড়া, কুকুর ইত্যাদি প্রাণী যা লোকালয়ে আছে। তাদের মধ্যে দেখ্‌তে পাই যে, কোন প্রাণী সুখস্বচ্ছন্দে আছে, কোন প্রাণী অতি কষ্টে আছে, কোন প্রাণী বা রাজার হালে কাল কাটাচ্ছে, যেমন সাহেবদের পিয়ারা কুকুর। খিজ্‌মদ্ করবার জন্য মেথর চাকর আছে, দুধ রুটী মাংস ইত্যাদির সুবন্দোবস্ত আছে, শোবার বিছানা আছে, শীতকালে গায়ে গরম কাপড় দিয়ে দেয় ইত্যাদি। আমি আবার মুস্থরির পাহাড়ের চড়াই উঠ্‌তে দেখেছি যে, একটা সাহেব ঘোড়ায় যাচ্ছেন, আর তার প্রিয় কুকুরটাকে দুজন পাহাড়ী ডুলি ক'রে

সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে। এখন বলুন দেখি, মনুষ্যেতর প্রাণীর কর্ম্মফল না থাক্‌লে কি তাদের মধ্যে অবস্থার এত বৈষম্য হয়?

গুরু। মূঢ় যোনীর প্রাণী ত কষ্ট পাবেই, কষ্টভোগের জন্যই ত মূঢ় যোনীতে জন্ম নিয়েছে। নরকে কি আর সুখ আছে? তবে মূঢ় যোনীর কোন কোন প্রাণী যে সুখস্বচ্ছন্দে থাকে কি রাজভোগে থাকে, তার কারণ এই যে, লোক কৃত পাপকর্ম্মের ফলভোগের জন্য মানুষ থেকে একবারে মূঢ় যোনীতে আসে। সুতরাং মনুষ্যজন্মে যা কিছু পুণ্যকর্ম্ম করে, সেই সুকৃতের ফল মূঢ় যোনীতে এসেও ভোগ করে।

শিষ্য। এই ব'ললেন যে, মূঢ় যোনীর প্রাণীকে কর্ম্মফল ভোগ কর্‌তে হয় না। আবার ব'লছেন যে, সুকৃতির ফলভোগ করে। এ রহস্য ত আমি কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

গুরু। মূঢ় যোনীতে জন্ম নিয়ে যে কর্ম্ম করে, তারই ফলভোগ কর্‌তে হয় না, কিন্তু কর্ম্মদোষে যারা মানুষ থেকে একবারেতে মূঢ় যোনীতে আসে, তাদের মনুষ্য-জন্মকৃত পাপ এবং পুণ্য উভয়বিধ কর্ম্মফলই ভোগের জন্য সঙ্গে থাকে। পাপের ফলভোগের জন্য মূঢ় যোনীতে এসেছে এবং নরক-ভোগ কর্‌ছে। আর ঐ পুণ্য কর্ম্মের জন্য সুখস্বচ্ছন্দে আছে। জগতে এমন লোক পাবে না যে, জীবনে পাপ এবং পুণ্য উভয়বিধ কর্ম্ম না করেছে। তবে মাত্রার ন্যূনাধিক্য থাক্‌তে পারে। আচ্ছা, ঐ সাহেবের কুকুরটার কথাই ধর। কোন ব্যক্তি তার কৃতপাপের ফল-ভোগের জন্য কুকুর যোনীতে জন্ম নিয়ে সাহেবের কাছে আছে। এখন দেখ, সে তার কৃতপাপের ফলের জন্য কুকুর হয়েছে, কিন্তু তার পুণ্য-কর্ম্মের ফল যা আছে সেটাও ত ভোগ হওয়া চাই, তাই সে কুকুর হয়েও সুখভোগ কর্‌ছে।

শিষ্য। আমার মনে একটা ভয়ানক সংশয় হচ্ছে।

গুরু। সংশয়টা কি ?

শিষ্য। এই যে পুরাণাদিতে বর্ণিত যমালয়, যমরাজার এজলাস, চিত্রগুপ্তের খাতায় পাপ পুণ্য সব লেখা থাকে, যমরাজা তদনুসারে বিচার ক'রে পাপীকে নরকে এবং পুণ্যবানকে স্বর্গে পাঠান। যদি অন্য যোনীতে জন্ম নিয়ে কর্ম্মফল ভোগ করতে হয়, তবে এগুলি সব কি ?

গুরু। যমালয় সম্বন্ধে এগুলি সব কল্পিত বর্ণনা।

শিষ্য। পুরাণ ত সব ঋষিরাই লিখেছেন, তবে এ রকম কল্পনা ক'রে লিখলেন কেন ?

গুরু। বিষয়টা একটু তলিয়ে বুঝতে হবে। উপর উপর দেখলে কিছু বুঝতে পারবে না। পুরাণ ঋষি প্রণীত বটে, কিন্তু সমস্ত পুরাণই যে ঋষি প্রণীত সে কথা ব'লতে পারা যায় না। পণ্ডিতেরাও অনেক পুরাণ লিখে ঋষিদের নাম দিয়েছেন। ফলতঃ পুরাণ যাঁদের প্রণীতই হ'ক তাতে কোন দোষ নাই। কেননা, পুরাণ যারা লিখেছেন তারা যে জ্ঞানী পুরুষ তাতে কোন সন্দেহ নাই। বিশেষ প্রয়োজন ব'লেই ঐ সব কল্পনা ক'রে লিখেছেন।

শিষ্য। তবে কি পুরাণের লিখিত বিষয়গুলি সব কল্পিত ?

গুরু। তাও কি কখন হয় ? পুরাণও যে আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থ। তবে প্রয়োজনবশতঃ রূপক অলঙ্কারাদি পুরাণে বেশি আছে।

শিষ্য। রূপক অলঙ্কারের দ্বারায় জীবের যে কি কল্যাণ হ'তে পারে, তাত আমার বুদ্ধিতে আসছে না। আপনি দয়া ক'রে আমাকে বুঝিয়ে দিন।

গুরু। যমালয় ব'লে কোন স্বতন্ত্র স্থান নাই, পাপ পুণ্যের হিসাব কোন খাতায় লেখা থাকে না চিত্রগুপ্ত ব'লে কোন সেরেস্তাদার নাই, এবং যমরাজা বিচার ক'রে কাকেও স্বর্গে বা নরকে পাঠান না ; অথবা

পাপীদের শাস্তি দিবার জন্য যমালয় বিশেষ স্থানে চৌরাশী নরকও স্থাপিত নাই। আমি যে এত মতটা নিজে গ'ড়ে বলছি তা নয়। জনক যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে এ বিষয়ের বিবরণ আছে। মনু ব'লেছেন যে, যে যেমন কর্ম্ম কর্‌বে সে তদনুরূপ যোনীতে জন্মগ্রহণ ক'রে তার ফলভোগ কর্‌বে। ভগবানও গীতাতে মূঢ় যোনীকেই নরক ব'লে উল্লেখ ক'রেছেন। তা ছাড়া যুক্তির দ্বারা বিচার ক'রে দেখলেও এই দেখা যায় যে, জীবের মৃত্যুর পর তার যমালয় নামক স্থানে পাপপুণ্যের বিচার হ'য়ে নরকে অথবা স্বর্গে যেতে হয় না।

শিষ্য। তবে পুরাণে এত কল্পনা ক'রে লেখার তাৎপর্য্য কি?

গুরু। তাৎপর্য্য এই যে, সংসারে কটা লোক বেদ, বেদান্ত, উপনিষদাদি শাস্ত্রগ্রন্থ প'ড়ে থাকে, অথবা পড়বার অধিকারী হয়? মেনে নিলাম যে, সংসারে মুষ্টিমেয় শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি না হয় আপনাদের কল্যাণের রাস্তা আপনারাই ঠিক ক'রে নিতে পারেন; কিন্তু আর যে লক্ষ লক্ষ সাংসারিক সাধারণ অজ্ঞান লোক আছে তাদের উপায় কি? তাদেরই কল্যাণের জন্য পুরাণকারেরা কত রকম রূপক অলঙ্কার দিয়ে পুরাণকে সাজিয়েছেন।

শিষ্য। পুরাণের দ্বারা সাংসারিক সাধারণ অজ্ঞান লোকের কি কল্যাণ সাধিত হয়?

গুরু। যাতে ধর্ম্মকর্ম্ম কর'তে ইচ্ছা হয় এবং পাপকর্ম্ম করতে ভয় হয় পুরাণকারেরা তার উপায় পুরাণে বিশেষভাবে ক'রেছেন। পুরাণে রোচক এবং ভয়ানক এই দুইটী ভাব উত্তমরূপে দেখান আছে। যার দ্বারা সাংসারিক সাধারণ অজ্ঞান লোক ধর্ম্মকর্ম্মে আকৃষ্ট হয় এবং পাপকর্ম্মে ভীত হয়।

শিষ্য। আপনি পুরাণকে শাস্ত্রগ্রন্থ বল্‌ছেন, পুরাণ শাস্ত্রগ্রন্থ হয় কি ক'রে? আমার মনে হচ্চে লোকের কল্যাণকর কল্পনাময় গ্রন্থ।

গুরু। শুধু কল্পনাময় গ্রন্থ, যেমন উপন্যাসাদি তা কি আর কখন শাস্ত্রগ্রন্থ হ'তে পারে? ঈশ্বরের স্বরূপ হচ্ছে নিরাকার অর্থাৎ তিনি নির্গুণ ব্রহ্ম, কিন্তু তিনি প্রয়োজন বোধ করলে আবার আকারও ধারণ ক'রে থাকেন। সুতরাং নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মের এই দুই ভাবেরই উপাসনা অধিকারী ভেদে ক'রে থাকে। বেদ, বেদান্ত. উপনিষদাদিতে নির্গুণ ব্রহ্মের তত্ত্ব নিরূপণ আছে, এবং সেই তত্ত্ব জানবার অধিকারীও অতি অল্পতা তোমাকে পূর্ব্বেই ব'লেছি, কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতি সাধারণ অজ্ঞান লোকের ভক্তি প্রেম হওয়া অসম্ভব। কেন না, দেহাভিমানী জীব স্থূল পদার্থের নিদর্শনের অভাব হেতু, সেই নির্গুণ ব্রহ্মকে ধারণা ক'রতে পারে না। সেইজন্য ভগবান গীতার ১২শ অধ্যায়ের ৫ম শ্লোকে ব'লেছেন যে,

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষা মব্যক্তাসক্ত চেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥

হে অর্জ্জুন। নির্গুণ ব্রহ্মে আসক্ত চিত্ত জনগণের সিদ্ধিলাভে অর্থাৎ ঈশ্বরকে জানতে অধিকতর ক্লেশ হ'য়ে থাকে। কারণ দেহীগণ অতি কষ্টে নির্গুণ অর্থাৎ নিরাকার ব্রহ্মবিষয়ক নিষ্ঠা লাভ ক'রতে সমর্থ হয়। কেন না, কোন স্থূল নিদর্শন ভিন্ন দেহাভিমানী জীবের (লোকের) মন আকৃষ্ট হ'তে পারে না। তা হ'লে সাধারণ অজ্ঞান লোকেদের উপায় কি? তাতেই পুরাণকারেরা পুরাণের মধ্যে সগুণ অর্থাৎ সাকার ব্রহ্মের রূপ ঐশ্বর্য্যাদি, উপাসনা স্তবাদি অতি বিষদভাবে এবং মনোহর অলঙ্কারের সহিত বর্ণনা ক'রেছেন। যা প'ড়ে বা শু'নে পাষণ্ডেরও মন আকৃষ্ট হয়। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদাদিতে নির্গুণ ব্রহ্ম বীজস্বরূপ, এবং পুরাণাদিতে সগুণ ব্রহ্ম ডাল, পাতা, ফল, ফুল শোভিত মনোহর বৃক্ষস্বরূপ। কাজেই লোকের মন আকৃষ্ট হয়।

শিষ্য। তা হ'লে পুরাণও জীবের কল্যাণকর গ্রন্থ দেখ্‌ছি।

গুরু। তা নয়? কেবল জীবের কল্যাণের জন্যই পুরাণের সৃষ্টি হয়েছে। ঈশ্বরোপাসনা সকলেরই করা কর্ত্তব্য, কিন্তু সাধারণ অজ্ঞান নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা কর্‌তে পারে না, তাহ'লে কি তাদের ঈশ্বর উপাসনা হবে না? তবে কি তাদের কোন উপায় নাই? আছে বৈকি, তাদেরই জন্য পুরাণের সৃষ্টি হয়েছে। পুরাণ পাঠ বা শ্রবণের দ্বারা ঈশ্বরে ভক্তি প্রেম বাড়ে, মনে দিন দিন শান্তি ও আনন্দলাভও হ'তে থাকে এবং শেষে তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারীও হয়। পরন্তু, সংসারের সকলেই ত সে শ্রেণীর লোক নয়, এর ভিতর নিম্নশ্রেণীর লোকও আছে। পুরাণে যে রোচক এবং ভয়ানক এই ভাব দুটী বিশেষ ভাবে দেখান আছে, তাতে নিম্নশ্রেণীর লোকেদের বিশেষ কল্যাণ সাধিত হ'য়ে থাকে। কেন না, ঈশ্বরের মনোহর রূপ ও অসীম বিভূতি ঐশ্বর্য্যাদি শুনে তাঁর প্রতি তারা আকৃষ্ট হয় এবং যজ্ঞ, দান, তপ, অতিথি সেবা, দরিদ্রের প্রতি দয়া প্রকাশ ও একাদশ্যাদি ব্রত পালন প্রভৃতি কার্য্যের দ্বারা ধর্ম্মকর্ম্ম কর্‌তে প্রবৃত্ত হয়, সুতরাং সেই সব কর্ম্মের দ্বারা ক্রমে চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়। এই গেল রোচক ভাবের ফল এখন ভয়ানক ভাবের ফল শোন। কোন্ পাপ করলে যমপুরীতে কোন্ নরকে কি রকম যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে হয়, সেই সব কথা শু'নে অজ্ঞান লোক পাপকর্ম্মে অনেকটা নিবৃত্ত থাকে। পাকা গুলিখোরেরা যেমন গুলির নেশায় মাতোয়ারা কর্‌বার জন্য, লোককে চাট্ খাইয়ে গুলি খাওয়া শেখায়, ঋষিরাও তেমনি সাধারণ লোককে ভগবদ্-প্রেমে মাতোয়ারা কর্‌বার জন্য পুরাণে চাট্‌স্বরূপ রোচক বাক্য দিয়েছেন।

শিষ্য। আপনি যা ব'লছেন কথাটা সঙ্গত বটে, তবে কি জানেন আমরা ছেলেবেলা থেকে যমপুরীর কথা শু'নে আস্‌ছি, সেইজন্য মনে একটা সংস্কার ব'সে গিয়েছে তা সহজে যেতে চায় না।

গুরু। বদ্ধমূল সংস্কার মন থেকে সহজে যেতে চায় না বটে, কিন্তু তাই ব'লে লোককে আজীবন যে ভ্রমেই প'ড়ে থাকতে হবে সেটাও ত ঠিক নয়। তবে অধিকারী বিশেষে আজীবন এ ভ্রম থাকা সম্ভব তা আমি মানি। দেখ আসল তত্ত্ব ভ্রমেই ঢাকা আছে, সুতরাং সেই ভ্রম দূর করতে না পারলে তা হৃদয়ঙ্গম হয় না। সেই জন্যই সাধু মহাত্মাদের সঙ্গে সৎসঙ্গ করা প্রয়োজন। শাস্ত্র অধ্যয়ন কি ভজন সাধন অপেক্ষা সৎসঙ্গের ফল বেশী।

শিষ্য। যদি যমপুরী ব'লে বিচারের কোন স্বতন্ত্র স্থান এবং চিত্রগুপ্তের খাতায় কোন নিদর্শন নাই থাকে, তা হ'লে লোকের পাপপুণ্যের বিচার হয় কি ক'রে ?

গুরু। তোমাকে সেদিন ব'লেছি যে, লোকের মৃত্যুর পর তার সংস্কারই জীবাত্মাকে কর্ম্মোচিত যোনীতে নিয়ে যায়। চিত্রগুপ্তের খাতায় কিছু লেখা পড়া থাকে না। সূক্ষ্মাবস্থার কর্ম্মফলকে সংস্কার বলে, চিত্রগুপ্ত মানে সেই সংস্কার। কারণ, সংস্কাররূপী কর্ম্মফলগুলি সূক্ষ্মাবস্থায় গোপনে চিত্রিত হ'য়ে লোকের পরজন্মে ভোগের জন্য প্রস্তুত থাকে এবং তদনুসারেই জীবের গতি হ'য়ে থাকে। চিত্রগুপ্ত, সংস্কার কি অদৃষ্ট সব একই জিনিস।

শিষ্য। এটা ত বড় চমৎকার ব্যবস্থা দেখ্‌ছি।

গুরু। এ রকম ব্যবস্থা না হ'লে কি আর বিশ্বরাজ্যের কাজ চলে ? ঈশ্বর যেমন এই বিশ্বরাজ্য সৃষ্টি ক'রেছেন, তেমনি রাজ্য পরিচালনার অনুকূল ব্যবস্থাও ক'রেছেন। ব্যবস্থাটা এই যে এই বিশ্বের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করার ভার এক প্রকৃতির উপরেই ন্যস্ত আছে। তার মানে জাগতিক যাবতীয় কাজ আভ্যন্তরীন প্রাকৃতিক শক্তিতে আপনা-আপনিই সম্পন্ন হচ্ছে। লোকে বলে স্বভাব থেকে হচ্ছে। যখন প্রকৃতির দ্বারায় সমস্ত

কাজ সম্পন্ন হচ্ছে, তখন আর তার জন্য স্বতন্ত্র আইন আদালত, হাকিম হুকুম কিছুরই প্রয়োজন হয় না। যদি সে সব বন্দোবস্ত থাকত অর্থাৎ কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য প্রকৃতিকে অন্যের মুখাপেক্ষী হ'তে হ'ত, তা হ'লে এই বিশ্বরাজ্য পরিচালনার বিশৃঙ্খলাও ঘটত। কারণ, হাকিম হুকুম সাপেক্ষ বিষয় কখনই চিরদিন ঠিক এক সময়ে, এক নিয়মে সুসম্পন্ন হ'তে পারে না। তাছাড়া, প্রাকৃতিক কাজে অন্য কারও হাত দিবার প্রয়োজন নাই, এবং ক্ষমতাও নাই। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে পাপীর দণ্ড এই মর্ত্ত্যলোকেই হ'য়ে থাকে। এইখানেই বহুবিধ নরক বর্ত্তমান আছে। পাপবিশেষে সেই সব নরকবিশেষে দুঃখ ভোগ হ'য়ে থাকে। আর পুণ্যের ফলে যে সুখ তাও এই মর্ত্ত্যলোকেই ভোগ হয়, এবং পুণ্যকর্ম্ম-বিশেষে স্বর্গলোকেও তার ফলভোগ হ'য়ে থাকে।

শিষ্য। যমপুরী না গিয়ে এই মর্ত্ত্যলোকেই যে পাপপুণ্যের ফলভোগ হয় ব'ল্‌ছেন তা আমি মানলাম, কিন্তু কি রকম ভাবে যে ভোগ হয় সেইটা আমি জান্‌তে ইচ্ছা করি। তা, পরিষ্কাররূপে না বুঝতে পার্‌লে আমার বদ্ধমূল ধারণাটা যাবে না।

গুরু। পাপীকে যদি যমালয় নামক স্থানে নরক যন্ত্রণা ভোগ ক'রে আস্‌তে হ'ত, তা'হ'লে আর এ সংসারের লোককে নরক যন্ত্রণা ভোগ ক'রতে দেখা যেতো না। যে পাপী সে ত যমালয়ে নরক ভু'গে এসেছে, তবে আবার এখানে নরক ভোগ কেন? তাহ'লে কি ভগবান পাপীকে ডবল সাজা দেন? ভ্রম প্রমাদযুক্ত অজ্ঞান মনুষ্য রাজাও যখন দোষীকে ডবল সাজা দেন না, তখন অভ্রান্ত জ্ঞানময় পরম দয়াল পরমেশ্বর কি পাপী'কে ডবল সাজা দেবেন? একথা স্বপ্নেও কেও কল্পনা ক'রতে পারে না। ঐ যে গলিত কুষ্ঠগ্রস্ত লোকটার সর্ব্বাঙ্গ ঘায়ে খ'সে প'ড়ছে ঐ সব ঘা'য়ে

আবার পোকা থক্ থক্ করছে, এবং ঐ পোকার কামড়ের যন্ত্রণায় লোকটী দিবারাত্রি চীৎকার করছে। তার গায়ের দুর্গন্ধে কেও কাছ দিয়ে ঘেঁসে না। ভিক্ষার জন্য কোথাও যাবার ক্ষমতা নাই, কেও কোন খাবার জিনিস দিলেও, তা হাতে তুলে নিয়ে খেতে পারে না। লোকটী অসহ্য নরক যন্ত্রণা ভোগ কর্‌ছে। সে যদি তার পাপের জন্য যমালয়ে নরক ভোগ ক'রেই আস্‌বে তবে এখানে আবার নরক ভোগ কেন? তা নয়, নরক ভোগ করেনি, নরক যন্ত্রণা ভোগ এইখানেই হ'য়ে থাকে। তবে পাপভেদে নরকের ইতর বিশেষ আছে। মূঢ় যোনাতে, কেও পশ্বাদিরূপে, কেও কেও ক্রিমি কীটাদিরূপে সেই সেই রকম স্থানে বাস ক'রে নরক যন্ত্রণা ভোগ করছে, কেওবা মনুষ্য শরীরেই নরক যন্ত্রণা ভোগ কর্'ছ। যেমন ঐ লোকটী কর্‌ছে দেখ্‌ছ। দেখ একটী অন্ধ সন্তান জন্মেছে। ঐ সদ্যপ্রসূত বালক এ জন্মে ত কোন পাপ করেনি, আর পূর্ব্বজন্মে যদি পাপ ক'রে থাকে, তা হ'লে সে পাপের শাস্তি ত নরকে পেয়েই এসেছে, তবে আবার সে জন্মান্ধ হ'য়ে এখানে নরক যন্ত্রণা ভোগ কর্‌বে কেন?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ, নরক ভোগ কি স্বর্গ ভোগ (সুখ ভোগ) এইখানেই হয় ব'লে মনে হচ্ছে।

গুরু। হাঁ, পাপী যেমন এইখানে দুঃখ ভোগ করে, পুণ্যবান ব্যক্তিও তেম্‌নি এইখানেই সুখ ভোগ করেন। যাঁরা সেই রকম পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা দেবভোগ্য সুখের অধিকারী হন তারা আবার স্বর্গলোকে গিয়ে সে সুখভোগ করেন। মর্ত্তালোকের সুখভোগ আমরা দেখ্‌তে পাই, কিন্তু স্বর্গলোকের সুখভোগ আমরা দেখ্‌তে পাই না। কারণ, স্বর্গ দেবতাদের বাসস্থান আমাদের দৃষ্টির অতীত।

শিষ্য। যাঁরা সুখভোগ করতে স্বর্গে যান, তাঁরা সেখানে গিয়ে কি অবস্থায় থাকেন্?

গুরু। মর্ত্ত্যলোক কর্ম্মক্ষেত্র, স্বর্গলোক ভোগক্ষেত্র। সেখানে কোন কর্ম্ম নাই কেবল ভোগ আছে। যিনি যেমন কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি সেই রকম স্বর্গে গিয়ে কর্ম্মানুরূপ সুখভোগ করেন। চাষারা যেমন পরিশ্রম ক'রে মাঠে আবাদ ক'রে ফসল পাক্‌লে ঘরে নিয়ে এসে ব'সে খায়, কিন্তু ফসল ফুরুলেই আবার মাঠে গিয়ে চাষ আবাদ করে। তেমনি স্বর্গাকাঙ্ক্ষী কাম্য কর্ম্মীগণকেও স্বর্গের সুখ ফুরিয়ে গেলেই আবার মর্ত্ত্যে এসে জন্ম নিতে হয়।

শিষ্য। সুখের পর যখন দুঃখ পেতে হয়, তখন অস্থায়ী স্বর্গসুখ ভোগে লাভ কি?

গুরু। সেইজন্যই ত বুদ্ধিমান লোকেরা স্বর্গের অস্থায়ী সুখ আদৌ ইচ্ছা করেন না। কাজেই তাঁরা নিষ্কাম ভাবে সকল কর্ম্ম ক'রে থাকেন। নিষ্কাম কর্ম্মের ফল অক্ষয় সুখ, সে সুখ থেকে কখনই বিচ্যুত হ'তে হয় না। সংসারী লোক অধিকাংশই কিন্তু সেই অস্থায়ী অসার কাম্য কর্ম্ম ক'রতেই লালায়িত। দেখ্‌তে পাওনা? যাগ যজ্ঞাদি কি যে কোন ক্রিয়ার প্রারম্ভে সংকল্পটীর মন্ত্র ভাল ক'রে বলা চাই, প্রার্থনাপূর্ণ স্তবস্তুতিগুলি হৃদয়ের সহিত প্রাণ ভ'রে বলা চাই। তার মানে উপাস্য দেবতাকে আপনার মতলবটা পারিস্কাররূপে বলা চাই। কি জানি, ফলের কোন গড্‌বড় হয়। হায়!! লোকে কি ভ্রমজালে জড়িত।

শিষ্য। ঠিক কথা, বুদ্ধিমান লোকেরা কেন স্বর্গসুখ কামনা কর্‌বেন? কথায় বলে ঢেঁকী স্বর্গ থেকে এসে ধান ভানে। তেমনি যিনি স্বর্গে যাবেন তাঁকে আবার মর্ত্ত্যলোকে ফিরে এসে জন্ম নিতে

হবে। স্বর্গ সুখের অবস্থাটা আমি বুঝলাম। এখন আমাকে একটা বিষয় বুঝিয়ে দিন যে, ভূলোক থেকে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সাতটী লোক আছে সেদিন আপনি আমাকে ব'লেছেন। এই সাত লোকের কার্য্যই কি এক প্রকৃতির দ্বারায় সম্পন্ন হচ্ছে?

গুরু। হাঁ, সাত লোকের কাজ এক প্রকৃতির দ্বারাই সম্পন্ন হচ্ছে। সমস্ত লোকই যে বিশ্বের মধ্যে। সমগ্র বিশ্ব যখন প্রকৃতির আয়ত্বাধীন, তখন সমস্ত লোকের যাবতীয় কাজই তার দ্বারা সম্পন্ন হচ্ছে।

শিষ্য। প্রকৃতির ত আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখ্‌ছি, এবং কার্য্যপ্রণালী অতীব আশ্চর্য্যজনক। সমস্ত ব্যাপারই অলৌকিক। জীবের কৃত কর্ম্মের বিচারের জন্য আইন, আদালত, হাকিম হুকুম, সাক্ষী সাবুদ, নথীপত্র কিছুরই প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেক জীবের দেহের মধ্যেই তার কৃত পাপপুণ্যের নথীপত্র প্রমাণাদি সব মজুত আছে। প্রাকৃতিক নিয়মে তদনুসারে বিচার হয়।

গুরু। শুধু কি পাপ পুণ্য সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা দেখ্‌লে? জগতের যাবতীয় কাজেরই ব্যবস্থা এইরূপ।

শিষ্য। প্রাকৃতিক কাজের ব্যবস্থা শু'নে আমার মনে বড় আনন্দানুভব কর্‌ছি। অনুগ্রহ ক'রে আমায় আরও কিছু বলুন।

গুরু। আজ থাক্ সে অনেক কথা আবার কা'ল হবে।

ষষ্ঠ দিন।

শিষ্য। আজ আমায় প্রাকৃতিক কার্য্যপ্রণালী কিছু বলুন।

গুরু। দেখ, বোম্বাই কল্‌কাতার মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্যনির্ব্বা-হের জন্য ক্রোর টাকার উপর খরচ। কত কলকারখানা কত ইঞ্জিনিয়ার, কত মালমসলা, কত কারীকর, কত মেথর এবং কত লোকজন, তবুও সকল সময়ে সকল কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। এই বিশ্বরাজ্যের মিউনিসিপ্যালিটীর কাজ এক প্রকৃতির দ্বারায় সুসম্পন্ন হচ্ছে। অথচ কল্‌কারখানা কি কার্য্যকারকাদি স্বতন্ত্ররূপে বন্দোবস্ত কিছুই নাই। সহরের মিউনিসিপ্যালিটীর ময়লা মেথরে ব'য়ে নিয়ে গিয়ে মাটিতে গাড়ে, পুড়িয়ে দেয় অথবা ড্রেণের দ্বারা নদীতে ঢেলে ফেলে দেয়। প্রকৃতির মিউনিসিপ্যালিটীর শূকর কুকুরাদি মেথরগণ ময়লা সব খেয়ে ফেলে। লোকে ময়লা ব'লে টের পাওয়ার যো নাই। যদি শূকর কুকুরাদি মেথরগণ উপস্থিত না থাকে, তাহ'লে পৃথিবী ক্রমে সেই ময়লাগুলিকে আপনার সামিল ক'রে নেয়। গরু মরলে লোকে মাঠে ফেলে দেয়, মুচী খালখানা ছাড়িয়ে নিয়ে যায়, আর অমনি শকুনী, গৃধিনী, শেয়াল, কুকুরাদি এসে মাংসগুলা সব কপাকপ্‌ খেয়ে ফেলে। ঝাড়ুদার পবন এসে যা কিছু বদ্‌গন্ধ সব উড়িয়ে নিয়ে অনন্ত আকাশে মিশিয়ে দেয়। তার পর ভিস্তিবালা বৃষ্টি এসে হাড়ে যা কিছু মাংসের টুক্‌রা টাক্‌রা লেগে থাকে সব ধুয়ে মাটিতে ফেলে দেয়। পৃথিবী তখন সেগুলিকে আপনার সামিল ক'রে নেয়। এখন দেখ, এই যে কাজগুলি সব সম্পন্ন হ'চ্ছে, তার জন্য কেও কাওকে ডাক্‌ছে না, অথবা কেও কাওকে হুকুমও দিচ্ছে না।

সকলেই এসে আপন আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম ক'রে চ'লে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক যাবতীয় কাজই এই নিয়মে সম্পন্ন হ'য়ে থাকে।

শিষ্য। ভগবান এক প্রকৃতির দ্বারায় যে ভাবে বিশ্বের কাজ সব সম্পন্ন করাচ্ছেন, তা আমাদের বুঝ্বার সাধ্য নাই।

গুরু। ভগবানের ঐশ্বর্য্য, ক্ষমতা, বিভূতি কি দয়াদি মনে চিন্তা ক'রে দেখ্লে স্তম্ভিত হ'তে হয়। তিনি স্বয়ং বা তাঁর প্রকৃতি অথবা তাঁদের কার্য্য অচিন্তনীয়, সুতরাং বোঝ্বার উপায় নাই। মানুষ ত মানুষ দেবতারাই বুঝ্তে পারেন না।

শিষ্য। আপনি পাহাড়ে বাস ক'রেছেন, সেই সব জায়গার প্রাকৃতিক কার্য্যপ্রণালী শুন্তে আমার বড় কৌতূহল হচ্ছে।

গুরু। আচ্ছা, আমি যা কিছু দেখেছি এবং বুঝেছি তা তোমাকে বল্‌ছি শোন। মানুষে কলকারখানা ইন্‌জিনিয়ারিং যা কিছু শিখেছে এবং ক'রছে, তা সব সেই প্রকৃতির অনুকরণেই শিখেছে এবং প্রাকৃতিক শক্তির সাহায্যেই করছে। প্রকৃতি মুহূর্ত্ত মধ্যে যে জিনিস বহু পরিমাণে উৎপন্ন করেন, মানুষের সেই জিনিস আংশিক পরিমাণে উৎপন্ন করতেও বহু সময়, বহু ব্যয় ও বহু পরিশ্রম লাগে এবং সেই জিনিসের গুণেরও তারতম্য হয়। গঙ্গোত্রীর প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর। চারিদিকে পাহাড়ের উপরিভাগ সব বরফে সাদা ধপ্ ধপ্ করছে এবং তার উপর সূর্য্যরশ্মি প'ড়ে কত রকম আশ্চর্য্য রং দেখাচ্ছে। পাহাড় যেন সব চক্‌মক্ করছে। একদিন একটা আশ্চর্য্য ঘটনা যা আমি স্বচক্ষে দেখেছি তা বলি শোন। একদিন বিকালে বেলা চারটার সময়, গঙ্গার ওপারে একটা পাহাড়ে বরফ প'ড়তে আরম্ভ হ'ল। ঠিক যেন ঝুড়ি ক'রে গোবর ফেল্‌ছে। দশ মিনিটের মধ্যে দু মাইল আন্দাজ পাহাড়ের উপরটা বরফে ঢেকে গেল। এপার থেকে বোধ হচ্ছিল, যেন তিন ফুট উঁচু হ'য়ে বরফ প'ড়েছে;

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উচু আরও বেশি ছিল, কেন না, দূর ব'লে কম দেখাচ্ছিল।

শিষ্য। বড় আশ্চর্য্য কথা শুন্‌ছি। কল্‌কাতায় বরফের কারখানায় এক মণ দু মণ এক একটা বরফের চেঙ্গড় দেখেছি বটে, কিন্তু এরূপ ঢালাভাবে বরফ দেখিনি কিম্বা শুনিনি।

গুরু। কারখানায় যে বরফ তৈয়ার হয়, তাতে কলকারখানা চাই, জলে মসলা মেশান চাই, তবে গা বরফ তৈয়ারি হয়। হাজার মণ বরফ যদি কারখানায় তৈয়ারি ক'রতে হয়, তাহ'লে অনেক তোড়্‌যোড়্‌ ও অনেক সময়ের দরকার, কিন্তু প্রকৃতি দশ মিনিটের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মণ বরফ তৈয়ারি ক'রে ফেল্‌ছেন। কোন কলকারখানা অথবা মসলাদি কিছুই লাগে না।

শিষ্য। প্রকৃতি কি রকম ভাবে বরফ তৈয়ারি ক'রে ঝুপ্‌ঝুপ্‌ ক'রে ফেলেন। জান্‌বার জন্য বড় কৌতূহল হচ্ছে অনুগ্রহ ক'রে বলুন।

গুরু। জল জমে যে বরফ হয় তা অবশ্য তোমার জানা আছে। শীত প্রধান স্থানে রাত্রিতে বাইরে কোন পাত্রে জল রাখ্‌লে জ'মে বরফ হয়ে যায় তা আমি স্বচক্ষে দেখেছি। প্রাকৃতিক বরফ মেঘ থেকে উৎপন্ন হয়। মেঘগুলি বিন্দু বিন্দু জলকণার সমষ্টি মাত্র। হিমালয়ের খুব উচ্চ স্থানগুলি এতই শীতপ্রধান স্থান যে, সেখানে মেঘ যাওয়া মাত্র মেঘস্থ জলকণা সব বরফে পরিণত হয়।

শিষ্য। সেখানে মেঘ যায় কেন?

গুরু। মেঘগুলিকে হাওয়াতে ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে সেই সব উচু স্থানে নিয়ে যায়, এবং বরাবরই পাহাড় আরও উঁচু হ'য়ে চ'লেছে, কাজেই মেঘগুলি সেই সব পাহাড়ে বাধা পায়, সুতরাং পাহাড় অতিক্রম ক'রে আর আগে যেতে পারে না ব'লে, এবং হাওয়াতে পাহাড়ের গায়ে ধ'রে

রেখেছে, এই কারণ মেঘগুলি সেইখানেই স্থির হ'য়ে থাকে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে বরফ পরিণত হয়, আর অমনি পাহাড়ের উপর ঐ সব বরফ ঝুপ্‌ঝুপ্‌ ক'রে পড়ে যায়। কেননা, বরফ কঠিন পদার্থ ব'লে শূন্যে থাকতে পারে না।

শিষ্য। গঙ্গোত্রীতে কি খুব বৃষ্টি হয় ?

গুরু। সেখানে বৃষ্টি বড় আশ্চর্য্য রকমে হ'য়ে থাকে। প্রাকৃতিক সব আশ্চর্য্য কাজ দেখ্‌লে পরে হৃদয় ভগবৎ প্রেমে আপ্লুত হ'য়ে যায়। আমি শ্রাবণ মাসে গঙ্গোত্রীতে ছিলাম। বৃষ্টি প্রায় হ'তো দেখ্‌তাম, কিন্তু ফিন্‌ ফিন্‌ ক'রে একদিনও জোরে বৃষ্টি দেখ্‌লাম না। একটী পাণ্ডাকে তার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে উত্তর দিল যে, জোরে বৃষ্টি হ'লে আমরা খাব কি বাবা ? গঙ্গোত্রীর দশ মাইল নীচে পাহাড়ের গায়ে ঢালু জায়গায় কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ে আবাদ হয়। আরও দু মাইল নীচে পাণ্ডাদের বাড়ী। পাহাড়ের গায়ে ঢালুতে ফসল হয়, কাজেই বেশী জোরে বৃষ্টি হ'লে সব ধুঁয়ে নিয়ে যাবে। ফসলের মধ্যে গোল আলু প্রধান, আদা, এবং গম ধানও কিছু কিছু হয়।

শিষ্য। প্রাকৃতিক কার্য্যেও ভগবানের অসীম দয়া এবং কৌশল প্রকাশ পাচ্ছে দেখ্‌ছি।

গুরু। ভগবান প্রাকৃতিক একটী জিনিস বা কাজের দ্বারা অনেক গুলি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করাচ্ছেন। এমন কি, এ সংসারে একটী তৃণের দ্বারায়ও সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছে।

শিষ্য। প্রাকৃতির একটী জিনিসের দ্বারা একাধিক উদ্দেশ্য কি ক'রে সিদ্ধ হ'চ্ছে ?

গুরু। বাইরে যাওয়ার দরকার নাই। তোমার শরীরেরই কোন একটী অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিয়ে বিচার ক'রে দেখ্‌লেই তা বুঝ্‌তে পারবে। এই

চোখের পাপ্‌ড়ী। এতে কি কি কাজ হয় তা জান? প্রথমতঃ চোখের শোভাবৰ্দ্ধক, পাপ্‌ড়ীবিহীন চোখ্‌ খুব খারাপ দেখায় আমি তা দেখেছি। দ্বিতীয়তঃ চোখে ধুলা কুটা কিছু পড়্‌তে দেয় না। তৃতীয়তঃ দৃষ্টিশক্তির তেজ বাড়ায়। চোখ্‌ বু'জে তারপর ঈষৎ খু'লে চোখের নিকট কোন লেখা ধ'রে পাপ্‌ড়ীর মধ্যে দিয়ে দেখ্‌লে অক্ষর বেশ বড় দেখায়। ঘাসে কি কি হচ্ছে তা জান? প্রথমতঃ পৃথিবীতল শোভা ক'রে থাকে। দ্বিতীয়তঃ মাটির আবরণ, যেমন তেজেই বৃষ্টি হ'ক না কেন, মাটি ধু'য়ে নিয়ে যেতে পার্‌বে না। তৃতীয়তঃ ঘাসের সবুজ রঙ্গে সমস্ত প্রাণীর চোখ ঠাণ্ডা রাখে। চতুর্থতঃ পশ্বাদি প্রাণীর খাদ্য। ঘাস ও ঘাসের শিকড় মানুষের অনেক ওষুধে লাগে। এই রকমে প্রাকৃতিক যাবতীয় জিনিস একাধিক কাজ কর্‌ছে।

শিষ্য। আমি এখন এই ভাব্‌ছি যে, ভগবানের প্রাকৃতিক কাজ বোঝ্‌বার সাধ্য কারও নাই, তখন তাঁকে জানবার সাধ্যই নাই।

গুরু। ভগবান সহজে বোধগম্য হওয়ার বিষয় নন্‌। তবে কৃপা ক'রে যাঁকে যতটুকু জানিয়ে দেন, তিনি ততটুকুই তাঁকে জান্‌তে পারেন। সাংসারিক সাধারণ লোক ভগবানকে তাদের নিজেদের ছাঁচে ঢেলে নেয়। ভগবৎ কৃপায় তাঁর তত্ত্ব কিছু অনুভবে এলে, তখন আর তাঁকে নিজের ছাঁচে গড়্‌তে ইচ্ছা হয় না, বরং তাঁর ছাঁচেই নিজেকে গড়্‌তে হয়। তাঁর কৃপা ভিন্ন তাঁকে জানবার আর উপায় নাই।

শিষ্য। আপনি ব'লেছিলেন যে, অদ্বৈতজ্ঞানের আশ্রয় নিয়ে আসল তত্ত্ব আমাকে বোঝাবেন। আজ আমাকে সেইটা বুঝিয়ে দিন। আমার সংশয়টা মিটে যাক

গুরু। আচ্ছা, তোমার মনের সংশয়টা আগে বল।

শিষ্য। আপনি যে ব'লেছেন জীবাত্মা ও পরমাত্মা দুইই এক,

কেবল অবস্থানের পার্থক্য হেতু নাম ভেদমাত্র। জীবাত্মা কর্ম্মফলে আবদ্ধ হ'য়ে ভূতগণের দেহেতে বদ্ধাবস্থায় অবস্থান কর্‌ছেন আর পরমাত্মা সমগ্র বিশ্বব্যেপে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পূর্ণব্রহ্মরূপে মুক্তাবস্থায় অবস্থান কর্‌ছেন। আমার এই সংশয় হ'চ্ছে যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা যদি একই হন, তাহ'লে পরমাত্মা অখণ্ড পূর্ণব্রহ্ম থাকেন কি ক'রে? কেননা, পরমাত্মা থেকে জীবাত্মা বিচ্ছিন্ন হ'য়ে এসেই ত তাঁর অংশরূপে ভূত-গণের দেহেতে অবস্থান ক'র্‌ছেন। সুতরাং বিশ্বব্যাপী ব্রহ্ম অখণ্ড অর্থাৎ পূর্ণ রৈলেন কৈ?

গুরু। জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই এবং পরমাত্মা অবিচ্ছিন্ন অর্থাৎ অখণ্ড। ভূতগণের দেহেতে অবস্থান করছেন মনে ক'রে তুমি পৃথক ভাব্‌ছ। আমি ব'লছি তুমি নিশ্চয় জেন যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছ, তাও পরমাত্মা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, শুধু ভূতগণস্থিত আত্মার কথা কেন?

শিষ্য। এ যে আবার নতুন কথা শুন্‌ছি। তবে ত আরও ভাল। এ সব সৃষ্টি পরমাত্মার সঙ্গে এক হ'ল কিসে?

গুরু। যেমন সমুদ্র আর তরঙ্গ। তরঙ্গ কি সমুদ্র ছাড়া? না সমু-দ্রের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন? তরঙ্গ সমুদ্র হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'তে পারে না। যেখানে সমুদ্র নাই সেখানে তরঙ্গও নাই। নীচে যেমন বিশাল সমুদ্র প'ড়ে আছে, আর তার উপর তরঙ্গ উঠ্‌ছে। তেমনি পরমাত্মারূপ অনন্ত সমুদ্র প'ড়ে আছেন, আর তাঁরই উপরে সৃষ্টিরূপ তরঙ্গ উঠ্‌ছে অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হ'চ্ছে। সমুদ্র যেমন তার তরঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'তে পারে না। পরমাত্মাও তেমনি তাঁর সৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হ'তে পারেন না। সমুদ্র তরঙ্গে সূর্য্যরশ্মি প'ড়ে যেমন নানা রকম দেখায়, তেমনি পরমাত্মার সৃষ্টি তরঙ্গেও মায়ারূপ রশ্মি প'ড়ে নানা রকম

দেখাচ্ছে। যেমন সমুদ্রের জলই তরঙ্গে পরিণত হয়, তেম্‌নি পরমাত্মা স্বয়ংই এই বিশ্বে পরিণত হ'য়েছেন। মায়াপ্রযুক্ত এই বিশ্ব ব্যাপার নানা রকম দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু মায়া নির্ম্মুক্ত হ'লেই সেই একমাত্র সচ্চিদানন্দ পরমাত্মাকেই দেখা যায়।

শিষ্য। সৃষ্টি যে পরমাত্মা থেকে বিচ্ছিন্ন নয় তা আমি মান্‌লাম। পরন্তু, জীবাত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধে আমার এই সংশয় হয়েছে যে, পরস্পর ভিন্ন স্থানে ও ভিন্ন অবস্থায় থেকেও কি ক'রে এক হ'তে পারেন?

গুরু। সেদিন যে তোমাকে দ্বৈতজ্ঞানের কথা ব'লেছি, ঐ ভাবটী সাধারণ লোকের বোধগম্য এবং তাদের উপাসনারও অনুকূল। কেন না, তারা অদ্বৈত ভাব মনে ধারণা কর্‌তেই পারে না। বাস্তবিক, পরমাত্মা অবিচ্ছিন্ন ভাবেই সমগ্র বিশ্বব্যেপে অবস্থান কর্‌ছেন। আকাশ যেমন কখন বিচ্ছিন্ন হয় না, পরমাত্মাও তেম্‌নি কখন বিচ্ছিন্ন হন না, সুতরাং জীবাত্মা আলাদা হবেন কি ক'রে? কেবল কল্পিত উপাধিযুক্ত হওয়াতেই তাঁকে আলাদা ব'লে বোধ হয়। যেমন ঘটাকাশ ও মহাকাশ।

শিষ্য। আপনি যে ঘটাকাশ ও মহাকাশের উদাহরণ দিচ্ছেন, আমি কিন্তু তার কিছুই বুঝ্‌লাম না।

গুরু। যতক্ষণ ঘট থাকে ততক্ষণ ঘটমধ্যস্থ আকাশ ঘটাকাশ ব'লে পরিচিত হয়। ঘটের নাশ হ'লে ঘটাকাশ ও মহাকাশ মিশে যেমন এক হ'য়ে যায়, এবং এক মহাকাশই নাম থাকে। তেম্‌নি উপাধিরূপ দেহ ঘটের নাশ হ'লে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা মিশে এক হ'য়ে যান এবং কেবল পরমাত্মাই নাম থাকে।

শিষ্য। তবে ম'লেই ত দেহরূপ ঘটের নাশ হয়, সুতরাং মৃত্যু হ'লেই মুক্তি।

গুরু। দ্বৈতভাবের আশ্রয় নিয়ে তোমাকে বোঝাতে হবে, নচেৎ তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে না। মৃত্যুতে স্থূল শরীর ঘটের নাশ হয় বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম ও কারণ শরীররূপ ঘটের নাশ হয় না। এই সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর-রূপ ঘটের নাশকেই ঘটের নাশ বলে। সূক্ষ্ম শরীবকে লিঙ্গ শরীবও বলে। কাঠের সিংহাসন মধ্যস্থ রূপার সিংহাসনে সোণাব আসনে শাল-গ্রাম শিলা যেমন বিবাজমান থাকেন, তেম্‌নি স্থূল শরীরেব মধ্যস্থ সূক্ষ্ম শবীরে কাবণ শরীবরূপ আসনে জীবাত্মা থাকেন। স্থূল শরীরেব নাশ হ'লে, অর্থাৎ মৃত্যু হ'লে, তখন ঐ সূক্ষ্ম শরীররূপ সিংহাসন কারণ শরীর-রূপ আসনে বসিয়ে জীবাত্মাকে ব'য়ে নিয়ে গিয়ে অন্য নতুন স্থূল দেহেতে স্থাপন করে। তাকেই লোকে জন্ম বলে। কোটী কোটী বার এই স্থূল দেহের উৎপত্তি ও বিনাশ হচ্ছে, অর্থাৎ জন্ম ও মৃত্যু হ'চ্ছে, কিন্তু সূক্ষ্ম ও কারণ দেহের নাশ হয় না। যেহেতু তারা আগুনে পোড়ে না, অস্ত্রে কাটে না, পচে না সড়ে না, স্থূল পদার্থ নয় ব'লে কিছুতেই তাদেরকে ধ'রতে ছুঁতে পারা যায় না। সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরের নাশ হ'লেই মায়া-কল্পিত জীবাত্মারূপ উপাধি ঘু'চে গিয়ে তখন কেবল এক পরমাত্মা ব'লেই কথিত হন

শিষ্য। শরীর কটা ?

গুরু। কেন ? সেদিন আত্মা কেমন সেই প্রসঙ্গের মধ্যে তিনটী শবীরেব উল্লেখ শু'নেছ। শরীর তিনটী স্থূল, সূক্ষ্ম ও কাবণ।

শিষ্য। এই তিনটি শবীর কেমন তাই আমাকে বুঝিয়ে দিন।

গুরু। পাপ ও পুণ্যেব দরুণ দুঃখ ও সুখভোগ কর্‌বার জন্য ষড়-বিকার ভাবগ্রস্ত যে ভোগায়তন অর্থাৎ ভোগের স্থান তাই স্থূল-শরীর, তার মানে এই দেহ স্থূল-শরীর। পাঁচটী প্রাণ, পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি, এই সতেরটী তত্ত্ব নিয়ে যে শরীর তাই সূক্ষ্ম শরীব।

আর স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের উৎপত্তির কারণ যে মায়াজনিত অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞানতা তাই কারণ শরীর।

শিষ্য। ষড়বিকার ভাবগ্রস্ত স্থূল-শরীর ব'লছেন সেই বিকার কি কি?

গুরু। সাংখ্য শাস্ত্রে ব'লছেন যে, এই স্থূল দেহ ছয়টী বিকারযুক্ত যথা—জন্ম, বিদ্যমানতা, বৃদ্ধি, পরিণতি, অপক্ষয় ও বিনাশ। এই কয়টী বিকার আছে ব'লেই স্থূল শরীরের নাশ হয়, কিন্তু সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরের এই বিকার কয়টী নাই, সুতরাং তাদের নাশও সহজে হয় না। তাদেরই নাশ হ'লে তবে গা জীবের মুক্তি।

শিষ্য। সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরের নাশ হ'লে জীবের মুক্তি হয় ব'লছেন, কিন্তু তাদের নাশ হয় কিসে?

গুরু। তত্ত্বজ্ঞান লাভে নাশ হয়। এই জ্ঞানকে আত্মজ্ঞানও বলে। যেমন সূর্য্য উদয় হ'লে অন্ধকার আর থাকেনা, তেমনি তত্ত্বলাভ হ'লে উক্ত শরীরদ্বয়ের অস্তিত্বও আর থাকে না। ফট্‌কিরা যেমন জলের ময়লা কেটে দিয়ে জলকে পরিষ্কার টল্‌টলে করে, তখন জল ভিন্ন জলের মধ্যে আর কিছুই দেখা যায় না। তত্ত্বজ্ঞানও তেম্‌নি আত্মার মায়াকল্পিত উপাধিরূপ ময়লা কেটে দিয়ে আত্মাকে পরিষ্কার টল্‌টলে করে। তখন এ জগতে আত্মা ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না।

শিষ্য। তত্ত্বজ্ঞান কি ক'রে লাভ হয় সেইটা আমাকে অনুগ্রহ ক'রে বলুন।

গুরু। তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায় হ'চ্ছে চিত্তশুদ্ধি। সেই চিত্তশুদ্ধি আবার অধিকারী ভেদে বিভিন্ন প্রকারে লাভ হ'য়ে থাকে। যাঁদের সংসারে বিরাগ জন্মেছে অর্থাৎ সংসারত্যাগী, তাঁদের বৈরাগ্যের প্রবলতাতে চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়। শাস্ত্র বচন শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, পর্য্যায়ক্রমে এইগুলি সাধন ক'র্‌লে চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়। যোগশাস্ত্র কথিত

আসন প্রাণায়মের দ্বারায় চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়। সমস্ত কর্ম্ম নিষ্কামভাবে ক'র্লে চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়। ভগবদ্ সেবা ক'বলে চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়, এবং সাধু সেবা ও সাধুসঙ্গ কর্লেও চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়। এই চিত্তশুদ্ধি যখন লাভ হয় অর্থাৎ চিত্তে রাগ, দ্বেষ, আশা, তৃষ্ণাদি কোন রকম ময়লা যখন উৎপন্ন না হয়, তখন গুরু উপদিষ্ট সাধনা কর্লে ক্রমে তত্ত্বজ্ঞানের বিমল জ্যোতিঃ অন্তরে প্রকাশ পায়। সংসারত্যাগী মহাত্মারা শাস্ত্র-বচন শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও যোগশাস্ত্র কথিত আসন প্রাণায়মাদির দ্বাবা চিত্তশুদ্ধি লাভ করেন, এবং গৃহীরা নিষ্কামভাবে যজ্ঞ, দান ও তপ অনুষ্ঠান দ্বাবা চিত্তশুদ্ধি লাভ করেন। ইহাকেই নিষ্কাম কর্ম্মযোগ বলে। এই কর্ম্মযোগই গৃহীদের উপায় এবং কল্যাণকর।

শিষ্য। আপনি গৃহী ও ত্যাগীর চিত্তশুদ্ধির উপায় আলাদা আলাদা যা বল্লেন তা বুঝলাম্। এখন এমন একটা উপায় বলুন যা সকলেই অবলম্বন ক'রতে পারে।

গুরু। ভগবদ্ সেবা। গৃহী ত্যাগী সকলেই এই উপায়টী অবলম্বন কর্তে পারে। মন প্রাণের সহিত ভগবদ্ সেবা ক'র্লে নিশ্চয়ই চিত্ত-শুদ্ধি লাভ হবে। ফলতঃ চিত্তশুদ্ধি লাভ না হ'লে তত্ত্বজ্ঞান লাভের কোন আশাই নাই।

শিষ্য। চিত্তশুদ্ধি না হ'লে তত্ত্বজ্ঞান লাভের কোন আশা নাই কেন?

গুরু। চাষের দ্বারা জমী খুঁড়ে পরিষ্কার না ক'রে ফসল বুন্লে যেমন ফসল হয় না, তেম্নি চিত্তশুদ্ধির দ্বাবা হৃদয় পরিষ্কার না ক'রে সাধনাদি ক'র্লেও কোন ফল হয় না। মনের মধ্যে রাগ দ্বেষাদি ময়লা-গুলি পু'রে রেখে লোক দেখান ভজন সাধন কর্লে কি হবে?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ, চিত্তশুদ্ধির যে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আমি বেশ বুঝ্লাম্। এখন আমাকে জীবাত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধে বুঝিয়ে দিন।

আপনি ব'লছেন যে, পরমাত্মা অখণ্ড অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন ভাবে সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্ত আছেন। আবাব ব'লছেন যে, জীবাত্মা ও পবমাত্মা ঘটাকাশ ও মহাকাশেব মত। ঘটেব নাশ হ'লে যেমন ঘটাকাশ মহাকাশে মিশে এক হ'য়ে যায়, তেমনি দেহরূপ ঘটেব নাশ হ'লেও জীবাত্মা ও পবমাত্মা মিশে এক হ'য়ে যান। এখন আমার সংশয় এই যে ঘটেব নাশ হ'লে ঘটাকাশ যেখানকার সেইখানে থাকে। পবন্তু, জীবাত্মা যে চ'লে বেড়ান। এক দেহরূপ ঘটেব নাশ হ'লে অর্থাৎ মৃত্যু হ'লে অন্য দেহরূপ ঘটে অধিষ্ঠিত হন অর্থাৎ জন্ম হয়। সুতরাং জীবাত্মা পবমাত্মা থেকে বিচ্ছিন্ন না হ'লে কি ক'বে যাওয়া আসা করেন অর্থাৎ মৃত্যু ও জন্মেব অধীন হন।

গুরু। জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই জিনিস, উপাধিযুক্ত হওয়াতেই বিভিন্ন ব'লে বোধ হয়। যাকে তুমি জীবাত্মা বলছ, বাস্তবিক পক্ষে তিনি কোথাও যাচ্ছেন্ না অথবা আস্‌ছেন না। সচবাচব বিশ্বেব সকল স্থানেই তিনি পরিপূর্ণ আছেন। অবশ্য এই বিশ্বেব কোন স্থানে যদি ফাঁক থাক্‌ত তাহ'লে না হয় তিনি যেতে আস্‌তে পাবতেন স্বীকার করি। যেতে গেলেই খোলাসা স্থান অর্থাৎ খালি জায়গা চাই, নইলে যান কি ক'রে? এবং যেস্থান হ'তে যাবেন সে স্থানটাও খালি ক'রে অর্থাৎ শূন্য ক'রে যেতে হবে। পবন্তু, এই দুটাব একটাও নয়, কেননা তিনি বিশ্বেব সর্ব্বস্থানে সর্ব্বদা পূর্ণরূপে বর্ত্তমান আছেন। এই সচবাচব বিশ্বে তিলার্দ্ধ স্থানও পাবেনা যেখানে তিনি অধিষ্ঠিত না আছেন। এ অবস্থায় আত্মাব যাওয়া আসা কি ক'বে প্রতিপন্ন হ'তে পাবে? সেইজন্য ভগবান শঙ্কবাচার্য্য পবাপূজা স্তোত্রে ব'লেছেন যে, "পূর্ণস্যাবাহনং কুত্র," "সর্ব্বোধাবস্যচাসনম্"। এই বিশ্বেব সর্ব্বত্রই তুমি পূর্ণরূপে বর্ত্তমান আছ, তোমাকে আহ্বান কি ক'রে কব্‌তে পাবা যায়। নতুন এলেই লোকে আহ্বান ক'বে থাকে,

যে বরাবর উপস্থিত অছে তাকে কি কেও আহ্বান করে? সকল স্থানই অধিকার ক'রে তুমি ব্যাপ্ত আছ, তোমাকে আসনই বা কোথায় দিবে? অর্থাৎ তুমিই সমগ্র বিশ্বের আধার তোমার আধার কৈ? ভগবানও গীতার ১৩শ অধ্যায়ের ১৩শ শ্লোকে ব'লেছেন যে,

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বামাবৃত্য তিষ্ঠতি॥

সর্ব্বত্রই (এই বিশ্বের সর্ব্বত্র) তাঁব (ঈশ্বরের) হাত, পা, চোখ, মাথা ও মুখ বিরাজিত আছে। তিনি সর্ব্বত্রকে (বিশ্বকে) আবৃত ক'রে অবস্থান কর্‌ছেন। এখন বিচার ক'রে দেখ, তিনি ছাড়া খালি জায়গা থাক্‌লে তিনি অবশ্য যেতে আস্‌তে পার্‌তেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে তাঁর পেটের মধ্যে। আর জন্ম মৃত্যুতে আত্মা আসা যাওয়া করেন, এ সংশয় যদি তোমার হয়, তাহ'লে তার উত্তর ভগবদ্বাক্যেই পাবে। আত্মার যে জন্ম মৃত্যু নাই ভগবান তা গীতার ২য় অধ্যায়ের ২০শ শ্লোকে বলেছেন যে,

ন জায়তে ম্রিযতে বা কদাচি-
ন্নাযং ভুত্বা ভভিতা বা ন ভূযঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুবাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শবীবে॥

আত্মা কখন জন্মেন না বা মরেন না, কখন হননি, কখন বর্ত্তমান নাই বা হবেন না, এবং ইনি বর্দ্ধিত হন না। কেন না ইনি (আত্মা) অজ (জন্মরহিত), নিত্য (চিরকাল বর্ত্তমান), শাশ্বত (অপক্ষয়শূন্য) এবং পুরাণ (পরিণাম শূন্য অর্থাৎ যেমন আছেন তেম্‌নি থাক্‌বেন)

অর্থাৎ জন্ম, বিদ্যমানতা, অপক্ষয় শূন্য, পরিণতি ও বিনাশ এই ষড়বিধ বিকারশূন্য।

শিষ্য। আমি ত মশায় বিষম ধাঁদায় পড়ে গেলেম দেখ্‌ছি। আত্মা জন্মেন না মরেন না, তার না হয় মানে হ'তে পারে, আত্মা যে বিদ্যমান নাই ব'লছেন, এ কি রকম কথা? তবে কি আত্মা নাই?

গুরু। আত্মা থাক্‌বে না কেন? কেবল আত্মাই আছেন আত্মা ছাড়া আর কিছুই নাই। তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন, কিন্তু তিনি বিদ্যমান আছেন এই কথা ব'ল্লে তার এই মানে হয় যে, তিনি আগে ছিলেন না এখন আছেন। যেমন কেও ব'লছে যে গোপাল বাবু এখন সেখানে বিদ্যমান আছেন। তার মানে এই যে তিনি সেখানে আগে ছিলেন না এখন আছেন। আত্মা বিদ্যমান আছেন বলেও ঠিক তাই বুঝায়। সেই দোষ পরিহারের জন্যই আত্মা বিদ্যমান আছেন একথা বলা নিষিদ্ধ।

শিষ্য। আচ্ছা, এটা না হয় স্বীকার কর্‌লাম, কিন্তু আত্মা আসা যাওয়া করেন অর্থাৎ জন্ম মৃত্যুর অধীন হন, তা আপনি না ব'ল্‌বেন কিসে? স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি মৃত্যু হ'লে আত্মা চ'লে যান, তখন দেহটা মাটির মত প'ড়ে থাকে, এবং গর্ভস্থ সন্তানের যখন আসেন তখন পেটের মধ্যে ঐ ছেলে নড়াচড়া করে এবং সময়মত ভূমিষ্ঠ হয়। যে সন্তানের দেহেতে আত্মা না থাকেন অর্থাৎ মৃত সন্তান প্রসব হয় না, ডাক্তারেরা কেটে কেটে বার করে। আর যে আপনি ঘটাকাশ ও মহাকাশের উদাহরণ দিলেন, জীবাত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধে সে উদাহরণও খাটে না। কারণ, ঘট ভাঙ্গলে ঘটাকাশ যেখানকার সেইখানেই থাকে, কিন্তু জীবাত্মা যে চ'লে বেড়ান্।

আচ্ছা, তুমি যে ভাবে বুঝ্‌বে সেই ভাবে বুঝাচ্ছি। একবার

যা বলেছি আবার তাই বল্‌তে হচ্ছে। বাস্তবিক আত্মা কোথাও যাওয়া আসা কর্‌ছেন না, তিনি সচরাচর বিশ্বের সর্ব্বত্রই আকাশের মত অবিচ্ছিন্নাবস্থায় অবস্থান ক'র্‌ছেন। সেই জন্যই শাস্ত্রে তাঁকে অখণ্ড পূর্ণব্রহ্ম বলে। মনে কর এখানে একটা মাটির ঘট আছে, এবং ঘটের মধ্যে আকাশও আছে, সেই আকাশকে ঘটাকাশ বলে। এখন ঐ ঘট্‌টা এখান থেকে তফাতে নিয়ে গিয়ে ভেঙ্গে দেওয়া হ'ল, সুতরাং ঘটমধ্যস্থ আকাশ অর্থাৎ ঘটাকাশ সেইখানে মহাকাশের সঙ্গে মিশে এক হ'য়ে গেল। এখন বল দেখি, যেখান থেকে ঘট্‌টী সরান গেল সেখানকার আকাশ ঘটের অবস্থিতির হেতু কম ছিল কি? অথবা এখন সেখানকার আকাশ কম্‌ল কি? অথবা যেখানে ঘটাকাশ মহাকাশে মিশে এক হ'য়ে গেল সেখানকার মহাকাশ বাড়্‌ল কি? না কম্‌ল, না বাড়্‌ল, যেমন আকাশ তেমনিই আছে। কেবল ঘটরূপ উপাধিটী ছিল ব'লে, এক আকাশেরই দুটী নাম হ'য়েছিল। যখন উপাধি ঘুচে গেল তখন আকাশেরও দুটী নাম ঘুচে গিয়ে এক মহাকাশই নাম রৈল। তেম্‌নি মায়াকল্পিত উপাধিরূপ দেহঘটের নাশ হ'লেই জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক হ'য়ে যান, তখন কেবল পরমাত্মা বলেই কথিত হন্‌। আকাশ যেমন সূক্ষ্মাবস্থায় সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত আছে, পরমাত্মাও তেমনি সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মাবস্থায় অবিচ্ছিন্নভাবে সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত আছেন। তিনি স্থাবর জঙ্গম যাবতীয় পদার্থেই ব্যাপ্ত আছেন। সূর্য্যরশ্মি যেমন বস্তু বিচার না ক'রে সকল পদার্থেই পতিত হয়, পরমাত্মাও তেম্‌নি বস্তু বিচার না ক'রে সচরাচর বিশ্বের সমস্ত পদার্থেই ব্যাপ্ত আছেন। সূর্য্যরশ্মি স্বচ্ছ পদার্থ ভিন্ন তামস অর্থাৎ মলিন কিম্বা স্থূল পদার্থের মধ্যে প্রবেশ কর্‌তে পারে না। পরমাত্মা কিন্তু কি স্বচ্ছ, কি মলিন, কি স্থূল, কি সূক্ষ্ম এই বিশ্বের যাবতীয় পদার্থের অন্তরে বাহিরে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত আছেন। আবার বিশ্বের বাহিরেও

অনন্তরূপে অনন্ত আকাশে ব্যাপ্ত আছেন। আকাশেরও অন্ত নাই তাঁরও অন্ত নাই, তাঁর স্বরূপ অবস্থায় অবস্থিতির নামই আকাশ। ভগবান গীতার ১০ম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে তাই ব'লেছেন যে,

অথবা বহু নৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষটভ্যামহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥

হে অর্জ্জুন। বহু জ্ঞানে অর্থাৎ আমার বিভূতির পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তোমার জান্বার দরকার কি? আমি সমগ্র বিশ্বে আমার একাংশের দ্বারা ব্যাপ্ত হ'য়ে আছি। ভগবদ্বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ কি? ভগবান বল্‌ছেন যে, হে অর্জ্জুন। তুমি যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখ্‌ছ এসব আমার এক অংশে প'ড়ে আছে, এর (বিশ্বের) বাইরে আমি অনন্ত আকাশে ব্যেপে অনন্তরূপে অবস্থিত আছি।

শিষ্য। তা হ'লে পরমাত্মা কি বিশ্বের অর্থাৎ সৃষ্টির বাইরেও আছেন?

গুরু। তা নাই? সৃষ্টি ত তাঁর পাদদেশে প'ড়ে আছে। তাতেই ত শ্রুতি মুক্তকণ্ঠে ব'ল্‌ছেন যে, "পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতা নীতি"। ভগবান অনাদি অনন্ত সুতরাং তাঁর সম্পূর্ণ খবর কারও জানবার উপায় নাই। সেই জন্যই ভগবান গীতায় ব'লেছেন যে, "ন বিদু মে সুরগণা"। এখন তুমি বুঝ্‌লে যে পরমাত্মা অখণ্ডরূপে সমগ্র বিশ্বব্যেপে অবস্থান কর্‌ছেন? এই বিচারকে শাস্ত্রে অবচ্ছেদ্‌বাদ বলে।

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ বুঝ্‌লাম। পরমাত্মা বিশ্বের চেয়ে যে ঢের বড় তাও বুঝ্‌লাম।

গুরু। যেমন বড় বড় গাছে ফল ফুল ধরে, এবং ফল ফুলের তুলনায় গাছ বহু গুণ বড়। আর যখন ফল ফুল ধরে, ফল ফুল উৎপন্ন হওয়া

হেতু, তখন গাছ হ্রাস পায় না, কিম্বা ফল ফুল না থাক্‌লেও গাছ যেমন বৃদ্ধি পায় না। তেমনি পরমাত্মাও সৃষ্ট বিশ্ব অপেক্ষা অনন্ত গুণ বড, এবং সৃষ্টি লয়ের জন্য তিনিও হ্রাস বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন্ না।

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ বুঝ্‌লাম্, কিন্তু পরমাত্মা স্থাবব জঙ্গম অর্থাৎ জড ও চেতন সকল পদার্থেই যে সমানভাবে ব্যাপ্ত আছেন ব'লছেন্, এ কথায় আমাব মনে বিশেষ সংশয় হচ্ছে। জড পদার্থ নিশ্চেষ্ট হ'য়ে এক জায়গায় প'ড়ে থাকে, কিন্তু চেতন পদার্থেব চেষ্টা দেখ্‌তে পাই, তাতেই পরিচয় পাই যে আত্মা তাতে আছেন। আবার যখন তিনি না থাকেন তখন ঐ চেতন পদার্থই চেষ্টাবিহীন জডের ন্যায় প'ডে থাকে। আত্মা যখন স্থাবর জঙ্গম সকল পদার্থেই সমানভাবে ব্যাপ্ত আছেন ব'ল্‌ছেন, তখন এ বৈষম্য দেখা যায় কেন?

গুরু। পরমাত্মার বিচ্ছিন্ন হ'য়ে আসা যাওয়া সম্বন্ধে তোমাকে অবচ্ছেদবাদে বুঝিয়েছি এখন এ প্রশ্নেব উত্তর শোন। তুমি যে স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থকে জড় ও চেতন বলছ, কিন্তু প্রকৃত তা নয়। জগতের যাবতীয় পদার্থই জড়, কেবল একমাত্র আত্মাই চেতন। সমস্ত পদার্থ জড বটে, কিন্তু জড দুই প্রকার। যাকে তুমি চেতন পদার্থ বলছ তা স্বচ্ছ জড়, আর যাকে জড পদার্থ বলছ তা তামস অর্থাৎ মলিন জড। ফলতঃ এই দুই পদার্থেই পরমাত্মা সমানভাবে ব্যাপ্ত আছেন। ঐ যে পাহাড়ী লোকটা পাহাডের উপর গাছ কাট্‌ছে দেখ্‌ছ, ঐ পাহাড়ও যা লোকটাও তাই। যে কুড়ুলে গাছ কাট্‌ছে সেই কুড়ুলখানা যা গাছটাও তাই। পরমাত্মা সকল পদার্থেই ব্যাপ্ত আছেন বটে তত্রাচ বৈষম্য দেখা যাচ্ছে। তাব কাবণ এই যে, যে পদার্থে পবমাত্মার চিদাভাস প্রতিবিম্বের ন্যায় প্রতিফলিত হচ্ছে, তাকে চেতন পদার্থ বলে, এবং যে পদার্থে তা হচ্ছে না তাকেই জড় পদার্থ বলে।

শিষ্য। তা হ'লে কি সকল পদার্থে চিদাভাস সমান পড়ে না?

গুরু। সমান পড়্বে না কেন? যেমন জল কাচাদি স্বচ্ছ পদার্থে প্রতিবিম্ব দেখা যায়, অস্বচ্ছ অর্থাৎ মলিন পদার্থে প্রতিবিম্ব দেখা যায় না। তেম্নি স্বচ্ছ জড় পদার্থে চিদাভাস প্রতিবিম্বের ন্যায় দেখা যায় নড়াচড়া, চলাফেরা ইত্যাদি হচ্ছে প্রতিবিম্বের লক্ষণ। আর তামস অর্থাৎ মলিন জড়ে চিদাভাস প্রতিবিম্বের ন্যায় দেখা যায় না।

শিষ্য। তার কারণ কি?

গুরু। তার কারণ, সত্ত্বাত্মিকা বুদ্ধি হচ্ছে স্বচ্ছ পদার্থ। এ জগতের যাবতীয় জঙ্গম পদার্থের সূক্ষ্ম শরীরকে আশ্রয় ক'রে, সেই বুদ্ধি আছে, এবং স্বচ্ছ জড়ে বুদ্ধি আছে ব'লেই চিদাভাস প্রতিবিম্বের ন্যায় দেখা যায় এবং সেই সকল পদার্থকে চেতন পদার্থ বলে। কেবল সত্ত্বাত্মিকা বুদ্ধি-সমন্বিত হওয়া না হওয়ার দরুণ পদার্থ সব চেতন ও জড় সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হচ্ছে। তাতে চিদাভাসের ন্যূনাধিক্য হচ্ছে না। যেমন বহু কলসীতে জল পূর্ণ ক'রে দেখ সকল কলসীতেই সূর্য্যের প্রতিবিম্ব দেখা যাবে, কিন্তু কলসীগুলি জলশূন্য হ'লে আর সে প্রতিবিম্ব দেখা যাবে না। কাচে পারা লাগান থাক্‌লেই মুখ দেখা যায়, নইলে দেখা যায় না। তেম্নি সত্ত্বাত্মিকা বুদ্ধিবিশিষ্ট স্বচ্ছ জড় পদার্থ অর্থাৎ চেতন পদার্থে চিদাভাস প্রতিবিম্বের ন্যায় দেখা যায়। সত্ত্বাত্মিকা বুদ্ধিবিহীন মলিন অর্থাৎ জড় পদার্থে চিদাভাস প্রতিবিম্বের ন্যায় দেখা যায় না। শাস্ত্রে এই বিচারকে আভাসবাদ বলে।

শিষ্য। আভাসবাদ বোঝালেন বটে, কিন্তু আমার মনের সংশয় কিছুতেই যাচ্ছে না। কারণ, স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি যে, প্রাণীরা চ'লে ফিরে বেড়াচ্ছে, ইচ্ছামত কাজকর্ম্ম করছে, এবং আহার বিহারাদি সবই করছে। আর পাথরখানা নিশ্চেষ্টভাবে এক জায়গাতেই প'ড়ে

আছে, যা মারলেও নড়ে না। এরূপ স্থলে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী দুই পদার্থকে এক কি ক'রে বলতে পারি?

গুরু। শাস্ত্রে এই বিশ্ব-সংসারকে স্বপ্নের বিকারমাত্র ব'লছে, ভগবান শঙ্করাচার্য্যও ব'লেছেন যে, "বিশ্বং ত্যক্ত্বা স্বপ্ন বিকারম্"। তখন চেতন পদার্থের যা কিছু চেষ্টাদি দেখতে পাচ্ছ তা স্বপ্নবৎ মিথ্যা। যেমন স্বপ্নে লোকে কত স্থানে যায়, কত জিনিস দেখে, কত কাজ করে, কিন্তু লোক যেখানকার সেইখানেই নিশ্চেষ্টভাবে ঘুমিয়ে প'ড়ে থাকে। লোকে যেমন কোথাও না গিয়ে কিছু না ক'রে, নিশ্চেষ্টভাবে প'ড়ে থেকেও স্বপ্নেতে সব কাজ করে, এবং তৎকালে তা সত্য ব'লেই প্রতীয়মান হয়। তেমনি সংসারের ভূতগণের যাবতীয় ব্যাপার স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের ন্যায় সম্পন্ন হচ্ছে, এবং জীবগণের নিকট তা সব সত্য ব'লেই প্রতীয়মান হচ্ছে।

শিষ্য। আমরা সংসারে যা ক'রছি, তা সব জ্ঞানের সহিতই ক'রছি, কাজেই সে সব সত্য ব'লে বোধ হচ্ছে। যদি সংসার স্বপ্নেরই বিকার হয়, তা হ'লে ঐ সব মিথ্যা ব'লে বোধ হয় না কেন?

গুরু। যে লোক যখন স্বপ্ন দেখে তখন কি আর তার সেই সব স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় মিথ্যা ব'লে মনে হয়? তখন তার সে সব বিষয় সত্য বলেই মনে হয়, কিন্তু ঘুম ভাঙ্গলে তখন আর সেগুলি সত্য ব'লে বোধ হয় না, মিথ্যা ব'লেই ধারণা হয়।

শিষ্য। স্বপ্ন ঘুমিয়ে দেখা যায়, সুতরাং তা মিথ্যা ব'লে বোধ হ'তে পারে। এ যে জাগ্রতাবস্থায় সব করছি, কাজেই এসবকে মিথ্যা বলি কি করে? আর যদি প্রকৃতই মিথ্যা হয়, তা হ'লে সেই মিথ্যাকে সত্য ব'লে ধারণা হওয়ার কারণ কি?

গুরু। ভ্রান্তি হচ্ছে এর কারণ। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম।

শিষ্য। এ যে বড় বিষম ভ্রম দেখ্‌ছি। লোকের এ ভ্রম যায় না কেন ?

গুরু। দড়ীকে সাপের মত দেখে যার মনে দৃঢ় ধারণা হয় যে এটা সাপই, তার ভ্রম যেতে পারে না। কেন না, সে সাপের সত্যতা সম্বন্ধে ত কোন অনুসন্ধান করবে না, এটা সাপ এই বিশ্বাসেই থাক্‌বে। দড়ীকে সাপ ব'লে মিথ্যা ধারণা মনে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে, লোকের যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম যায় না। তেমনি এই মিথ্যা জগৎকে সত্য ব'লে দৃঢ় ধারণা হওয়াতে লোকের মনে থেকে এ ভ্রমও যায় না। কারণ, সত্য মিথ্যার অনুসন্ধান ত লোকে কিছু করবে না, এসব সত্য ব'লেই সংসারে ম'জে থাক্‌বে। ভ্রমই লোককে সংসাররূপ সমুদ্রে ডুবাবার কুমীর স্বরূপ। এই ভ্রম যাকে ধরে তার আর সহজে উপরে উঠ্‌বার সাধ্য নাই। এই যে মিথ্যাকে সত্য ব'লে প্রতীয়মান হচ্ছে, এই বিচারকে শাস্ত্রে অধ্যাসবাদ বলে।

শিষ্য। রজ্জুতে সর্পভ্রম হ'লে ঢিল মেরে কি খোঁচা মেরে তার না হয় অনুসন্ধান করা যায়, কিন্তু জগতের সত্য মিথ্যা সম্বন্ধে কি ক'রে অনুসন্ধান করা যায় ?

গুরু। তবে তোমাকে সেদিন বললাম কি ? চিত্তশুদ্ধি ক'রে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করলে, তখন এই ভ্রম দূর হয়, সুতরাং এই জগতকে মিথ্যা ব'লে বোধ হয়। নচেৎ এ ভ্রম দূর হবার আর অন্য উপায় নাই।

শিষ্য। আপনি যে বলছেন চিত্তশুদ্ধির দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হ'লে তখন ভ্রম দূর হয়। এখন কি উপায়ে কোথেকে সেই জ্ঞান পাওয়া যায় তাই আমাকে বলুন।

গুরু। আত্মজ্ঞান বাইরে থেকে আসে না নিজের কাছেই আছে। তবে ভ্রম অর্থাৎ অজ্ঞানে আবৃত আছে। সাধনার দ্বারা সেই ভ্রম বা অজ্ঞান দূর করতে পারলেই, তখন আত্মজ্ঞান বেরিয়ে পড়ে। আত্মজ্ঞান

লাভ হ'লে তখন আর মুহ্যমান হ'য়ে সংসারে আবদ্ধ থাক্‌তে হয় না। সেইজন্য শঙ্করাচার্য্য ব'লেছেন যে, "জ্ঞাতে তত্ত্বে কঃ সংসারঃ"। এই আত্ম-জ্ঞানকেই তত্ত্বজ্ঞান ও অদ্বৈতজ্ঞানও বলে। যাঁর অদ্বৈতজ্ঞান লাভ হয়, তিনি এই বিশ্বকে ব্রহ্মের সঙ্গে অভেদ দেখেন, এবং নিজেকেও ব্রহ্মের সঙ্গে অভেদ জ্ঞান করেন।

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ এখন আমি বুঝলাম। আচ্ছা, পঞ্জাবের স্ত্রী পুরুষ অধিকাংশ লোকেই, ব্রহ্মের সঙ্গে তাদেরকে অভেদ ভাবে। তাহ'লে সেই সব লোকের কি তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়েছে?

গুরু। তত্ত্বজ্ঞান সুদুর্লভ। এই জ্ঞানটী হচ্ছে জ্ঞানের চরম সীমা, এবং এই অদ্বৈতজ্ঞানই জীবনের চরম উৎকর্ষ। এর পর জানবার আর কিছুই থাকে না, এবং ভবযন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে পরমানন্দের স্বরূপ হ'য়ে যাওয়া যায়। দুঃখের লেশমাত্রও থাকে না। সাধারণ লোকের যদি এ জ্ঞান লাভ হয় তা হ'লে আর ভাবনা কি? বেদান্ত প'ড়ে অথবা শুনে মুখে ব্রহ্মা ব'ল্লে ত আর ব্রহ্ম হয় না, ব্রহ্মের ভাব অর্থাৎ অবস্থা হওয়া চাই। সে অবস্থা লাভ না ক'রে যারা মুখে ব্রহ্ম বলে তারা বাক্-যন্ত্র বিশেষ। প্রকৃত যাঁর আপনাকে ব্রহ্ম বলে জ্ঞান হয়, অহং ব্রহ্মোস্মি এ কথা তিনি আর তখন মুখে ব'ল্‌তে পারেন না। কেননা, যিনি নিজেকে ব্রহ্মের সঙ্গে তুলনা করবেন তাঁরই দ্বৈতভাব আছে। মনে অদ্বৈতভাব প্রতিষ্ঠিত হ'লে, মুখে দ্বৈতভাবের কথা আর আসে না। যাঁদের তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, তাঁরা জগতকে পরমাত্মারই রূপ অর্থাৎ সবই বাসুদেব দর্শন করেন।

শিষ্য। তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষেরা কি ভাবে এই জগতকে বাসুদেব দর্শন করেন?

গুরু। সোনাতে বহু রকম অলঙ্কার হয়। যদিও অলঙ্কার সব

বিভিন্ন গড়নের হয় বটে, কিন্তু ঐ সব অলঙ্কার দেখ্‌লে মনে সোনা ব'লেই জ্ঞান হয়, মনে হয় এসব সোনারই গড়ন। তেম্‌নি তত্ত্বজ্ঞানী মহাত্মারা এ জগতে যা কিছু দেখেন, সমস্ত ব্রহ্মের রূপ দেখেন অর্থাৎ ব্রহ্মই এসব হয়েছেন। অদ্বৈতজ্ঞান কি সহজে লাভ হয়? সাধারণ লোকের অদ্বৈতজ্ঞান লাভের কোন সম্ভাবনা নাই।

শিষ্য। সাধারণ লোকের তত্ত্বজ্ঞান লাভের সম্ভাবনা নাই কেন?

গুরু। সাধন চতুষ্টয় ভিন্ন অদ্বৈতজ্ঞান লাভে অধিকার হয় না।

শিষ্য। সাধন চতুষ্টয় কাকে বলে এবং কি রকম ভাবে ক'র্‌তে হয় অনুগ্রহ ক'রে আমাকে বলুন।

গুরু। নিত্যানিত্য বস্তু বিবেকঃ ইহামুত্রার্থ ফলভোগ বিরাগঃ শমাদি ষট্ সম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব চেতি। এ জগতে নিত্য (অবিনাশী) ও অনিত্য (নাশশীল) বস্তুর পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান, অর্থাৎ এই দুটী সম্পূর্ণরূপে অনুভবে আসা। এইটী প্রথম সাধন। ইহলোক এবং পরলোকে ভোগের আকাঙ্ক্ষা একেবারে ত্যাগ করা, এইটী দ্বিতীয় সাধন। শম, দম, উপরম, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান এই ছয়টীর নাম ষট্ সম্পত্তি, এইটী তৃতীয় সাধন। আমি মুক্ত হব অর্থাৎ জন্ম মৃত্যুর যন্ত্রণা থেকে ছুটব, এই রকম তীব্র আকাঙ্ক্ষা মনে রাখা, এইটী চতুর্থ সাধন। এই চারিটী সাধনায় সিদ্ধ হ'লে অর্থাৎ মনে ঐ সব ভাবগুলি দৃঢ় ধারণা হ'লে, তখন গা তত্ত্ব-জ্ঞান লাভের অধিকার হয়। সেই জন্যই শাস্ত্রে বল্‌ছে যে,

এতৎ সাধন চতুষ্টয়ম্
ততস্তত্ত্ব বিবেকস্যাধিকারিণো ভবন্তি।

এই সাধন চতুষ্টয় সাধনা ক'র্‌লে, তখন লোকে তত্ত্বজ্ঞান লাভের অধিকারী হয়।

শিষ্য। আপনি যে ষট্ সম্পত্তির উল্লেখ ক'রলেন তার মানে ত কিছু বুঝ্‌লাম না।

গুরু। আচ্ছা শোন। শম, মনকে নিগ্রহ করা, অর্থাৎ বিষয়গামী মনকে বিষয়ে না লাগ্‌তে দিয়ে আপন বসে রাখা। দম, বহিরিন্দ্রিয়গণকে নিগ্রহ করা, ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়ের সঙ্গে সংযোগ হ'তে না দিয়ে দমন ক'রে রাখা। উপরম, ঔদাসিন্য অবলম্বন করা অর্থাৎ সংসারে সকল বিষয়ে অনাসক্ত হওয়া। তিতিক্ষা, সহ্যগুণ অর্থাৎ শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখাদি উপস্থিত হলেও সে সব সহ্য ক'রে মনকে অবিচলিত রাখা। শ্রদ্ধা, রুচির সহিত বিশ্বাস, গুরু ও শাস্ত্র বাক্যে রুচির সহিত বিশ্বাস। সমাধান, চিত্তের একাগ্রতা অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত চিত্তকে একাগ্র ক'রে ধ্যানাদি করা।

শিষ্য। এই ছয়টাকে সম্পত্তি বলে কেন?

গুরু। কেন ব'ল্‌বে না? সম্পত্তি না হ'লে কেও কখন বড়লোক হ'তে পারে? এই ছয়টা সিদ্ধ হ'লে তখন বড়লোক হওয়া যায়, অর্থাৎ আত্মজ্ঞানরূপ অমূল্য ধনের অধিকারী হওয়া যায় এবং পরমানন্দরূপ সুখ ভোগ হয়। সেইজন্য এই ছয়টাকে সম্পত্তি বলে।

শিষ্য। তত্ত্বজ্ঞান যে কি ক'রে লাভ হয় তা আমি এক রকম বুঝ্‌লাম, কিন্তু আপনি অধ্যাসবাদে বল্‌লেন যে ভ্রমই সংসারের অস্থি স্বরূপ, ভ্রম দূর হ'লেই সংসারকে স্বপ্ন ব'লে বোধ হয়। আমি এখন এই ভাব্‌ছি যে এই মায়াত্মক ভ্রমের কারণ কি এবং এই ভ্রম আসেই বা কোথেকে?

গুরু। এই ভ্রমের কারণ হচ্ছে মায়া, শাস্ত্রে একে বস্তুশক্তিও বলে। ভগবান এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থের মধ্যেই সেই মায়া বা বস্তুশক্তি অন্তর্নিহিত ক'রে রেখেছেন। যেমন একখণ্ড সমান হিরা, কিছু উঁচু ও উজ্জ্বল দেখায়। এই উঁচু বা উজ্জ্বল দেখাবার কারণ যে মায়া বা

বস্তুশক্তি তা হিরার মধ্যেই নিহিত আছে। বেলওয়ারি ঝাড়েব কলসের মধ্যে দিয়ে দেখ্‌লে নানা রকম বং দেখায়। সেই নানা রকম দেখাবার কারণ মায়া বা বস্তুশক্তি ঐ কলসেব মধ্যেই নিহিত আছে। এখন বুঝ্‌লে যে কি রকমে ভ্রম উৎপন্ন হয়? এই বিচারকে শাস্ত্রে মায়াবাদ বলে। এই মায়াবাদ শাস্ত্রের একটা প্রধান আলোচ্য বিষয়। মায়ার প্রভাব বড়ই কঠিন ও অপ্রতিহত।

শিষ্য। অনুগ্রহ ক'রে এই মায়াব প্রভাব একটু বিস্তারিতভাবে বলুন শু'নতে আমাব বড় কৌতূহল হচ্ছে।

গুরু। এই মায়ার প্রভাবেই সচরাচর বিশ্বব্যাপী অবিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত শুভ্র স্ফাটিকবৎ নির্ম্মল অতি বিশুদ্ধ একমাত্র পরমাত্মা আমাদের অদর্শনীয় হ'য়ে আছেন। মায়াতে আমাদের দৃষ্টি আবৃত হ'য়ে রয়েছে ব'লে আমরা তাঁকে দেখ্‌তে পাই না। যেমন দিনের বেলায় নক্ষত্র দেখা যায় না। বাস্তবিক নক্ষত্র কোথাও চ'লে যায় কি? তাত নয়, নক্ষত্র আকাশের যথাস্থানেই আছে, কেবল সূর্য্যরশ্মি আমাদের দৃষ্টি আবরণ ক'রে রেখেছে ব'লে আমরা নক্ষত্র দেখ্‌তে পাই না। সূর্য্য অস্ত গেলেই দেখা যায়। এমন কি সূর্য্য গ্রহণে সর্ব্বগ্রাস হ'লে দিনের বেলাতেই নক্ষত্র দেখ্‌তে পাওয়া যায়। তেমনি মায়ারূপ রশ্মি অন্তর্হিত হ'লে তবে ভগবানকে দর্শন হয়। তাব মানে যিনি মায়া নির্ম্মুক্ত হয়েছেন তিনিই ঈশ্বর দর্শনে সমর্থ অন্যে নয়।

শিষ্য। তা'হলে এই কষ্টদায়িকা মায়াই আমাদের ঘোর শত্রু দেখ্‌ছি। ভগবান এমন অনিষ্টকারিণী মায়াকে সৃষ্টি কর্‌লেন কেন?

গুরু। মায়া না হ'লে পরমাত্মার এই বিশ্বলীলা, অর্থাৎ সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়রূপ লীলা খেলাই হয় না। খেলা কি কখন একলা হয়? খেল্‌তে গেলেই জুড়ীদার চাই। পরমাত্মা যখন এই বিশ্বখেলা খেল্‌তে ইচ্ছা

করেন, তখন তিনি তাঁর প্রকৃতি বা মায়াকে আলাদা ক'রে দিয়ে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে সব খেলা খেলেন। মায়া আবার এমনি করিতকর্ম্মা যে, একলাই গাছের পাড়েন এবং তলায় কু'ড়োন্।

শিষ্য। মায়া গাছের পাড়েন তলায় কুড়োন্ কি রকম?

গুরু। এই যে পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদি সব দেখ্‌তে পাচ্ছ, মহাপ্রলয় হ'লে এসব কিছুই থাকে না। এই সমগ্র বিশ্বের যাবতীয় স্থূল পদার্থ সূক্ষ্মাবস্থা প্রাপ্ত হ'য়ে মায়া বা প্রকৃতিতে লীন হয়। তখন প্রকৃতি পরমাত্মাতে লীন হন। সে সময়ে আর কিছুই থাকে না, থাকে কেবল অনন্ত আকাশ আর অনন্ত আকাশব্যাপী অনাদি অনন্ত পরমাত্মা এরূপভাবে যে কত যুগযুগান্তর কেটে যায় তার ঠিক কি? তারপর আবার যখন পরমাত্মার সৃষ্টাদি লীলা কর্‌বার ইচ্ছা হয়, তখন তিনি তাঁর প্রকৃতি বা মায়াকে ছেড়ে দেন। সেই প্রকৃতি জগৎপ্রপঞ্চ রচনা করেন, এবং সচরাচর বিশ্বের যাবতীয় জীবকে মুগ্ধ ক'রে রাখেন, ঠিক যেন ভেল্‌কি লাগান। তাতেই বলেছি যে মায়া গাছের পাড়েন ও তলায় কু'ড়োন্।

শিষ্য। মায়া সচরাচর বিশ্বের যাবতীয় প্রাণীকে ভেল্‌কী লাগান পরমাত্মাও ত বিশ্বের মধ্যে আছেন, তা'হলে তাঁকেও কি ভেল্‌কী লাগান?

গুরু। না পরমাত্মাকে ভেল্‌কী লাগাতে পারেন না। বাজীকর যেমন খেলা দেখাবার সময় সমস্ত দর্শকমণ্ডলীকে ভেল্‌কী লাগিয়ে মিছামিছি কত জিনিস দেখায়, কিন্তু সে নিজে সে সব কিছু দেখে না, সে কেবল তার হাতের কাঠিটাই দেখে। বাজীকরের আয়ত্তাধীন ভোজ-বিদ্যা যেমন দর্শককে ভেল্‌কা লাগিয়ে মুগ্ধ করে, কিন্তু বাজীকরকে মুগ্ধ করতে পারে না। তেম্‌নি পরমাত্মার আয়ত্তাধীন মায়াও সচরাচর বিশ্বকে মুগ্ধ করেন কিন্তু পরমাত্মাকে মুগ্ধ কর্‌তে পারেন না।

শিষ্য। আপনার এই কথাটা শুনে আমার সংশয় হচ্ছে। মায়ার ধর্ম্মই হ'ল মুগ্ধ করা, পরমাত্মার বেলায় তিনি সে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করবেন?

গুরু। বিষাক্ত লতা যে গাছকে আশ্রয় ক'রে জড়িয়ে থাকে সে গাছের কিছু হয় না, কিন্তু অন্যের প্রাণঘাতিকা। সদ্য প্রাণনাশক হলাহল মুখের মধ্যে ধারণ করেও সাপের কিছু হয় না কিন্তু অন্যের যমস্বরূপ। তেমনি মায়া ভগবানকে সতত আশ্রয় করে থাকলেও তাঁর কিছু হয় না। ভগবান তার মায়া বা প্রকৃতির দ্বারাই এই বিশ্বলীলার সব কাজ অর্থাৎ সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় করাচ্ছেন, এবং স্বয়ং প্রকৃতির আশ্রয় স্বরূপ পুরুষরূপে নির্লিপ্তভাবে উদাসীনের ন্যায় অবস্থান করছেন। এই প্রকৃতি পুরুষ সংযোগে বিশ্বলীলা সম্পন্ন হচ্ছে। সেই কথা ভগবান গীতার ১৪শ অধ্যায়ের ৩য় ও ৪র্থ শ্লোকে ব'লছেন যে,

মম যোনির্ম্মহদ্‌ব্রহ্মতস্মিন গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥
সর্ব্ব যোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্ যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥

হে ভারত। মহৎ প্রকৃতি এই বিশ্বের গর্ভাধান স্থান। আমি তাঁতে সমগ্র জগতের বীজ নিক্ষেপ ক'রে থাকি তাতেই যাবতীয় ভূতগণ উৎপন্ন হয়। হে কৌন্তেয়। স্থাবর জঙ্গমাত্মক যাবতীয় যোনীতে যে সকল মূর্ত্তি সম্ভূত হয়, মহৎ প্রকৃতি সেই সমস্ত ভূতগণের যোনী অর্থাৎ মাতৃস্থানীয়া, এবং আমি বীজপ্রদ পিতা।

শিষ্য। অনুগ্রহ ক'রে প্রকৃতি এবং তাঁর সৃষ্টি কৌশল সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব আমাকে বুঝিয়ে দিন।

গুরু। সৃষ্টি সম্বন্ধে সাংখ্য শাস্ত্রের মত তোমাকে বলি শোন। সাংখ্য শাস্ত্র এই বিশ্ব সৃষ্টিকে চব্বিশ গণ বা তত্ত্বে বিভক্ত ক'রেছেন, এবং সেই চব্বিশ তত্ত্বের উপরে পুরুষ অর্থাৎ আত্মাকে রেখেছেন। বিভাগ প্রণালী এই রকম যথা, ১। প্রকৃতি, ২। মহৎ (বুদ্ধি) ৩। অহংকার, ৪। মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ তন্মাত্রা (রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ), এবং পঞ্চ মহাভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্) এই চব্বিশটী তত্ত্ব সৃষ্টির উপাদান স্বরূপ। এই চব্বিশটী তত্ত্ব পরস্পর হ'তে উৎপন্ন হ'য়েছে, তার তাৎপর্য্যার্থ এই যে পুরুষ হ'তে প্রকৃতি, প্রকৃতি হ'তে মহৎ মহৎ হ'তে অহংকার, অহংকার হ'তে মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ তন্মাত্রা, পঞ্চ তন্মাত্রা হ'তে ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূত। এই সৃষ্টি তত্ত্বের সোজা মানে এই যে, প্রকৃতি স্বয়ংই পর্য্যায় ক্রমে তত্ত্বগুলিতে পরিণত হ'য়েছেন। যেমন দই মাখন, মওয়া, ছানা, ক্ষীর ইত্যাদি এক দুধ থেকেই উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ দুধই নিজে সেই গুলিতে পরিণত হয়। তত্ত্বগুলি প্রকৃতি থেকে সেইভাবে হ'য়েছে। প্রকৃতিদেবী এই দলবলের দ্বারা এই জগৎ রচনা ক'রেছেন, এবং জগতস্থ সমস্ত প্রাণীদের জীবনের যাবতীয় কাজ নির্ব্বাহের জন্য প্রাণী-দের শরীরের মধ্যে অন্নময়াদি পাঁচটী কোষ বা বিভাগ স্থাপন ক'রে-ছেন। প্রাণীদের জীবনের প্রত্যেক কাজই ঐ পাঁচটী কোষ বা বিভাগ ঘু'রে এসে তবে সম্পন্ন হয়। কোন বিষয় যদি কোন একটী কোষ বা বিভাগে বাদ পড়ে, তাহ'লে সেই বিষয়টী কখনই কার্য্যে পরিণত হ'তে পারে না।

শিষ্য। আমি দেখ্‌ছি প্রকৃতিই সব ক'রছেন, তা'হলে পুরুষ (আত্মা) যে সকলের উপরে আছেন তিনি কি করেন?

গুরু। প্রকৃতির আশ্রয় এবং সর্ব্বময় কর্ত্তা যে পুরুষ (আত্মা)

প্রকৃতিকে বিশ্ব কর্ম্মে নিয়োগ ক'রে স্বয়ং নির্লিপ্তভাবে উদাসীনবৎ অবস্থান কর্‌ছেন এবং তিনি আছেন ব'লেই প্রাকৃতিক কাজ সব চ'লে থা'ক। ভগবান গীতার ৯ম্ অধ্যায়ের ৮ম্ শ্লোকে ব'লেছেন যে,

প্রকৃত স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রাম মিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥

আমি মদধীন প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হ'য়ে, অবিদ্যাপরবশ ভূতগণকে বারম্বার সৃষ্টি ক'রে থাকি। এই সৃষ্টাদি কার্য্য তাঁরই কর্ত্তৃত্বাধীনে হচ্ছে, কিন্তু তিনি উদাসীনবৎ থাকায় অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাভিমান না থাকার জন্য তিনি যে কর্ম্মে (কর্ম্মফলে) আবদ্ধ হন না তা পরের শ্লোকে অর্থাৎ ৯ম্ শ্লোকে ব'ল্‌ছেন যে,

নচ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীন বদাসীন মসক্তং তেষু কর্ম্মসু ॥

হে ধনঞ্জয়। আমি এই সৃষ্টাদি কার্য্যে অনাসক্ত ব'লে উদাসীনবৎ থাকি, সেইজন্য এই সকল কর্ম্মে (কর্ম্মফল) আবদ্ধ ক'র্‌তে পারে না। আর তিনিই যে সর্ব্বময় কর্ত্তা, এবং তাঁর অধিষ্ঠান হেতুই প্রকৃতি যে সব কর্‌তে সমর্থ। তাও তার পরের শ্লোকে অর্থাৎ ১০ম শ্লোকে বলেছেন যে,

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতি সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥

হে কৌন্তেয়। প্রকৃতি আমার অধিষ্ঠান লাভ ক'রেই, এই সচরাচর বিশ্ব সৃষ্টি কর্‌ছেন; এবং আমার অধিষ্ঠান হেতুই ইহা (জগৎ) পুনঃ

পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে। এখন বুঝ্‌তে পার্‌লে যে প্রকৃতি কেন এবং কি রকমে বিশ্ব রচনা এবং বিশ্বের যাবতীয় কাজ নির্ব্বাহ ক'র্‌ছেন?

শিষ্য। সৃষ্টি প্রকৃতির দ্বারায় কি রকম ভাবে হ'চ্ছে এবং কেন যে হ'চ্ছে তা আমি এক রকম বুঝ্‌লাম, কিন্তু প্রকৃতি অন্নময়াদি কোষ বা বিভাগ দ্বারা কি রকম ভাবে জীবের জীবনের সমস্ত কাজ নির্ব্বাহ কর্‌ছেন সেইটা শু'নতে ইচ্ছা করি।

গুরু। প্রাণীদের জীবনের যাবতীয় কাজ সম্পাদন কর্‌বার জন্য প্রকৃতি কর্ত্তৃক ভূতগণের দেহে পাঁচটী কোষ বা বিভাগ স্থাপিত হ'য়েছে। তাদের নাম যথা,—অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষ। এই সব কোষ বা বিভাগগুলি কার্য্য-সূত্রে পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট। এখন এক একটী কোষ বা বিভাগের কাজ শোন। অন্নময় কোষ অন্নরসে উৎপত্তি, অন্নরসে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত করা এবং শেষে অন্নরসেতেই লীন করা, অর্থাৎ এই স্থূলদেহ পৃথিবীর রসে উৎপন্ন হয়, পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হয়, এবং শেষে পৃথিবীতেই লীন হয়। এই স্থূলদেহটী প্রাকৃতিক কার্য্যনির্ব্বাহের আফিস ঘর স্বরূপ। স্থূলদেহের উৎপত্তি করা, পরিপুষ্ট করা এবং নাশ হ'লে পৃথিবীতে মিলিয়ে দেওয়া, এই অন্নময় কোষ বিভাগের কাজ। প্রাণময় কোষ, প্রাণাদি পঞ্চ প্রাণ ও বাগিন্দ্রিয়াদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় কার্য্যসূত্রে যে একত্র হয় তার নাম প্রাণময় কোষ। মনে যত কিছু সংকল্প বিকল্প উৎপন্ন করা এই প্রাণময় কোষ বিভাগের কাজ। মনোময় কোষ, মন এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় কার্য্যসূত্রে যে একত্র হয় তার নাম মনোময় কোষ। প্রাণময় কোষ থেকে যে সব সংকল্প উঠে তদনুসারে আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন করা, অর্থাৎ ইচ্ছা ও আসক্তি জন্মান এই মনোময় কোষ বিভাগের কাজ। বিজ্ঞানময় কোষ, বুদ্ধি ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় কার্য্যসূত্রে যে একত্র

হয়, তার নাম বিজ্ঞানময় কোষ। মনোময় কোষ থেকে যে বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়, সেই ঈপ্সিত বিষয়ের বস্তুজ্ঞান জন্মান, এই বিজ্ঞানময় কোষ বিভাগের কাজ। আনন্দময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ থেকে অভীষ্ট বস্তুর যে জ্ঞান জন্মায়, তদনুসারে সেই ঈপ্সিত পদার্থ প্রাপ্ত হ'লে পর তা দেখে কি উপভোগ ক'রে আনন্দ উৎপন্ন করা, এই আনন্দময় কোষ বিভাগের কাজ এখন বিচার ক'রে দেখ যে জীবের জীবনের যাবতীয় কাজ এই পাঁচটী কোষ বা বিভাগ দু'বে তবে সম্পন্ন হচ্ছে। প্রকৃতি দেবীর কার্য্যপ্রণালী কেমন সুশৃঙ্খলাবদ্ধ দেখ। গবর্ণমেণ্টের অফিস কোথায় লাগে।

শিষ্য। আপনি যে ব'ললেন, জগতের সমস্ত পদার্থই জড় কেবল একমাত্র পরমাত্মাই চেতন। আচ্ছা, তাহ'লে এই মায়া বা প্রকৃতি জড় না চেতন?

গুরু। সাধারণতঃ প্রকৃতিকে জড়ই বলে, কিন্তু বিচার ক'রে দেখ্‌লে গোলযোগ উপস্থিত হয়। প্রকৃতি সৎ নন, বাহ্যিক নাশ আছে, অর্থাৎ বিশ্বের কার্য্য থেকে অন্তর্হিতা হন। আবার অসৎও ব'লতে পারা যায় না, কেননা প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির নাশ হয় না, তিনি পরমাত্মায় লীন হ'য়ে তাতেই অবস্থান করেন। মায়া বা প্রকৃতি পরমাত্মারই শক্তি। এখন শক্তিকে শক্তিমান থেকে কি আলাদা করতে পারা যায়? যতদিন শক্তিমান থাকে ততদিন শক্তিরও অস্তিত্ব থাকে। মায়া, প্রকৃতি, শক্তি যাই কেন বলনা তিনি পরমাত্মাতেই মিশে থাকেন। পরমাত্মার যতদিন অস্তিত্ব আছে, মায়া বা প্রকৃতিরও ততদিন অস্তিত্ব আছে। কেননা, প্রকৃতি পরমাত্মারই অঙ্গীভূত, সুতরাং পরমাত্মা যা প্রকৃতিও তাই, কাজেই সূক্ষ্ম অথবা স্থূল এ দুটীর একটীও নন। ভগবানও এই প্রকৃতি সম্বন্ধে গীতার ৭ম অধ্যায়ের ৫ম শ্লোকে ব'লেছেন যে,

অপরেয় মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥

হে মহাবাহো! এই যে অষ্টধা প্রকৃতি (পূর্ব্ব শ্লোক কথিত) অপরা অর্থাৎ নিকৃষ্টা। এ ছাড়া আমার আরও একটী পরা অর্থাৎ উৎকৃষ্টা চেতনময়ী প্রকৃতি আছেন, তিনিই এই জগৎ ধারণ ক'রে রেখেছেন, অর্থাৎ এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয় তাঁর দ্বারা সম্পন্ন হচ্ছে।

শিষ্য। আমার মনে একটী সংশয় হচ্চে। জগতে সূক্ষ্ম ও স্থূল এই দুই রকম পদার্থ আছে। আপনি বল্ছেন প্রকৃতি এ দুটীর একটীও নন, তবে তিনি কি?

গুরু। প্রকৃতি পরমাত্মারই অঙ্গীভূত, পরমাত্মা যখন সূক্ষ্ম অথবা স্থূল এ দুটীর একটীও নন, তখন প্রকৃতি সূক্ষ্ম অথবা স্থূল কি ক'রে হ'তে পারেন? পরমাত্মা যে কেমন, ভগবান্ তা গীতার ১৩শ অধ্যায়ের ১২শ শ্লোকে ব'লেছেন যে

জ্ঞেয়ং যৎতৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্ জ্ঞাত্বাঽমৃত মশ্নুতে।
অনাদি মৎপরং ব্রহ্ম ন সৎতন্না সদুচ্যতে ॥

হে অর্জ্জুন! এখন জ্ঞেয় বলি শোন। যা জান্লে লোকে মোক্ষলাভ করে। অনাদি ও নির্ব্বিশেষ স্বরূপ ব্রহ্মই জ্ঞেয়, তিনি সৎও নন অসৎও নন অর্থাৎ সূক্ষ্মও নন কিম্বা স্থূলও নন। এখন ভেবে দেখ প্রকৃতি পুরুষ দুইই এক। পুরুষই প্রকৃতি ব'লে কথিত হন। সৃষ্টাদি লীলার জন্য যখন প্রয়োজন হয়, তখন ভগবান স্বীয় তেজ প্রভাবে স্বয়ংই স্বতন্ত্ররূপে প্রকৃতি নামে প্রকট হন, এবং ত্রিগুণাত্মিকা মায়া অর্থাৎ কার্য্যকারিণী

শক্তিবিশিষ্ট হন। তার মানে পরমাত্মাই স্বয়ং মায়া। শক্তি প্রকাশ অবস্থায় প্রকৃতি ব'লে কথিত হন। পূজাপাদ শ্রীধর স্বামী ব লেছেন যে,

পুং প্রকৃত্যো স্বতন্ত্রত্বং
বারয়ণ গুণ সঙ্গতঃ।

প্রকৃতি স্বতন্ত্র বস্তু নয়। পুরুষ গুণসংযুক্ত (প্রকাশ) হলেই তখন তাঁকে প্রকৃতি বলে। আর নিগুর্ণ অর্থাৎ গুণ অপ্রকাশ অবস্থায় তাঁকে পুরুষ বলে।

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ, এখন আমি বুঝ্‌লাম যে প্রকৃতিকে পরমাত্মা থেকে পৃথক্ করার যো নাই। এখন সংসারী জীব মায়ামুগ্ধ হ'য়ে কি রকম দশাগ্রস্ত হয়েছে, এবং তাদের উপায় ও কর্ত্তব্যই বা কি সে সম্বন্ধে কিছু শুন্‌তে ইচ্ছা করি।

গুরু। আচ্ছা, আজ থাক্ আবার কাল হবে।

সপ্তম দিন।

শিষ্য। কা'ল যে আমার প্রশ্ন আছে সেই বিষয়টী আজ বলুন।

গুরু। আচ্ছা শোন, বিষ্ণু কি ক'রে প্রভবিষ্ণু হয়েছেন, এবং অদ্বৈতভাব কি ক'রে দ্বৈতভাবে পরিণত হ'য়েছে। ঈশ্বর বিশ্বরাজ্যের অধিপতি এবং সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা ও সংহারকর্ত্তা। এইটী তাঁর লীলা। কেন যে তিনি এ লীলা করছেন, তা সেই লীলাময় ভিন্ন অন্যে কেও জানে না। পৃথিবী একটী নাট্যশালা স্বরূপ, আমরা জীব সকলে অভিনেতা স্বরূপ, এবং ঈশ্বর স্বয়ং দ্রষ্টা অর্থাৎ দর্শক স্বরূপ। এখন থিয়েটারের অভি-নেতারা দর্শকমণ্ডলীকে সন্তুষ্ট করবার জন্য যেমন যত্ন ও সাবধানতার সহিত অভিনয় করে, কেন না, অভিনয় খারাপ হ'লে দর্শক সব অসন্তুষ্ট হবে কাজেই তাদের পসার মারা যাবে, সুতরাং তাতে তাদের সমূহ ক্ষতি। তেমনি আমাদের ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করবার জন্য আমাদেরও যত্ন ও সাবধান-তার সহিত অভিনয় করা উচিত। কেন না, আমাদের অভিনয় খারাপ হ'লে দর্শক ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হবেন, তাতে আমাদেরও সমূহ ক্ষতি। জীবনে আমরা যা কর্ম্ম করি তাই আমাদের অভিনয়। থিয়েটারের অভিনেতা ও সংসারের অভিনেতা এতদুভয়ের মধ্যে একটী গুরুতর পার্থক্য আছে। থিয়েটারের অভিনেতাগণ কেও রাজা, কেও মন্ত্রী ইত্যাদি সেজে অভিনয় করে বটে, কিন্তু তারা মনে ঠিক ধারণা রাখে যে, আমরা রাজা অথবা মন্ত্রী ইত্যাদি কিছুই নই, কেবল অভিনয়ের জন্য সাজ সেজেছি মাত্র। সংসাররূপ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করবার জন্য, ভগবান আমাদেরকে মায়া জড়িত ক'রে নানা সাজে সাজিয়ে পাঠিয়েছেন। এখন থিয়েটারের অভি-নেতারা মনে যেমন ঠিক জানে যে, তারা অভিনয়ের জন্য সাজ সেজেছে

মাত্র তারা কিন্তু আলাদা। পরন্তু আমরা (সাংসারিক অভিনেতারা) সে ভাবটী মনে ধারণা করতে পারি না। কেন না, প্রকৃতিস্থ অবিদ্যা জনিত অহংকারের বশবর্ত্তী হওয়াতে, আমরা সাজের সঙ্গে আপনাদেরকে জড়িয়ে এক ক'রে ফেলি। কাজেই সংসার বন্ধনে পুনঃ পুনঃ আবদ্ধ হই। এই অহং জ্ঞানই সংসার বন্ধনের দড়ীর স্বরূপ ও মহৎ দুঃখের কারণ। থিয়েটারের অভিনেতারা শোক, দুঃখ, হাসি, কান্না এবং ক্রোধাদি অভিনয়ের জন্য যা কিছু করে, সমস্তই মৌখিক, অর্থাৎ অন্তরে তার বিন্দু-মাত্রও স্পর্শ হয় না, সুতরাং তাদের মনে কোন বিকারও উৎপন্ন হয় না। কাজেই তারা নির্ব্বিকার চিত্তে আনন্দ ও উৎসাহের সহিত অভিনয় ক'রে লোককে দেখায় এবং নিজেরাও আনন্দ পেয়ে থাকে। অতএব আমাদের সাংসারিক সব অভিনয় অর্থাৎ কাজ, থিয়েটারের অভিনেতাদের মত করতে হবে এবং মনের ভাবও তাদের মত নির্ব্বিকার রাখতে হবে। যেমন ঘটনাই ঘটুক্ না কেন, বিচারের দ্বারা মনের নির্ব্বিকার অবস্থা রাখতে হবে, কিন্তু সেই বিচার করতে গেলে একটু জ্ঞানের সাহায্য চাই। পরন্তু, মায়াবদ্ধ সংসারী জীবের সে জ্ঞান অনুভবে আসা এক রকম অসম্ভব। কেন না, বিনা সাধনায় সে অনুভব আসে না, কিন্তু সংসারী লোকের পক্ষে সে সাধনা সম্ভবপর ব'লে মনে হয় না।

শিষ্য। তা হ'লে সংসারী লোকের উপায় কি এবং কর্ত্তব্যই বা কি?

গুরু। দ্বৈতভাবের আশ্রয় নেওয়া কর্ত্তব্য এবং ঈশ্বরের শরণ নেওয়াই একমাত্র উপায়। এর তাৎপর্য্য এই যে, সকলেরই এইটা ভাবা এবং বিশ্বাস করা উচিত যে, ঈশ্বরই এই লীলা করছেন, সুতরাং তিনি তাঁর ইচ্ছামত সব করছেন। কাজেই তিনি যেমন করাচ্ছেন আমরাও তেমনি করছি। ভগবানও গীতার ১৮শ অধ্যায়ের ৬১টি শ্লোকে তাই ব'লেছেন যে,

ঈশ্বর সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্ররূঢানি মায়য়া॥

হে অর্জ্জুন! যেমন লোকে দারুযন্ত্রে আরূঢ় ভূত নাচিয়ে থাকে, তেমনি ঈশ্বর ভূতগণের হৃদয়ে অবস্থান ক'রে তাদেরকে ভ্রমণ করাচ্ছেন, অর্থাৎ সব করাচ্ছেন। যখন সমস্ত কাজই তাঁর ইচ্ছায় হচ্চে, তখন আমরা কর্ত্তা কিসে? আর তিনি যা কর্‌ছেন তা আমাদের মঙ্গলের জন্যই কর্‌ছেন। কেন না তিনি মঙ্গলময় অমঙ্গলের কার্য্য তাঁর দ্বারা হ'তে পারে না। সেই জন্য তাঁর একটা নাম শিব, এবং তিনি পরম দয়াল, নির্দ্দয়তার লেশমাত্রও তাঁতে নাই, সেই জন্য একটা নাম তাঁর দয়াময়। সুতরাং তিনি যে সততই আমাদের মঙ্গলের চেষ্টা করছেন মনে এই ধারণা দৃঢ়-ভাবে রেখে, সাংসারিক সুখ দুঃখ সকল অবস্থাতেই তাঁর সেই মঙ্গল উদ্দেশ্য স্মরণ ক'রে মনকে স্থির রাখ্‌তে হবে। তিনি যে নিশ্চয়ই আমাদের মঙ্গল কর্‌বেন (বটেও তাই) এই বিশ্বাসের সহিত তাঁর প্রতি ভক্তি প্রেম কর্‌তে হবে। তাহ'লে তখন তাঁরই কৃপায় মনের সাম্যাবস্থা লাভ হবে। যে ভাগ্যবানের যখন মনের সাম্যাবস্থা লাভ হয়, তখন জান্‌তে হবে যে সে ব্যক্তির ভবযন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার আর বড় বিলম্ব নাই। ঈশ্বরে যে বিশ্বাস স্থাপন কর্‌তে পারে, অর্থাৎ তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কর্‌তে পারে, তার আর কোন ভাবনা থাকে না। ভগবান তার সকল কাজ নির্ব্বাহ করেন। ভগবান সে কথা গীতার ৯ম অধ্যা-য়ের ২২শ শ্লোকে ব'লেছেন যে,

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনা পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমংবহাম্যহম্॥

যাঁরা অনন্যমনে আমাকে চিন্তা ও আরাধনা করেন, আমি সেই সব

মদেক নিষ্ঠ ভক্তদের যোগ ও ক্ষেম বহন করি। অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির চেষ্টার নাম যোগ, এবং প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষার চেষ্টার নাম ক্ষেম। এর তাৎপর্য্যার্থ এই যে, ভগবান ব'লছেন যে, আমার অনন্য ভক্তদের উপার্জ্জন ও রক্ষার চিন্তা করবার কোন দরকার নাই, যে হেতু সেসব ব্যবস্থা আমিই করে থাকি। ভক্তের বোঝা ভগবান ব'য়ে থাকেন কথায় বলে তা শোননি? তোমাকে একটা গল্প বলি শোন। তাহ'লে বুঝবে যে ভগবান ভক্তের জন্য কি করেন। একটী গরিব লোক ঘেসেড়ার কাজ ক'রে খেত, কিন্তু সে লোকটী খুব ভগবৎপরায়ণ ছিল। লোকটীর বয়স বেশি হ'লে সে সংসার ত্যাগ ক'রে গেল, এবং কেবল ভগবদুপাসনায় জীবনের অবশিষ্ট সময়টা কাটাবে ব'লে, নর্ম্মদা কিনারায় একটা বড় জঙ্গলের মধ্যে তপস্যা করতে লাগ্‌ল। গৃহত্যাগ ক'রে যাবার সময় কেবল ঘাস ছেলা খুরপিখানি সঙ্গে নিয়েছিল। উদ্দেশ্য এই যে, যদি কোন দিন ভিক্ষা না মেলে, তাহ'লে ঘাস ছিলে বেচে দু চা'র পয়সা হ'লে তাতেই সেদিন গুজরান করবে। এইরূপে মাসাবধি সে সেই জঙ্গলে আছে এবং যেদিন ভিক্ষা না মেলে সেদিন সে ঘাস বেচে চালায়। ইতিমধ্যে একদিন সকাল বেলায়, তীব্র বৈরাগ্যপ্রাপ্ত সংসারত্যাগী একজন রাজা তপস্যার অভিপ্রায়ে সেই জঙ্গলে এসে উপস্থিত হ'লেন; এবং সেই ঘেসেড়া থেকে একটু দূরে এক গাছতলায় আসন করে ব'সে ধ্যানে নিমগ্ন হ'লেন। বেলা ১২টার সময় একজন ব্রাহ্মণ একখানা বড় থালায় ক'রে নানাবিধ রাজভোগ ও এক ঘটী জল নিয়ে এসে রাজার সাম্‌নে উপস্থিত হ'য়ে বল্‌লেন যে, মহারাজ! ভোজন কর। রাজা চোখ্‌ খু'লে দেখ্‌লেন এবং তাথেকে কিছু নিয়ে খেলেন। ব্রাহ্মণের থালায় চারজন লোকের খাবার উপযুক্ত খাদ্য ছিল, সুতরাং ব্রাহ্মণ প্রায় সবই ফিরে নিয়ে গেল। সেই ঘেসেড়া তার আসনে বসেই এই ব্যাপার দেখ্‌ল। এইরূপে

জয়ায়ন্তে তিন দিন গেলে পর, সে একদিন রাজার নিকট গিয়ে বল্লে যে, মহাশয়! ব্রাহ্মণ যে রোজ আপনার খাবার নিয়ে আসে তা চার-জনের খোরাক্। আপনি ত সামান্য খান, ব্রাহ্মণ প্রায় সবই ত ফিরে নিয়ে যায়। আমি এখানে ভজন সাধন কর্‌ছি, আপনি দয়া ক'রে যদি আমাকে কিছু দেবার জন্য ঐ ব্রাহ্মণকে ব'লে দেন তাহ'লে বড় উপকার হয়। রাজা বল্লেন আচ্ছা ব'ল্‌ব। তারপর ব্রাহ্মণ খাবার নিয়ে এলে, রাজা ব্রাহ্মণকে সেই কথা বল্লেন। তাতে ব্রাহ্মণ হেসে রাজাকে এই উত্তর দিলেন যে, মহারাজ। ঐ লোকটা যখন খুরপি ছাড়্‌বে তখন সে খাবার পাবে। বুঝলে? এই রকম সকলেরই খুরপি ছাড়া চাই। অহংকারের বশবর্ত্তী হ'যে, আত্মনির্ভর না ক'রে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করা চাই। মানুষের কর্ত্তব্য যে, সকল কর্ম্মের জন্যই যত্ন, চেষ্টা ও উদ্যম করা, ফলাফল ঈশ্বরের হাত, অর্থাৎ তিনি যা কর্‌বেন তাই হবে, আমি কিছুই জানিনা, এই ধারণাটী মনে রেখে চেষ্টাদি কর্‌তে হয়।

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ, তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না কর্‌লে তিনি দেখ্‌বেন কেন? এখন মায়ার কথা যে হচ্ছিল তাই বলুন।

গুরু। তোমাকে বল্‌লাম যে, ভগবান আমাদেরকে মায়াজড়িত ক'রে সংসারে পাঠিয়েছেন, এবং সেই মায়াই সংসার রচনার মূলভিত্তি। বাস্তবিক, মায়াশূন্য হ'লে এক মুহূর্ত্তেই সাংসারিক সব অভিনয় বন্ধ হ'য়ে যায়। সেইজন্য চণ্ডীতে ব'লেছেন যে, "মহামায়া প্রভাবেন সংসার স্থিতি-কারিণঃ"। ভগবানও গীতাতে মায়াকে কঠিন ব'লে উল্লেখ করেছেন। হায়! মায়াতে মুগ্ধ হ'য়ে জীব এ সংসারে কত খেলাই খেল্‌ছে এবং কত কষ্টই পাচ্ছে। বহু বহু যোনী ভ্রমণ ক'রে, সর্ব্বশেষে জীব যে উদ্দেশ্যে মনুষ্য যোনীতে জন্ম পেয়েছে, মায়া সে উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হ'তে দেয় না।

ঈশ্বরকে দেখ্‌তে কিম্বা জান্‌তে দেয় না, এমন কি মনে সে খেয়ালও আস্‌তে দেয় না। কেও যদি বলেন যে, চর্ম্মচক্ষে ঈশ্বরকে দর্শন হয় না, একথা স্বীকার করতে পারা যায় না। তিনি নিরাকার হ'য়েও দরকার হ'লে আকার ধারণ করেন। তাঁর অতুলনীয় অভাবনীয় জ্যোতিঃ এবং উপাস্য মূর্ত্তি ভক্ত চর্ম্ম চক্ষেই দেখ্‌তে পায়। তাঁর স্বরূপ নিরাকার বটে, কিন্তু তিনি সাকার হ'তে পারেন না একথা বল্‌লে তাঁর ক্ষমতার লাঘব করা হয়। তিনি সবই হ'তে পারেন এবং এই বিশ্বে যা কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছ এ সব তাঁরই প্রতিমূর্ত্তি, কেননা, তিনিই বিশ্বে পরিণত হ'য়েছেন। তিনি কেবল ভাবের বশ, ভাবের অভাব হ'লে আর তাঁকে পাওয়া যায় না। এখন যেমন ক'রে হ'ক মনের মধ্যে তাঁর সম্বন্ধে যে কোন একটী ভাবের জমাট বাঁধা উচিত। যে কোন মূর্ত্তির উপাসনা কর না কেন, তা তাঁরই উপাসনা করা হয়। কারণ, তিনি ছাড়া কোন দেবতা নাই। কেননা, সমস্ত দেবতাই তাঁর অংশসম্ভূত। সুতরাং নিরাকার এবং সাকার দুই উপাসনাই তাঁর গ্রাহ্য। যে কোন দেবতার উপাসনা কর না কেন, উপাসনার ফল যে তিনিই দেন, সেকথা ভগবান গীতার ৭ম অধ্যায়ের ২১শ ও ২২শ শ্লোকে ব'লেছেন যে,

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥
সতয়া শ্রদ্ধয়া যুক্ত স্তস্যারাধন মীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্‌ময়ৈব বিহিতান হিতান ॥

আমার যে যে ভক্ত মদীয় দেবতা রূপ যে যে মূর্ত্তিকে শ্রদ্ধার সহিত অর্চ্চনা করে, আমি সেই সেই ভক্তকে আমার সেই সেই মূর্ত্তিবিষয়ক তাদৃশ শ্রদ্ধা দিয়ে থাকি, এবং তাদৃশ শ্রদ্ধাযুক্ত সেই সেই ভক্ত দেবতারূপে আমার

যে যে মূর্ত্তির আরাধনা করে, তারা আমাকর্ত্তৃক বিহিত কামনা সকল নিশ্চয় লাভ ক'রে থাকে। এখন দেখ ঈশ্বর নিরাকার হয়েও সাকার।

শিষ্য। ঈশ্বর নিরাকার হয়েও সাকার এ রহস্য আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

গুরু। শাস্ত্রে ঈশ্বরকে নিরাকার বলে। নিরাকার শব্দের দুটী মানে আছে। নিঃ নাস্তি আকারোযস্য, অর্থাৎ যার আকার নাই। এই একটী মানে। আর একটী মানে এই যে, নিঃ নাস্তি আকারোযস্মাৎ অর্থাৎ যাঁর পৃথক আকার আর নাই, তার মানে তিনি সর্ব্বকার। তাহ'লে এখন দেখ ঈশ্বর নিরাকার হয়েও সাকার। এ জগতে যা কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছ সব তাঁরই আকার। তিনি দয়াময়, জীবের প্রতি দয়া ক'রে তিনি সবই হ'তে পারেন। সমস্ত জীবের প্রতি তিনি কেবল দয়াই করেন নির্দ্দয়তার লেশমাত্র নাই।

শিষ্য। আপনি বল্‌ছেন ঈশ্বর জীবের প্রতি কেবল দয়াই করেন নির্দ্দয়তার লেশমাত্র নাই। তাহ'লে পাপী কদাচারী অভক্তকেও কি তিনি দয়া ক'রে থাকেন?

গুরু। তা করেন বৈকি। তাঁর কাছে পাপী পুণ্যবানের ভেদাভেদ নাই। সে কথা ভগবান গীতার ৯ম্ অধ্যায়ের ২৯শ শ্লোকে ব'লেছেন যে,

সমোহহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥

আমি সর্ব্বভূতে সমদর্শী অর্থাৎ সকল প্রাণীই আমার কাছে সমান। জগতে আমার কেও দ্বেষ্য (শত্রু) নাই কেও বন্ধুও নাই। তবে যে আমাকে ভজনা করে সে অনুরাগবশতঃ সে আমার নিকট থাকে এবং আমিও তার

নিকট থাকি। ভগবানের এই স্বভাব। তিনি সকলকেই সমান দেখেন। জীবের আপন আত্মার প্রতি যেমন মমতা, এ জগতে যাবতীয় প্রাণীর প্রতি ভগবানের সেই রকম মমতা।

শিষ্য। যাবতীয় ভূতগণকে ঈশ্বর আত্মার মত মমতা করেন কেন?

গুরু। জীবে যেমন নিজের প্রতি নিজে নির্দ্দয় হ'তে পারে না, ভগবানও তেমনি প্রাণীগণের প্রতি নির্দ্দয় হ'তে পারেন না। কারণ, বিষ্ণুই প্রভবিষ্ণু হয়েছেন। অবশ্য তিনি ভিন্ন অপর কেহ থাক্‌লে তিনিও নির্দ্দয় হ'তে পার্‌তেন তিনি নিজেই যে সব প্রাণী।

শিষ্য। যিনি এত বড় দয়াল, সেই পরম করুণাময় পরমেশ্বর মায়ার কঠিন যন্ত্রণার হাত থেকে লোকের উদ্ধার পাওয়ার কোন উপায় রাখেন্ নি?

গুরু। উপায় রেখেছেন বৈকি। ভগবান গীতার ৭ম্ অধ্যায়ের ১৪শ শ্লোকে ব'লেছেন যে,

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়া মেতাং তরন্তিতে॥

হে অর্জ্জুন। অলৌকিক গুণময়ী নিতান্ত দুস্তরা আমার এক মায়া আছে, যারা আমাকে আশ্রয় করে, তারাই ঐ মায়া অতিক্রম কর্‌তে পারে। মহাত্মা তুলসী দাসজী ব'লেছেন যে,

চল্‌তি চাকী সব কৈ দেখে কিল্ দেখেনা কৈ।
যো কিল্ পাকড় কে রহে ঐ সাবুদ রৈ॥

যেমন ডাল ভাঙ্গবার সময় শস্যের দানা যারা চাকীর নীচে থাকে তারা ভেঙ্গে ডাল হয়, কিন্তু চাকীর খুঁটোর নিকট যে সব দানা থাকে তারা

ভাঙ্গে না। তেমনি সংসাররূপ চাকীর ঈশ্বররূপ খুঁটোর নিকট যাঁরা থাকেন, তাঁরাও সংসারে ঘু'রে ঘু'রে পেষাই হন না অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর অধীন হন না। অতএব লোকের ভগবদ্ উপাসনা করা এবং তাঁর আশ্রয় নেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। নচেৎ দুর্গতি অনিবার্য্য।

শিষ্য। লোকের যখন এই অবস্থা তখন তারা ভগবানের শরণ নেয় না কেন?

গুরু। সাধারণ লোকের ভগবদ্ উপাসনা না করা অথবা তাঁর শরণ না নেওয়া'র দুটী কারণ আছে। একটী কারণ ভগবান গীতার ৭ম্ অধ্যায়ের ২৮শ শ্লোকে বলেছেন যে,

যেষাং ত্বন্ত গতং পাপং জনানাং পুণ্য কর্ম্মাণাং।
তে দ্বন্দ্বো মোহ নির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ় ব্রতা॥

যে সমস্ত পুণ্যকর্ম্মা ব্যক্তিদের পাপ বিনষ্ট হ'য়েছে, এবং দ্বন্দ্বজনিত মোহ অপগত হয়েছে, অর্থাৎ যাদের শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখাদির জন্য মন বিচলিত হয় না, সেই সব কঠোর ব্রতপরায়ণ মহাত্মারাই আমার উপাসনা ক'রে থাকেন। তাহ'লে যে ব্যক্তি যতদিন পাপাক্রান্ত থাক্‌বে, ততদিন তার ভগবানের দিকে মন যাবে না। আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে চিত্তশুদ্ধি লাভ না করা। চিত্তশুদ্ধি লাভ না হ'লে ভগবানের দিকে মন যায় না, কিন্তু নিষ্পাপ হলেও সকলের চিত্তশুদ্ধি লাভ ঘটে না।

শিষ্য। কেন? নিষ্পাপ হলেই ত চিত্তশুদ্ধি লাভ হবে।

গুরু। লোকে চিত্তশুদ্ধি লাভ না করেও কোন কারণে নিষ্পাপ হ'তে পারে। পরন্তু, চিত্তশুদ্ধি লাভ না করার দরুণ আবার পাপকর্ম্মে লিপ্তও হ'তে পারে। চিত্তশুদ্ধি লাভ হ'লেই স্থায়ী নিষ্পাপ হ'তে পারা যায়। এখন চিত্তশুদ্ধি লাভ করে ভগবানের শরণ নিতে গেলে, তদনুরূপ

সাধনা এবং আচরণ কর্‌তে হয়। সাধারণ লোকে তা কর্‌তে পারেনা ব'লে ভগবানের দিকে মন যায় না।

শিষ্য। কি রকম সাধনা বা আচরণের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ ক'রে ভগবানের শরণ নিয়ে দুঃখদায়িকা মায়ার হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়?

গুরু। আজ থাক্ আবার কা'ল্ হবে।

অষ্টম দিন।

শিষ্য। আমার কাল্‌কার প্রশ্নটীর উত্তর আজ বলুন।

গুরু। চিত্তশুদ্ধি লাভ ক'রে ভগবানের শরণ নেওয়ার উপায় হচ্ছে নিষ্কাম, অনাসক্ত ও নিরহংকার হওয়া। এই তিনটীর মধ্যে নিষ্কামই হচ্ছে মূল। অর্থাৎ নিষ্কামভাবে কর্ম্ম কর্‌লে অনাসক্তি ও নিরহংকারিতা মনে ধারণা হয়। অবশ্য এই তিনটী মনের অবস্থা বা ভাব। এই ভাব তিনটী যখন মনে দৃঢ় ধারণা হয়, অর্থাৎ পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত এই তিনটী ভাবেরই বশ হ'য়ে লোকে যখন কর্ম্ম করে, তখন লোককে কর্ম্মফলে আবদ্ধ হ'য়ে আর মায়ার হাতে পড়্‌তে হয় না। কাজেই ভবযন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পায়। কেননা, চিত্তের শুদ্ধিলাভ হেতু মনে আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন না হওয়াতে লোককে আর ফাঁসা'তে পারে না।

শিষ্য। এখন অনুগ্রহ ক'রে অনাসক্তি, নিষ্কাম ও নিরহংকার এই তিনটী ভাব বা অবস্থা আমাকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিন।

গুরু। পার্থিব সমস্ত পদার্থের উপর আসক্তিহীন হওয়ার নাম অনাসক্তি। আসক্তি মানে অনুরাগ অর্থাৎ মনের টান, সেই টানটা যদি না থাকে, তাহ'লে কোন ঘটনাতেই মন বিচলিত হয় না, সুতরাং কোন জিনিসের অভাবজনিত কষ্টও মনে হয় না, থাক্‌লেও যেমন গেলেও তেমন। মনের ঠিক এই অবস্থার নাম অনাসক্তি বা বৈরাগ্য। মনে এই বৈরাগ্যভাব হ'লে, তখন গা মন ঈশ্বরেতে লাগে, নচেৎ নয়।

শিষ্য। বৈরাগ্যভাব হ'লেই মন ঈশ্বরেতে লাগ্‌বে, নচেৎ লাগ্‌বে না তার কারণ কি?

গুরু। তার কারণ এই যে, মনে অনাসক্তি বা বৈরাগ্যভাব এলেই, তখন মন সাংসারিক যাবতীয় পদার্থের প্রেম ত্যাগ করে, অর্থাৎ কিছুরই উপর আর টান্ থাকে না, সুতরাং নিরাবলম্ব হয়। মন কিন্তু সঙ্গী ছাড়া থাক্‌তে পারে না, এইটী তার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এখন মন সাংসারিক যাবতীয় পদার্থে বীতশ্রদ্ধ হয়েছে, কিন্তু স্বাভাবিক ধর্ম্মবশতঃ অপর কারও সঙ্গ কর্‌তে চায়। পরন্তু সংসারে তার বৈরাগ্য জন্মেছে, কাজেই মন তখন সংসার ছাড়া অন্য কিছু খোঁজে, আর অমনি ভগবানকে পায় এবং তৎক্ষণাৎ তাঁতে লেগে যায়। কারণ, এই মায়াময় জীবসঙ্কুল পৃথিবীতে দুইটী মাত্র পদার্থ আছে তা ছাড়া আর কিছুই নাই। একটী মায়াপ্রপঞ্চ নাশশীল পদার্থসমন্বিত সংসার, আর একটী মায়া-নির্ম্মুক্ত অবিনাশী আনন্দময় ও শান্তিপ্রদ ভগবান। এই দুটার মধ্যে মন মায়াপ্রপঞ্চ সাংসারিক পদার্থের সঙ্গ ত আগেই ছেড়েছে, এবং এখন কারও সঙ্গে সঙ্গ করবার জন্য ব্যাকুল হয়েছে, কাজেই এখন তার ভগবানই একমাত্র অবলম্বনীয়। সেই জন্য মন তখন খুব আনন্দ ও উৎসাহের সহিত ঈশ্বরেতে সর্ব্বতোভাবে আসক্ত হয়। কাজে কাজেই অনাসক্তি বা বৈরাগ্য না হ'লে ভগবদ্ভক্তি কিম্বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। সাংসারিক পদার্থের খেয়াল থাক্‌লে ভগবানকে পাওয়া যায় না, তার একটী গল্প বলি শোন। একদিন শেষ রাত্রে একটা চোর একজন ধনাঢ্য শেঠের ঘরে ঢুকে একটা বহুমূল্য রত্নের পোট্‌লা চুরি ক'রে বেরিয়ে যাবার উপক্রম কর্‌ছে, এমন সময় সেই গৃহস্বামী শেঠ জেগে উঠে দেখ্‌লেন যে, চোর রত্নের পোঁট্‌লা চুরি ক'রে নিয়ে পালাচ্ছে। সুতরাং তিনি আর স্থির থাক্‌তে পার্‌লেন না। তখন তিনি যেমন হুড়্‌মুড়্ ক'রে খাট্

থেকে নেমেছেন, আর অমনি চোর ঘরের বা'র হ'য়ে ছুটতে লাগ্‌ল। গৃহস্বামীও চোরকে ধরবার জন্য চোরের পেছুনে পেছুনে ছুটতে লাগ্‌লেন। খানিক দূর গেলে পর চোর বেগতিক দেখে, পোঁট্‌লা থেকে কয়েকখানা রত্ন নিয়ে ডানে বাঁয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রাণপণে ছুটতে লাগ্‌ল। গৃহস্বামী ভাবলেন যে, ভোর হ'য়ে এসেছে, কি জানি কেও যদি আসে এবং রত্ন কখানা কুড়িয়ে নিয়ে যায়, তাহ'লে অনেক টাকার জিনিস যাবে। আচ্ছা, যা পাওয়া গিয়েছে সেগুলি ত হস্তগত করি, তার পর চোরকে ধর্‌ব। লোভ প্রযুক্ত গৃহস্বামী মনে এইরূপ বিচার ক'রে যেমন রত্ন কয়খানি কুড়োতে গেলেন, তখন সেই অবসরে চোর অদৃশ্য হ'য়ে গেল। কাজেই গৃহস্বামী নিরুপায় হ'য়ে সেই কখানি রত্ন নিয়েই বাড়ী ফিরে এলেন। যদি তিনি রত্নের দিকে খেয়াল না ক'রে, কেবল চোরেরই পশ্চাদ্ধাবন কর্‌তেন, তাহ'লে চোরকে নিশ্চয় ধর্‌তে পার্‌তেন। গৃহস্বামী শেঠ যেমন কয়েকখানি রত্নের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় চোরকে ধর্‌তে পার্‌লেন না, সংসারী জীবও তেমনি মায়াময় সাংসারিক পদার্থে আকৃষ্ট হওয়াতে ভগবানকে ধর্‌তে পারে না। ভগবদ্‌প্রদত্ত মায়াময় পার্থিব পদার্থে মন আকৃষ্ট না হ'য়ে কেবল যদি ভগবানের দিকেই ধাবিত হয়, তাহ'লে তাঁকে ধর্‌তে পারা যায়, নচেৎ তিনিও চোরের মত অদৃশ্য হ'য়ে যান। ভগবান সাংসারিক লোককে স্ত্রী, পুত্র, ধন, রত্ন, মান, মর্য্যাদাদি দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছেন। এখন যে গৃহীর মন ভগবদ্‌প্রদত্ত ঐ সকল পদার্থে আকৃষ্ট না হ'য়ে কেবল যদি ভগবানের দিকেই ধাবিত হয়, অর্থাৎ ব্যাকুল হয়, তাহ'লে সেই তাঁকে পায়, নচেৎ তিনিও চোরের মত অদৃশ্য হ'য়ে যান। ভগবান আবার যোগী সন্ন্যাসী প্রভৃতি ত্যাগী মহাত্মাদেরকেও অষ্ট-সিদ্ধাদি বিভূতি দিয়ে ভুলিয়ে থাকেন। যে মহাত্মা সেই বিভূতিতে আকৃষ্ট না হন, তিনিই কেবল ভগবানের নিকট পৌঁছিতে পারেন নচেৎ সব সিদ্ধ

মহাত্মাদের দশা ঐ শেঠের মত হয়। তবে লোকসমাজে বুজ্‌রুকী দেখিয়ে পূজা পেতে পারেন বটে, কিন্তু নিজেরা অধঃপতিত হন। সে সম্বন্ধে ভগবান গীতার ৭ম অধ্যায়েব ৩য় শ্লোকে ব'লেছেন যে,

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥

সহস্র সহস্র অর্থাৎ বহু বহু মনুষ্যের মধ্যে কেও কেও আত্মজ্ঞান লাভের জন্য প্রযত্ন করেন, এবং সেই সকল প্রযত্নকারীগণের মধ্যে কেও কেও সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। আবার সেই সব সিদ্ধগণের মধ্যেও কদাচিৎ কোন সিদ্ধ মহাত্মা প্রকৃত প্রস্তাবে আমাকে জান্‌তে পাবেন। তাব মানে এই যে, বিভূত্যাদি সিদ্ধি পেয়ে যাবা তাতেই ম'জে যান, তাবা আর ভগবান পর্যান্ত পৌঁছিতে পাবেন না। অতএব মনে বিচাবের দ্বারা অনাসক্তি অভ্যাস কবা কর্ত্তব্য।

শিষ্য। সাংসারিক সমস্ত পদার্থেব প্রতি আসক্তি ত্যাগ কব্‌লে লোকেব জীবনযাত্রাও নির্ব্বাহ হয় না। আপনি কি ক'রে ব'লছেন যে, সমস্ত পদার্থেব আসক্তি ত্যাগ কবা কর্ত্তব্য।

গুরু। তুমি আসক্তি ত্যাগের তাৎপর্য্যার্থ বুঝ্‌তে পারনি। সাংসারিক পদার্থের প্রতি অনুরাগ অর্থাৎ মনের ঐকান্তিক টান নিষিদ্ধ, ভোগ নিষিদ্ধ নয়। জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য সংসারের ভোগ্য পদার্থ অবশ্য ভোগ কব্‌তে হবে, কিন্তু অনাসক্ত ভাবে। তারই নাম অনাসক্তি। আসক্তিতে যে কি অপকার হয়, এবং কি রকম ভাবে যে বিষয় ভোগ কর্‌তে হবে, তা ভগবান গীতার ২য় অধ্যায়ের ৬২, ৬৩ ও ৬৪ শ্লোকে ব'লেছেন যে,

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কাম কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

ইন্দ্রিয়ের বাঞ্ছিত বিষয় ধ্যান কর্‌তে কর্‌তে অর্থাৎ চিন্তা কর্‌তে কর্‌তে তাতে আসক্তি জন্মে, আসক্তি হ'তে কামনা জন্মে, কামনা হ'তে ক্রোধ জন্মে, ক্রোধ হ'তে সম্মোহ জন্মে, সম্মোহ হ'তে স্মৃতিভ্রংশ উপস্থিত হয়, স্মৃতিভ্রংশ হেতু বুদ্ধিনাশ হয় এবং বুদ্ধিনাশ হ'লেই বিনাশ ঘটে। ভগবদ্-বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, যাকে মনে পুনঃ পুনঃ চিন্তা কর্‌বে, তারই প্রতি আসক্তি জন্মিবে, আসক্তি জন্মিলেই কামনা জন্মিবে অর্থাৎ তাকে পেতে ইচ্ছা হবে, তা না পেলেই প্রতিবোধক বিষয়ের প্রতি ক্রোধের উৎপত্তি হবে, ক্রোধ হ'লেই তখন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে মোহ হবে অর্থাৎ ভাল মন্দ বিবেচনাশূন্য হবে। এরূপ মোহ হ'লেই তখন কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ বিস্মৃত হবে, কার্য্যকারণ সম্বন্ধ ভুল্‌লেই বুদ্ধিনাশ হবে, এবং বুদ্ধিনাশ হ'লেই বিনাশ ঘট্‌বে অর্থাৎ অধোগতি হবে। অতএব সাংসারিক লোককে কি রকম ভাবে বিষয় ভোগ কর্‌তে হবে, তাই ব'লেছেন যে,

রাগ দ্বেষ বিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরণ।
আত্ম বৈশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥

যিনি বিধেয়াত্মা তিনি অনুরাগ বিদ্বেষ থেকে বিমুক্ত হ'য়ে, আপনার বশীভূত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ের উপভোগ ক'রে প্রসাদ লাভ করেন অর্থাৎ শান্তিলাভ করেন। এর তাৎপর্য্যার্থ এই যে, যিনি বিধেয় আত্মা অর্থাৎ যাঁর আত্মা (বুদ্ধি) ও অন্তঃকরণ বশবর্ত্তী থাকে, এমন ব্যক্তির ইন্দ্রিয়গণ

বলের দ্বারা তাঁর আত্মাধীন চিত্তকে হরণ করতে পারে না। যিনি রাগ দ্বেষ হ'তে বিমুক্ত হন চিত্ত তাঁর আত্মাধীন হয়, সুতরাং ইন্দ্রিয়গণ বশবর্ত্তী হয়, কাজেই তিনি সেই বশীভূত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় ভোগ ক'রে শান্তিলাভ করেন। অনাসক্তি কি জিনিস এবং কেন প্রয়োজন এখন বুঝ্‌লে?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ, এখন নিষ্কাম কাকে বলে বুঝিয়ে দিন।

গুরু। নিষ্কাম যে কাকে বলে ভগবান তা গীতার ২য় অধ্যায়ের ৪৭শ শ্লোকে ব'লেছেন যে,

কর্ম্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোহস্ত্বকর্ম্মণি॥

হে অর্জ্জুন! কর্ম্মে তোমার অধিকার হ'ক, কর্ম্মফলে যেন কদাচ অধিকার না হয়, এবং কর্ম্মফল যেন তোমার কর্ম্মে প্রবৃত্তির হেতু না হয় অর্থাৎ ফলের লোভে যেন কর্ম্ম না কর, আর কর্ম্ম না করতেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়, অর্থাৎ কর্ম্ম ত্যাগও না কর। এর তাৎপর্য্যার্থ এই যে, কর্ম্ম অবশ্য করবে কিন্তু ফল কামনা কদাচ করবে না, অর্থাৎ নিষ্কামভাবে করবে। কেন নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করতে ব'লছেন? তাহ'লে চিত্তশুদ্ধি লাভ হবে। যদি ফলের লোভে কর্ম্ম করা যায়, তাহ'লে সেটা বন্ধনের হেতু হয়। আর যদি কর্ম্ম ত্যাগই করা যায় তা হ'লেও অধোগতি হয়। অতএব সকল কর্ম্মই নিষ্কামভাবে করতে হবে। সকল কর্ম্ম কর্ত্তব্যবোধে করাই উচিৎ।

শিষ্য। এ কথাত বড় কঠিন দেখ্‌ছি। ফল না পেলে কর্ম্ম করতে মন যাবে কেন? আর যে ব'লছেন কর্ত্তব্যবোধে কর্ম্ম করতে হবে, সেই কর্ত্তব্যবোধটা মনে যে কি ক'রে আসে তাও ত বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

গুরু। কর্ত্তব্যবোধটী মনে দৃঢ় ধারণা হ'লে, তখন ফল কামনা আদৌ আসে না। এই কর্ত্তব্যবোধটা মনে কে জাগিয়ে দেয় তা জান? সে দয়া, সুতরাং দয়াই প্রধানতঃ নিষ্কাম কর্ম্মের নেতা ও উৎসাহদাতা। প্রত্যেক ব্যক্তিরই দয়া বৃত্তিটী পরিপুষ্ট করতে চেষ্টা করা উচিৎ। ঈশ্বরে কর্ম্মফল সমর্পণ ক'রে অথবা তাঁর প্রীত্যর্থে যা কিছু করা যায় তাও নিষ্কাম।

শিষ্য। কি ক'রে দয়া বৃত্তিতে নিষ্কাম করায়, আমাকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলুন।

গুরু। মনে কর তুমি রাস্তা দিয়ে চ'লে যাচ্ছ, সঙ্গে কিছু টাকাও আছে। এখন জীর্ণ শীর্ণ পীড়িত একটী লোক সেই রাস্তার ধারে প'ড়ে কাতরোক্তি করছে। যেমন তুমি সেই লোকটীর নিকটস্থ হ'য়ে তার শোচনীয় অবস্থা দেখ্‌লে, আর অমনি তার কষ্টে তোমার প্রাণটা কেঁদে উঠ্‌লো। তখন তুমি একখানা গাড়ী ভাড়া ক'রে লোকটীকে হাঁস-পাতালে পৌঁছে দিলে, এবং কিছু টাকা দিয়ে তার সেবা শুশ্রূষার ভাল বন্দোবস্তও করে দিলে। তুমি যে এই মানুষের কর্ত্তব্যটী করলে, কিন্তু এই কর্ত্তব্যটা করালে কে? সেই দয়া। দয়াতে মন গ'ললে তখন আর ফল কামনা কি অন্য কোন ভাবই মনে আসে না। কেননা, কি ক'রে দুঃখীর দুঃখ মোচন হবে সেই চিন্তাতেই মন ব্যাকুল থাকে। এক চিন্তায় মন ব্যাকুল থাকলে অন্য চিন্তা আসতে পারে কি? এখন বুঝ্‌লে? দয়া হচ্ছে মানুষের পরম কল্যাণকর বৃত্তি। এই বৃত্তিটী সকলেরই পরি-পুষ্ট করতে চেষ্টা করা উচিৎ। মহাত্মা তুলসীদাস ব'লেছেন যে,

দয়া ধরম্ কা মূল হৈ পাপ অভিমান
তুলসী দয়া মৎ ছোড়় যব লগ্ ঘটমে প্রাণ॥

শিষ্য। আপনি ব'লছেন যে দয়া বৃত্তিটী পরিপুষ্ট করতে সকলেরই চেষ্টা করা উচিৎ। এখন কি রকম ক'রে যে চেষ্টা করতে হবে তা জানি না; এবং দয়া বৃত্তিটীও আমার নাই।

গুরু। আচ্ছা ঐ পীড়িত দরিদ্র লোকটীর কথাই ধর। মনে কর তুমি ঐ লোকটীর নিকটস্থ হ'য়ে, তার সেই দুরবস্থা দেখেও তোমার মনের কোন ভাবান্তর হ'ল না। তখন তোমার কি করা উচিৎ? তখন তুমি বরাবর চ'লে না গিয়ে তার কাছে দাঁড়িয়ে তার সেই শোচনীয় অবস্থাটী তোমার মনোযোগ দিয়ে দেখা উচিৎ। ঐ রকম মনোযোগ দিয়ে দেখ্‌লে মন ক্রমে পরের দুঃখে দ্রব হয়। পরের দুঃখ মনোযোগ দিয়ে দেখা কিম্বা শোনাই হচ্ছে দয়া বৃত্তিটী প্রকটের উপায় এবং সেই অবস্থাটী পুনঃ পুনঃ মনের মধ্যে আলোচনা করা হচ্ছে দয়া বৃত্তি পরিপুষ্টির উপায়।

শিষ্য। সংসারে এমন লোকও ত থাক্‌তে পারে, যাদের চেষ্টা কর্‌লেও পরের দুঃখ দেখে মন দ্রব হয় না; সুতরাং তাদের দ্বারা নিষ্কাম কর্ম্মও হ'তে পারে না। এখন সেই সব লোকের অন্য কোন উপায়ে নিষ্কাম কর্ম্ম কর্‌বার কি সম্ভাবনা নাই?

গুরু। সম্ভাবনা আছে। আর একটী বিষয় বিচার করে দেখ্‌লেও পূর্ণ নিষ্কাম হ'তে পারা যায় সকামের নাম গন্ধও থাকে না। বিচারটী এই যে এক ঈশ্বরই আত্মারূপে সর্ব্বভূতে অবস্থান কর্‌ছেন। যখন সকল ভূতে সেই একই ঈশ্বর আছেন, তখন সকল ভূতই এক, পার্থক্য কেবল দেহের কিন্তু শরীরের সঙ্গে ত কোন সম্বন্ধ স্থাপন হয় না। শরীর কেবল সোয়ারি মাত্র, সম্বন্ধ সোয়ারের সঙ্গে।

শিষ্য। শরীর আমার তার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই; তবে কি গাঁয়ের লোকের সঙ্গে সম্বন্ধ থাক্‌বে?

গুরু। তুমি বুঝ্‌তে পার নি। সম্বন্ধ আত্মার সঙ্গে, শরীরের সঙ্গে

নয়। দেখ, মায়ের উপযুক্ত ছেলে ম'রে গিয়েছে, সেই ছেলের মৃত-দেহটাকে উঠানে কাপড় ঢাকা দিয়ে ফেলে রেখে মা কাঁদ্‌ছে। ছেলে ত তার সাম্‌নেই পড়ে আছে, তবুও তার মা কাঁদে কেন? যার সঙ্গে তার পুত্র সম্বন্ধ ছিল, সেই আত্মা চ'লে গিয়েছেন, এখন শরীরটা সোয়ারি মাত্র প'ড়ে আছে, কাজেই মা কাঁদ্‌ছে। যখন আত্মার সঙ্গে সম্বন্ধ, এবং সকল দেহেতে সেই একই আত্মা, তখন কে কাকে দান করে কিম্বা কে কার উপকার করে ইত্যাদি। কেন না, যে দান কর্‌ছে সে যে, যাকে দান কর্‌ছে সেও সেই ইত্যাদি। সকলেই যখন একই পুরুষ তখন ফল কামনা কি ক'রে হ'তে পারে? কারণ, নিজের কাজ নিজে ক'রে কেও ফল কামনা করে না, অপরের কাজ কর্‌লে অবশ্য ফল কামনা করে। দেখ, মজুরেরা অন্যের বাড়ীতে কাজ ক'রে তার ফলস্বরূপ মজুরী নেয়, কিন্তু যে দিন তারা নিজের বাড়ীতে কাজ করে, সে দিন কি আর কারও কাছে ফল কামনা করে অর্থাৎ মজুরীর আকাঙ্ক্ষা করে?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ এ গুলি আমি বুঝ্‌লাম, কিন্তু এসব বড় বিচার ক'রে তবে বুঝ্‌তে হয়। সোজা কথায় সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্মের কোন মীমাংসা নাই?

গুরু। মীমাংসা আছে। নিজের সুখের জন্য যা করা যায় তা সকাম, এবং পরের সুখের জন্য যা করা যায় তাই নিষ্কাম। কর্ম্মের মধ্যে স্বার্থ না থাক্‌লেই তা নিষ্কাম এবং স্বার্থ থাক্‌লেই তা সকাম।

শিষ্য। আগে মনে কামনা ক'রে তদনুসারে লোকে কর্ম্ম করে। কামনা নিজের ও পরের উভয়ের জন্যই হ'য়ে থাকে। কর্ম্মের মূলে যখন কামনা আছে তখন কর্ম্ম নিষ্কাম হ'ল কৈ?

গুরু। কাম শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্যার্থ আগে বোঝ। স্বর্গাদি লাভ সাধনকে কাম্যকর্ম্ম বলে, সুতরাং নিজের সুখের জন্যই সকাম শব্দের

ব্যবহার হ'য়ে থাকে। অতএব সকামের উদ্দিষ্ট যে সুখ তা কর্ম্মকর্ত্তার নিজের জন্য, কিন্তু নিষ্কামের উদ্দিষ্ট যে সুখ তা পরের জন্য।

শিষ্য। কাম শব্দ থেকেই ত কামনা শব্দ হয়েছে, কাম শব্দের মানে আকাঙ্ক্ষা ইচ্ছা। এখন যে কেহ যে কোন কাজ করুক না কেন, ফলতঃ গোড়ায় ইচ্ছা আছেই। তাহ'লে প্রত্যেক কাজেই কামনা আছে, তখন কর্ম্ম নিষ্কাম হয় কি ক'রে? আমি দেখ্‌ছি তা হ'লে সকল কর্ম্মই সকাম।

গুরু। তবে তোমাকে বল্‌লাম কি আর তুমি বুঝ্‌লেই বা কি? কামনা ব্যতীত কর্ম্ম হয় না, তা আমি মানি। সেই কামনা নিজের জন্য হ'তে পারে এবং পরের জন্যেও হ'তে পারে। নিজের জন্য কামনা ক'রে যে কর্ম্ম করে তা সকাম, এবং পরের জন্য কামনা ক'রে যে কাজ করে তাই নিষ্কাম। মহাভারতে কাম শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্যার্থ বোঝান আছে যে,

> ইন্দ্রিয়ানাঞ্চ পঞ্চানাং মনসো হৃদয়স্য চ।
> বিষয়ে বর্ত্তমানানাং যা প্রীতিরুপজায়তে।
> সকাম ইতি মে বুদ্ধি কর্ম্মানাং ফল মুত্তমম্‌॥

পাঁচটী ইন্দ্রিয় (জ্ঞানেন্দ্রিয়), মন ও হৃদয় স্ব স্ব বিষয়ে বর্ত্তমান থেকে, যে প্রীতি উপভোগ করে, আমার বিবেচনায় তাই সকাম এবং কর্ম্মের উত্তম ফল। তা হ'লে দেখ ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ের সঙ্গে সংযোগ হ'য়েই প্রীতি উপভোগ করে, সুতরাং সেটী নিজের সুখের জন্যই হচ্ছে।

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ, নিষ্কামের এ অর্থটা সোজা বটে। নিষ্কাম কর্ম্ম সম্বন্ধে আমার মনে আর একটী সংশয় এই হচ্ছে যে, নিষ্কাম কর্ম্মকর্ত্তা

আদৌ ফল কামনা করে না, কাজেই তার ফলও ভোগ হয় না। তা'হলে কি নিষ্কাম কর্ম্মের কোন ফল উৎপন্ন হয় না?

গুরু। কর্ম্ম করলেই তার ফল উৎপন্ন হয়, ফলের ইচ্ছা কর আর নাই কর। মাটীতে বীজ পুঁত্‌লেই যেমন গাছ উৎপন্ন হয়, তেমনি কর্ম্ম করলেই ফল উৎপন্ন হয়।

শিষ্য। তা'হলে নিষ্কাম কর্ম্মের ফল কি হয়? কারণ, কর্ম্মকর্ত্তা ত ফল নিচ্ছে না।

গুরু। নিষ্কাম কর্ম্মের ফল কর্ম্মকর্ত্তাই পায়।

শিষ্য। আপনার এই কথায় আমার মনে ধাঁদা লাগ্‌ছে। এই বল্‌লেন যে, নিষ্কাম কর্ম্মকর্ত্তা আদৌ ফল কামনা করে না, কেননা, কর্ম্ম-ফল ভোগের জন্যই জন্ম নিয়ে দুঃখ ভুগ্‌তে হয়। কর্ম্মফলই একমাত্র জন্মের কারণ। এখন আবার বল্‌ছেন যে, নিষ্কাম কর্ম্মের ফল কর্ম্ম-কর্ত্তাই পায়। তা'হলেই ত সেই কর্ম্মফল ভোগের জন্য তাকে জন্ম নিতেই হবে। তবে আর নিষ্কাম কর্ম্মের অর্থ কি?

গুরু। নিষ্কাম কর্ম্মের ফল যে কর্ম্মকর্ত্তা কি রকমে পায় সেটা আগে শোন, তার পর মতামত প্রকাশ ক'র। কেহ ঈশ্বরের প্রীত্যর্থে, কেহ ঈশ্বরেতে কর্ম্মফল সমর্পণ ক'রে, কেহ কর্ত্তব্যবোধে, কেহ বা দয়ার বশবর্ত্তী হ'য়ে নিষ্কাম কর্ম্ম ক'রে থাকে, ফলতঃ যে যে ভাবেই করুক্ না কেন, কর্ম্মফল হবেই। কর্ম্মকর্ত্তা ত এ ফল চায় না, তাহ'লে এখন বেওয়ারিশ কর্ম্মফল যায় কোথা? যায় ঈশ্বরে। বেওয়ারিশ মাল যেমন সরকারে যায়, নিষ্কাম কর্ম্মের বেওয়ারিশ ফলও তেমনি ঈশ্বরে যায়। পরম দয়াল ভগবানও সেই কর্ম্মফল কর্ম্মকর্ত্তাকেই দেন।

শিষ্য। তবেই ত আবার সেই গোলযোগ। কারণ, ফল ভোগের জন্য জন্ম নিতেই হবে।

গুরু। হাঁ, সে কর্ম্মফল ভোগ হয় বটে, কিন্তু তাতে অধোগতি হয় না, অর্থাৎ জন্ম হয় না। তাতে উর্দ্ধগতি হয়, অর্থাৎ মুক্তি হয় অর্থাৎ কেবল পরম ধামে পরমানন্দই ভোগ হয়। আগুনে ঝল্সান ভুট্টার দানা খেয়ে যেমন আনন্দ পাওয়া যায়, কিন্তু জমীতে বুন্‌লে গাছ হয় না, তেমনি ঈশ্বরের কৃপাগ্নিতে ঝল্সান নিষ্কাম কর্ম্মের ফলভোগে আনন্দ পাওয়া যায়, কিন্তু সে কর্ম্মফল হেতু জীবের জন্ম হয় না। সে ফলের ভোগই হ'ল মুক্তি।

শিষ্য। নিষ্কাম কর্ম্ম এক রকম বুঝ্‌লাম। এখন নিরহংকারটা আমাকে বুঝিয়ে দিন।

গুরু। আজ থাক্, আবার কাল্ হবে।

নবম দিন।

শিষ্য। অনুগ্রহ ক'রে আজ নিরহংকারটী বুঝিয়ে দিন।

গুরু। অহং জ্ঞান না থাকার নাম নিরহংকার, অর্থাৎ কর্ম্ম ক'রে, আমি করছি বা করেছি কি আমি কর্ত্তা এই রকম ভাব মনে না হওয়ায় নাম নিরহংকার। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে অহং শব্দ ত্যাগ করলে, ব্যবহার চলে না। কি সংসারী, কি ত্যাগী অহং শব্দটী কেহই ত্যাগ করতে পারে না অবশ্য মনে ধারণা না থাকতে পারে, কিন্তু মুখে অহং শব্দ ত্যাগ করা যায় না।

শিষ্য। তবে ত নিরুপায়। তা'হলে নিরহংকার শব্দ হ'ল কেন?

গুরু। নিরহংকার কাকে বলে তা আগে মন দিয়ে শোন তবে ত বুঝতে পারবে। কি সংসারী, কি ত্যাগী অহং শব্দ সকলেই ব্যবহার করে, কেননা, অহং শব্দ ত্যাগ ক'রলে কাজ চলে না। তবে নিরহংকারের মীমাংসা কি? এর মীমাংসা এই যে, অহং জ্ঞান দুই প্রকার ব্যষ্টি ও সমষ্টি। আত্মজ্ঞান লাভ ক'রে মায়ামুক্ত হ'লে, তখন সমষ্টি অহং জ্ঞান আসে, অর্থাৎ আমি মুক্ত, আমার সঙ্গে কর্ম্মের কোন সংশ্রব নাই, আমার কর্ত্তব্য কিছু নাই ইত্যাদি। আর মায়াবদ্ধ জীবের ব্যষ্টি অহং জ্ঞান মনে আসে। তাতে এই বোধ হয় যে, আমি বড় লোক, আমি দরিদ্র, আমি সুখী, আমি দুঃখী ইত্যাদি। ভূতগণের শরীরে প্রকৃতি ও পুরুষ দুইই আছেন। জীব অবস্থা ভেদে এঁদের একজনের অধীনে থাকে। যতদিন প্রকৃতির অধীন, অর্থাৎ মায়াপ্রপঞ্চে জড়িত থাকে, ততদিন সংকল্প বিকল্পের

সহিত ব্যষ্টি অহংয়ের বশবর্ত্তী হ'য়ে চলে। আর যখন জীব প্রকৃতির অধীনতা ছাড়িয়ে পুরুষের অধীনে যায়, অর্থাৎ যখন আত্মাকে জেনে আত্মজ্ঞান লাভ করে, তখন সংকল্প বিকল্প রহিত হ'য়ে শুদ্ধাবস্থায় একমাত্র কেবল সমষ্টি অহংএতেই পূর্ণ থাকে। সমষ্টি অহং মুক্তির হেতু এবং ব্যষ্টি অহং বন্ধনের হেতু। এই ব্যষ্টি অহং ত্যাগকেই নিরহংকার বলে। আমি কর্ত্তা, এই ধারণাটী মনে থেকে যাওয়ার নাম প্রকৃত নিরহংকার। যেমন লোকে দিবারাত্রি চব্বিশ ঘণ্টা শ্বাস প্রশ্বাস ফেল্‌ছে ও নিচ্ছে, কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্যেও কি কেও কখন মনে ভাবে যে আমি শ্বাস প্রশ্বাস ফেল্‌ছি নিচ্ছি। ফেলা এবং নেওয়া এ কাজ দুটী করছে লোকেই, কিন্তু কর্‌ছি ব'লে ধারণাটী কারও নাই। সকল কাজেই এই রকম মনের ভাব হ'লে, তবে ঠিক নিরহংকার হওয়া যায়। পরন্তু, জীবের পক্ষে সে রকম হওয়া একবারে অসম্ভব।

শিষ্য। যখন অহং জ্ঞান ত্যাগ করা অসম্ভব, এবং অহং শব্দ ত্যাগ কর্‌লে ব্যবহারও চলে না, তখন লোকের উপায় কি ?

গুরু। উপায় আছে। সংসারী লোকের দ্বৈতজ্ঞানের আশ্রয় নিয়ে, অভ্যাসের দ্বারা মনে একটী ধারণা দৃঢ় কর্‌তে পার্‌লে ; তখন ক্রমে ক্রমে অহং জ্ঞানের শক্ত বাঁধন ঢিলে হ'য়ে যায় এবং সময়ক্রমে একবারে খুলেও যেতে পারে। ধারণাটী হচ্ছে এই যে, ঈশ্বরকে সর্ব্বময় কর্ত্তা মনে করা (বটেও তাই), অর্থাৎ যা কিছু কর্‌ছি বা হচ্ছে সবই তাঁর ইঙ্গিতে বা ইচ্ছায় কর্‌ছি বা হচ্ছে। আমার স্বাধীন ভাবে কিছু কর্‌বার ক্ষমতা আদৌ নাই। মানুষের শত চেষ্টাতেও মনোরথ পূর্ণ হয় না, কিন্তু ভগবান যখন ইচ্ছা করেন তখন তা সহজেই হয়। তা'হলে দেখ তিনি যা করাচ্ছেন তাই হচ্ছে। ভগবান গীতার ১৮শ অধ্যায়ের ৬১টী শ্লোকে বলেছেন যে,

ঈশ্বর সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন সর্ব্বভূতানি যন্ত্ররূঢ়ানি মায়য়া ॥

হে অর্জ্জুন! যেমন লোকে দারুযন্ত্রে আরূঢ় কৃত্রিম ভূত সকলকে ভ্রমণ করিয়ে থাকে, অর্থাৎ নাচিয়ে থাকে, তেমনি ঈশ্বরও ভূত সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থেকে, তাদেরকে ভ্রমণ করাচ্ছেন অর্থাৎ নাচাচ্ছেন; তার মানে সব করাচ্ছেন। আসল ব্যাপার যখন এই রকম তখন আমি কর্ত্তা সাজি কিসে? প্রত্যেক কাজেই এইরূপ চিন্তা কর্‌লে, অহং জ্ঞান ক্রমে লোপ পেতে থাকে এবং শেষে তেলবিহীন নিষ্প্রভ প্রদীপের ন্যায় নিভে যায়। দেখ সচরাচর বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, পালন ক'রেও ভগবান নিরহংকার। ঈশ্বরের তুলনায় কীটানুকীটসদৃশ মানুষ যৎকিঞ্চিৎ অন্তঃসারশূন্য কাজ ক'রে অহংকার করে। লোকে যদি ভগবানের নিরহংকারিত্ব চিন্তা ক'রে দেখে, তাহ'লে কি আর অহংকার থাকে?

শিষ্য। অনাসক্ত, নিষ্কাম ও নিরহংকার হ'লে তবে ভগবানকে জানা যায়, অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ হয়, নচেৎ জানবার উপায় নাই।

গুরু। তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ। আমি যে এত ক'রে তোমাকে বোঝাচ্ছি তাহ'লে তুমি বুঝ্‌লে কি? ঐ অনাসক্তাদি ভাব তিনটী আয়ত্ত হ'লে, অর্থাৎ মনে দৃঢ়রূপে ধারণা হ'লে চিত্তশুদ্ধি লাভ হয় এবং তখন ভগবানকে জান্‌বার অধিকারী হওয়া যায়। তাঁকে জান্‌তে গেলে আরও কর্ত্তব্য আছে। যেমন জমীতে চাষ দিয়ে পরিষ্কার ক'রে শস্যের বীজ ছড়া'লে ফসল উৎপন্ন হয়, তেমনি অনাসক্ত, নিষ্কাম ও নিরহংকার এই ভাব তিনটী চিত্তক্ষেত্রের চাষ স্বরূপ। এদের দ্বারা চিত্তক্ষেত্র পরিষ্কার ক'রে, তখন গুরুদত্ত উপদেশ বীজ বপন কর্‌লে, ভক্তিরূপ অঙ্কুর হয়, এবং ক্রমান্বয়ে বৈরাগ্যমিশ্রিত একাগ্রতারূপ জল সেচন কর্‌লে ঐ ভক্তিরূপ

গাছ এত বাড়ে যে ভগবানের শ্রীচরণে গিয়ে সংলগ্ন হয় ও প্রেমরূপ ফুল ফুটে সমস্ত লোককে মোহিত করে, এমন কি ভগবানকেও প্রসন্ন করে। শেষে সেই প্রেমরূপ ফুল থেকে জ্ঞানরূপ শস্যের দানা উৎপন্ন হ'য়ে হৃদয়ভাণ্ডারে মজুত হয়। লোকের সংগৃহীত শস্যের দানাতে যেমন জড়দেহের ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়, জ্ঞানরূপ শস্যের দানাতেও লোকের তেমনি ভবক্ষুধা নিবৃত্তি হয়।

শিষ্য। এখন আমি বিষয়টী বুঝ্‌লাম। আপনি যে একাগ্রতার কথা বল্‌লেন, আমি দেখ্‌ছি মনকে একাগ্র করা বডই কঠিন। একাগ্রতা না হ'লে সাধনার কি অনিষ্ট হয়?

গুরু। সাধনের এই অনিষ্ট হয় যে, একাগ্রতা ভিন্ন সাধন বৃথা হয়।

শিষ্য। উপবাস ক'রে, কঠোর ক'রে সাধনা ক'রছে, মনে একটু অন্য চিন্তা হ'ল বলে সব বৃথা হবে? না হয় ফলই কম হবে।

গুরু। মনকে সমস্ত বিষয় থেকে ফিরিয়ে এনে এক ভগবানের দিকেই দিতে হবে, একেই একাগ্রতা বলে। মনের একাগ্রতা না হ'লে ভগবানকে পাওয়া যাবে না। তার কারণ এই যে, জীবের চারিদিকে মায়া প্রপঞ্চের বাঁধ আছে, এবং সেই বাঁধেই জীবকে ভগবান থেকে পৃথক্ ক'রে রেখেছে। এখন মনের দ্বারা সেই বাঁধকে ভেঙ্গে, তবে গিয়ে তাঁর সঙ্গে মিলতে হবে। সেই জন্য মনের একাগ্রতাব একান্ত প্রয়োজন। কেননা, একাগ্র মনের জোর বেশি, বিক্ষিপ্ত মন দুর্ব্বল, কাজেই সেই বিক্ষিপ্ত মনের দ্বারা মায়ার বাঁধ ভাঙ্গার কাজ হয় না। যেমন কোন জল অনেকগুলি নালী দিয়ে বেরিয়ে গেলে সে সব জলের বেগ কম হয়. কিন্তু ঐ সমস্ত জলটা যদি একটা নালী দিয়ে বেরিয়ে যায়, তা হ'লে সে জলের জোর খুব বেশী হয়। একাগ্র মনের অবস্থাও ঠিক তাই।

শিষ্য। তাহ'লে মনের একাগ্রতা ভিন্ন কিছু হবার যো নাই দেখ্‌ছি।

গুরু। তা না হ'লে শাস্ত্রে একাগ্রতা ব'লে এত চীৎকার ক'রেছে কেন ?

শিষ্য। মনকে যে কেন একাগ্র কর্‌তে হবে তা বুঝলাম। এখন সেই একাগ্রতা সাধনের উপায় কিছু আমাকে ব'লে দিন।

গুরু। ভগবানই গীতাতে মনের একাগ্রতা সাধনের উপায় ব'লে দিয়েছেন যে, "অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে"। অভ্যাস ও বিষয় বৈরাগ্য দ্বারা মনকে নিগ্রহ কর্‌তে হবে। অর্থাৎ বিষয়গামী মনকে বিষয় থেকে ফেরাতে হবে। বিষয় থেকে মন নিবৃত্ত হ'লেই তখন বিষয়ের আসক্তিও হ্রাস হ'য়ে আস্‌বে। কেননা, মন অনাসক্ত হ'লেই তখন ভগবানে একাগ্র হবে।

শিষ্য। অভ্যাস মানে কি অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যাস ?

গুরু। না, এখানে অভ্যাস মানে বিক্ষিপ্ত মনকে পুনঃ পুনঃ আহরণ ক'রে ধ্যেয় বস্তুতে লাগান। ধ্যানাদি উপাসনা কর্‌বার সময় মনের মধ্যে অন্য চিন্তা এলে পরে, তৎক্ষণাৎ সে চিন্তা ত্যাগ ক'রে পুনরায় মনকে ধ্যেয় বস্তুতে লাগাতে হবে। এই রকম যতবার হবে ততবারই মনকে ফিরিয়ে এনে শ্রীভগবানে লাগাতে হবে। বেশী দিন ধ'রে এই রকম অভ্যাস কর্‌লে, মনে অন্য চিন্তা আসা ক্রমে কম হ'য়ে আসে, এবং দীর্ঘকাল এই রকম অভ্যাসের দ্বারা মনের একাগ্রতাও লাভ হয়।

শিষ্য। কেহ যদি অভ্যাস করেও ফল না পায়, অর্থাৎ নিয়তই যদি মনে বিক্ষেপ হয় তার মানে অন্য চিন্তা আসে। তাহ'লে তার ভজন ক'রে কি ফল হয় ?

গুরু। তারও ফল আছে। মন যতই কেন বিক্ষিপ্ত হ'ক না, ভজন কখন ত্যাগ কর্‌তে নাই। সংসারে এমন কোন কাজ পাবে না যাতে দোষ না আছে। সেইজন্য ভগবান গীতাতে বলেছেন যে, "সর্ব্বারম্ভা হি

দোষেণ ধুমেনাগ্নি রিবাবৃতা"। আগুণে যেমন ধোঁয়া থাক্‌বেই কাজেও তেমনি দোষ থাক্‌বেই, দোষ ছাড়া জগতে কোন কাজ নাই। কাজ কর্‌তে কর্‌তে কালে দোষরহিত হ'তেও পারে। দোষযুক্ত ভজন হ'লেও তা ত্যাগ কর্‌তে নাই। ত্যাগ কর্‌লে অধঃপতন হয়। মনে কর খরতর নদীর স্রোতে প'ড়ে একটী লোক ভেসে যাচ্ছে। সেই নদীর স্রোত এতই প্রবল যে সাঁতার কেটে ডাঙ্গায় উঠ্‌বার সাধ্য নাই। সুতরাং তার জীবন সংশয়, কেন না, সেই স্রোতে তাকে মহাসমুদ্রে নিয়ে গিয়ে ফেল্‌বে। এখন ভেসে যেতে যেতে সেই লোকটী নদীর কিনারায় শক্ত বেনার ঝাড় পেয়ে, তখন সে সেই ঝাড় দুহাত দিয়ে চেপে ধর্‌ল, উদ্দেশ্য সুবিধা পেলেই উপরে উঠ্‌বে। নদীর স্রোতে তাকে খুব হেলাচ্ছে দুলাচ্ছে বটে, কিন্তু টেনে নিয়ে যেতে পাচ্ছেনা। পরন্তু, আশ্রয়রূপ বেনার ঝাড় যদি সে ছেড়ে দেয়, তাহ'লে স্রোতে তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে মহাসমুদ্রে ফেল্‌বে। তেম্‌নি মানুষও ভবনদীর স্রোতে প'ড়ে, অনন্তকালরূপ মহাসমুদ্রের দিকে ভেসে যাচ্ছে। ঈশ্বরোপাসনাদি ভজন হ'ল একমাত্র ধর্‌বার আশ্রয়, তা ত্যাগ কর্‌লে কি আর রক্ষা আছে? লোকে যদি ভজন সাধন একবারে ত্যাগ করে, তাহ'লে যে লোকের কি অবস্থা হয় তা ভগবানই জানেন। মন হেল্‌লে দুল্‌লেও ভজনরূপ আশ্রয় ত্যাগ করা উচিত নয়। বিক্ষিপ্ত মনেও ভজন করা কর্ত্তব্য।

শিষ্য। ভজনের প্রণালী আমি কিছু শু'নতে ইচ্ছা করি, অর্থাৎ কি রকম ভাবে ভজন কর্‌লে ফল পাওয়া যায়।

গুরু। ভজনের প্রণালী এক রকম নয় বহু রকম। যে যেমন অধিকারী সে তেম্‌নি ভাবে ভজন ক'রে থাকে, এবং ফলও তদনুরূপ পায়। কারও কোন রকম ভজনের পদ্ধতি দেখে, ঠাট্টা তামাসা করা কিম্বা তাতে কোন বিঘ্ন উৎপাদন করা অতীব অন্যায়। দেখ, কেও ধূপ, দীপ, নৈবিদ্যাদি

দিয়ে ভগবানের কোন প্রতিমার অর্চ্চনা কর্‌ছে। কেও অষ্টাঙ্গ যোগ সাধন কর্‌ছে। কেও শাস্ত্রবচন শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন কর্‌ছে। কেও ধ্যান কর্‌ছে, কেও জপ কর্‌ছে, কেও ভগবানের নাম সংকীর্ত্তন কর্‌ছে, কেও ভগবদ্‌বিষয়ক গান ক'রে নেচে বেড়াচ্ছে, কেও ভাগবৎ গীতাদি গ্রন্থ পাঠ কর্‌ছে. কেও নিষ্কামভাবে দান, পরোপকারাদি ভগবানের প্রিয় কার্য্য কর্‌ছে, কেও বা ঐ সব কিছুই পারে না, সে কেবল মাটীতে প'ড়ে ভগবানকে পুনঃ পুনঃ সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত কর্‌ছে। যে যে ভাবেই করুক, ফলতঃ ভজন কর্‌ছে সবাই।

শিষ্য। আচ্ছা, এই যে লোকে নানাবিধ ভাবে ভগবদ্ ভজন কর্‌ছে, তার মধ্যে ভাল কোনটী তাই আমাকে বলুন।

গুরু। ভগবদ্ ভজন সবই ভাল।

শিষ্য। এ জগতে এক সমান কিছুই দেখা যায় না, কেবল ভগবদ্ ভজনের বেলায় সব সমান তাও কি কখন হয়?

গুরু। তোমাকে আগেই ত ব'ল্‌লাম যে, অধিকারীভেদে লোকে নানাবিধ ভাবে ভজন ক'রে থাকে। অর্থাৎ যার যেমন সংস্কার সে সেই রকম ভাবেই ভজন ক'রে থাকে, এবং সেটী তার অনুকূলও হয়। জগতের সব ব্যাপারেই ভাল মন্দ উচু নীচু আছে। যে নিম্ন অধিকারী সে সেই ভাবেই উপাসনা কর্‌বে, এবং তাতেই তার কল্যাণ হবে, কিন্তু কেও যদি তাকে বলে যে, তোমার ভজন ঠিক হচ্ছেনা, তুমি বৃথা ভজন কর্‌ছ। তাতে সেই উপাসকের ফলের পরিবর্ত্তে অনিষ্ট হবে। তার প্রাণে কষ্ট হবে, হৃদয় ভেঙ্গে যাবে, উৎসাহ থাক্‌বে না। বৃথা পরিশ্রম কর্‌লাম ব'লে অনুতাপ হবে, এবং এই সব কারণে শেষে হয়ত সে ভজন করাই ছেড়ে দিবে। কাজেই তার মনে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে ভাবটীর জমাট বেঁধে আস্‌ছিল, সেটীও নষ্ট হবে। সে যদি দীর্ঘকাল ধ'রে তার সেই আপন ভাবের

সহিত ভজন কর্‌তে পার্‌ত, তাহ'লে ক্রমে অগ্রসর হ'তেও পার্‌ত, এবং কোন সময়ে উচ্চ অধিকার পেতেও পার্‌ত ; কেন না, ভগবান ভাবের বশ। সেইজন্য ভগবান গীতার ৩য় অধ্যায়ের ২৬শ শ্লোকে বলেছেন যে,

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদ জ্ঞানাং কর্ম্ম সঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান যুক্তঃ সমাচরণ ॥

বিদ্বান অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তি কর্ম্মসঙ্গী অজ্ঞ লোকদের বুদ্ধিভেদ জন্মাবেন না, বরং যাতে তাদের উপকার হয় সেই রকম আচরণ ক'রে তাদেরকে দেখিয়ে দিবেন। অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষী কাম্যকর্ম্মী লোকদিগকে তাদের কর্ম্ম যে বন্ধনের হেতু হচ্ছে তা না বলে যাতে তাদের নিষ্কামে প্রবৃত্তি হয় সেই রকম ক'রে দেখিয়ে দিবেন। তেমনি নিম্ন অধিকারীর সাধককে ভজন সাধন ঠিক হচ্ছে না একথা না ব'লে বরং তুমি যা কর্‌ছ বেশ হচ্ছে তবে তার সঙ্গে এই রকম কর্‌তে পার্‌লেই আরও ভাল হয়, এই ভাবে উপদেশ দিলে উপকার হয়।

শিষ্য। আমাদের সনাতন ধর্ম্মে দেবদেবীও অনেক আছেন, এখন সগুণ উপাসনা কর্‌তে গেলে কোন মূর্ত্তির উপাসনা করা উচিৎ।

গুরু। আগে তোমাকে যা বল্‌লাম, এ সম্বন্ধেও সেই নিয়ম ; অর্থাৎ লোকের সংস্কারানুসারেই দেবমূর্ত্তির প্রতি প্রীতি উৎপন্ন হয়। তা কাওকে ব'লে দিতে হয় না, লোকের সেই প্রীতি অন্তর থেকে আপ্‌নিই প্রকট হয় যে মূর্ত্তিরই উপাসনা কর না কেন, সে উপাসনা ভগবানেরই করা হয়। সে কথা ভগবান গীতার ৪র্থ অধ্যায়ের ১১শ শ্লোকে ব'লেছেন যে,

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥

হে পার্থ! যে আমাকে যে ভাবে উপাসনা করে, আমি তাকে সেই ভাবেই সন্তুষ্ট করি। মানুষ উপাসনা সম্বন্ধে যে পথই অবলম্বন করুক না কেন, অর্থাৎ যে দেবতারই উপাসনা করুক না কেন, আমার পথের অনুবর্ত্তী হ'তেই হবে, অর্থাৎ আমার কাছে আস্‌'তেই হবে। তার মানে এই যে, মানুষ যে দেবতারই উপাসনা করুক না কেন, সে উপাসনা আমারই করা হয়, কেননা আমিই সর্ব্বদেবতা। সে বিষয়ে ভগবান গীতার ৭ম অধ্যায়ের ২১শ শ্লোকে ব'লেছেন যে,

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতু মিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥

যে যে ভক্ত মদীয় দেবতারূপ যে যে মূর্ত্তির শ্রদ্ধার সহিত অর্চ্চনা করে, আমি সেই সেই ভক্তকে আমার সেই সেই মূর্ত্তিবিষয়ক অচলা শ্রদ্ধা দিয়ে থাকি। অন্যান্য উপাসনার ফল যে তিনিই দেন সে কথাও ভগবান পরের শ্লোকে ব'লছেন যে,

সতয়া শ্রদ্ধযাযুক্ত স্তস্যারাধন মীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান ময়ৈব বিহিতান হিতান ॥

তাদৃশ শ্রদ্ধাযুক্ত সেই সেই ভক্ত যে যে দেবতার আরাধনা করে, তারা আমাকর্ত্তৃকই সেই সেই বিহিত কামনা সকল লাভ ক'রে থাকে। সুতরাং যে কোন দেবতার পূজা ক'রলে ভগবানেরই পূজা করা হয়। তবে তাঁর সেই পূজা অবিধিপূর্ব্বক করা হয়। সে কথা ভগবান গীতার ৯ম অধ্যায়ের ২৩শ শ্লোকে ব'লেছেন যে,

যেঽপ্যন্য দেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধি পূর্ব্বকম্ ॥

হে কৌন্তেয়! যারা শ্রদ্ধাযুক্ত হ'য়ে অন্যান্য দেবতার পূজা করে, তারা অবিধিপূর্ব্বক আমারই পূজা করে। সে উপাসনার যে কি ফল হয়, অর্থাৎ তাদের গতি কি হয়, পরের শ্লোকে ভগবান তাই ব'লেছেন যে,

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
নতু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তিতে ॥

আমি যে সকল যজ্ঞের ভোক্তা এবং ফলদাতা স্বামী, তারা আমার এই প্রকৃত তত্ত্ব অবগত না হওয়াতে, সংসারে পুনরাগমন করে অর্থাৎ জন্ম মৃত্যুর অধীন হয়।

শিষ্য। বিধিপূর্ব্বক এবং অবিধিপূর্ব্বক অর্চ্চনা কাকে বলে আমাকে বুঝিয়ে দিন।

গুরু। লোকে যখন কামনা বিশেষের বশবর্ত্তী হ'য়ে, অন্যান্য দেবতার পূজা করে, তখন তাদের মনে দৃঢ় ধারণা থাকে যে, আমরা অমুক দেবতার পূজা করছি, তাঁর এই এই ঐশ্বর্য্য বিভূতি আছে, এবং সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী ঈশ্বর সকলের উপরে আছেন। তাদের এই ধারণা থাকাতে, তারা পূর্ণ ঐশ্বর্য্যশালী ঈশ্বরকে পায় না। সেইজন্য ভগবান এইরূপ অর্চনাকে অবিধিপূর্ব্বক অর্চ্চনা ব'লেছেন। আর যারা পূর্ণ ঐশ্বর্য্যাদি আরোপ ক'রে, অর্থাৎ ইনিই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর মনে এইরূপ দৃঢ় ধারণার সহিত যে মূর্ত্তির অর্চ্চনা করে, তারা তাঁকে (ঈশ্বরকে) সেই উপাস্য মূর্ত্তির মধ্যেই পায়। একেই ভগবান বিধিপূর্ব্বক অর্চ্চনা ব'লেছেন।

শিষ্য। নির্গুণ অর্থাৎ নিরাকার উপাসনা সম্বন্ধে কি রকম?

গুরু। তাও ঠিক এই রকম, অর্থাৎ যাঁর সেই রকম সংস্কার আছে

তিনি সেই নির্গুণ ভাবেই ভগবানকে জেনে থাকেন। তার মানে এই যে, উপাসক অপরোক্ষানুভূতি লাভ ক'রে পূর্ণকাম হন।

শিষ্য। ঈশ্বর অনন্ত হ'য়ে কি ক'বে যে শান্ত মূর্ত্তিব মধ্যে আসেন আমি তাই ভাবছি।

গুরু। ভক্ত শান্তমনের দ্বারা অনন্তকে ধর্‌তে পারে না ব'লে, তিনি শান্ত মূর্ত্তির মধ্যে আসেন। সেইজন্যই ত ভগবান গীতায় ব'লেছেন যে, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।"

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ, এখন আমি বুঝ্‌লাম যে যে মূর্ত্তিতে তাঁর পূর্ণ ঐশ্বর্য্য আরোপ ক'বে, অর্থাৎ মনে সেই ভাবটা দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত, অর্চ্চনা কর্‌লে সেই মূর্ত্তিতেই তাঁকে পাওয়া যায়।

গুরু। হাঁ ঠিক তাই। যেমন কেও নগেনকে যদি সুরেন ব'লে ডাকে, তাহ'লে নগেন কি উত্তর দেয়, না কাছে আসে? নগেন ডাক শোনে বটে, কিন্তু মনে করে আমাকে ত ডাক্‌ছে না। তেম্‌নি ঈশ্বরও: পূর্ণ ডাক ভিন্ন উত্তর দেন না অর্থাৎ দর্শন দেন না। এমন কি এই জগতের কোন পদার্থে তাঁর পূর্ণ ঐশ্বর্য্য আরোপ ক'রে, অর্থাৎ এতেই ঈশ্বর আছেন মনে এইটা পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত অকপট হৃদয়ে ডাক্‌লে তিনি তাথেকেই প্রকট হন। কেন, না, তিনি সকল পদার্থেই ব্যাপ্ত আছেন। তাতেই ত প্রহ্লাদের ডাকে ভগবান থামের মধ্যে থেকে প্রকট হয়েছেন। লোকে যে বলে ডাকের মত ডাক্‌তে পার্‌লে তাঁকে পাওয়া যায়। এরই নাম ডাকের মত ডাক।

শিষ্য। যে দেবতারই অর্চ্চনা করা যাক প্রকারান্তরে ঈশ্বরেরই অর্চ্চনা করা হয়, তা আমি বুঝ্‌লাম। যখন একমাত্র ঈশ্বরই সর্ব্বময়, তখন আমাদের সনাতন ধর্ম্মে এত দেবতার অর্চ্চনা পদ্ধতি কেন আছে?

গুরু। আজ থাক্ আবার কাল হবে।

দশম দিন।

শিষ্য। আমার কালকার প্রশ্নটী আজ বুঝিয়ে দিন।

গুরু। নানা দেবতার পৃথক পৃথক ভাবে অর্চ্চনা করবার কারণ এই যে, ভগবান অনন্ত, অচিন্ত্য, এবং অসীম বিভূতিশালী, সুতরাং মানুষে শান্ত মনের দ্বারায় সেই অনন্তকে ধারণা করতে পারে না, কাজেই তাঁর এক একটী বিভূতির মূর্ত্তি কল্পনা ক'রে ইন্দ্র বরুণাদি দেবতারূপে পৃথক পৃথক ভাবে অর্চ্চনা ক'রে থাকে। ভগবানও পরম দয়াল যে যে ভাবে তাঁকে অর্চ্চনা করেন তিনি সেই ভাবেই তাকে সন্তুষ্ট করেন।

শিষ্য। এ বিষয়টী আমি বুঝলাম। এখন পূজা পদ্ধতি সম্বন্ধে আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।

গুরু। কি বল।

শিষ্য। দেবতাদের পূজার মন্ত্র সব সংস্কৃত ভাষায় রচিত। এখন যার সংস্কৃত জানা নাই তার মন্ত্র উচ্চারণ অশুদ্ধও হ'তে পারে, সে অবস্থায় ভগবদ্ অর্চ্চনা কি ক্রিয়ার ফল কেমন হবে?

গুরু। শাস্ত্রে কোন কোন ক্রিয়ার এমন বিধানও আছে যে, মন্ত্র অশুদ্ধ হ'লে ক্রিয়ার ফলেরও তারতম্য হয়; কিন্তু ভগবদ্ অর্চ্চনায় ভক্তের পক্ষে সে নিয়ম খাটে না। সাচ্চা ভক্তির সহিত যে পূজা হয়, ভগবান সেই পূজাই গ্রহণ করেন। তাতে মন্ত্র শুদ্ধ হ'ক আর অশুদ্ধ হ'ক কোন চিন্তা নাই হৃদয়ে কেবল খাঁটি ভক্তি থাকা চাই। ভক্তিহীন পূজা পূজাই নয়। ভক্তরাজ রামপ্রসাদ বলেছেন যে "তুমি লোক দেখান করবে পূজা মা ত আমার ঘুষ খাবে না।" ভগবদ্ পূজার মন্ত্রের শুদ্ধাশুদ্ধি সম্বন্ধে একটী বচনও আছে যে,

ধীরঃ বদতি বিষ্ণোবে মূর্খঃ বদতি বিষ্টায়।
দ্বয়োমেক সমপুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ॥

পণ্ডিত ভক্ত বিষ্ণোবে নমঃ ব'লে পূজা করে, মূর্খ ভক্ত বিষ্টায় নমঃ ব'লে পূজা করে, কিন্তু উভয়ের মনে খাঁটী ভক্তি থাকা হেতু, পরস্পরের বাক্যের অর্থ বৈষম্য হ'লেও উভয়ে সমান ফলভাগী। কেননা, ভগবান হৃদয়ের ভাব গ্রহণ করেন মুখের কথায় ভোলেন না। তিনি ইংলিশ এডিকেট্ পছন্দ করেন না। তুমি সংস্কৃত, বাঙ্গলা, উর্দ্দু, ইংরাজি যে কোন ভাষায় শুদ্ধ বা অশুদ্ধভাবে স্তব উপাসনাদি কর না কেন, যদি হৃদয়ে খাঁটী ভক্তি থাকে তাহ'লে সকল উপাসনাই তাঁর গ্রাহ্য, নচেৎ ভক্তিহীন অতি বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় উপাসনাও তাঁর গ্রাহ্য নয়।

শিষ্য। আচ্ছা, দেবমন্দিরে দেবমূর্ত্তি দর্শনে যাওয়ার ফল কি? সেখানে ত কেবল কাট পাথর অথবা ধাতুব মূর্ত্তি বৈত নয়। আপনাকে ত প্রায়ই মন্দিবে যেতে দেখি।

গুরু। মন্দিরে ভগবদ্ মূর্ত্তি দর্শন ক'র্‌তে যাওয়ার ফল আছে, এবং যাওয়াও একান্ত কর্ত্তব্য। আমি কেন যে যাই তার কারণ বলি শোন। আমার মনে পূর্ণরূপে বিশ্বাস আছে যে ভগবান সর্ব্বত্রই আছেন, কোনও স্থান বা কোনও বস্তু বাদ নাই। ভগবান কি কেবল ঐ মন্দিরের মধ্যে পাথরাদির মূর্ত্তির মধ্যেই আছেন বাইরে নাই? তাত নয়, তিনি সর্ব্বত্রই পরিপূর্ণ আছেন, তত্রাচ আমি মন্দিরে যাই কেন? কারণ, দেবমন্দিরে দর্শনের জন্য গিয়ে, কিম্বা পূজা আরতি দেখে, আমার মনে যে ভাবের উদয় হয় এবং তাতে আমি যে আনন্দ পাই, তা অন্য স্থানে হয় না অর্থাৎ মনের সে ভাবও হয় না এবং সে আনন্দও পাই না; কাজেই মন্দিরে যাই। যখন মন্দির ছাড়া অন্য স্থানেও সেই রকম মনের ভাব হবে এবং সেই রকম

আনন্দ পাব, তখন আমার মন্দিরে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। পরন্তু যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন আমি যেতে বাধ্য এবং যাওয়াও কর্ত্তব্য। অতএব দেবমন্দিরে গিয়ে দেবমূর্ত্তি দর্শন করা, মন্দির প্রদক্ষিণ করা, চরণামৃত নেওয়া, প্রসাদ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কেননা, এর দ্বারা মনে ক্রমে ভাবের জমাট বাঁধে। সেই ভাবের পূর্ণতা হ'লেই ভগবানকে পাওয়া যায়, কারণ তিনি ভাবেরই বশ।

শিষ্য। আমাদের সনাতন ধর্ম্মে অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখ্‌তে পাওয়া যায়, কিন্তু কালী প্রতিমা দেখে কেমন বিসদৃশ ভাব লাগে। তিন চোখ চার হাত, হাতে মানুষের মাথা ও খাঁড়া, এবং এক হাত পেতে ও এক হাত তুলে, গলায় মুণ্ডমালা ও কোমরে হাতের মালা প'রে, জিব বা'র ক'রে তা আবার দাঁতে কেটে, মাথার চুল এলিয়ে দিয়ে, নগ্নাবস্থায় শিবের বুকে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। শু'ন্‌তে পাই যে শিব কালীর পতি, সেই পতির বুকে পা দিয়ে দাঁড়ান।। এই সব দেখে কিম্ভূতকিমাকার ব'লে মনে হয়।

গুরু। তোমার মত মূর্খেরাই কিম্ভূতকিমাকার ব'লে মনে করে। দেবতাসদৃশ ঋষিবংশে জন্মগ্রহণ ক'রে সংসর্গ দোষে বিকৃত রুচিসম্পন্ন হওয়াতে, ত্রিতাপহারিণী সৃজন পালন-নিধনকারিণী শ্যামা মাকে ব'লছ কিম্ভূতকিমাকার।।। ধিক্ দেশপ্রচলিত বর্ত্তমান সভ্যতায়, সেই সভ্যতার হাওয়াতেই লোকের এই রুচিবিকৃতি ঘটেছে।

শিষ্য। আমার বড় অপরাধ হ'য়েছে। আমি না জেনে বড় অন্যায় কথা ব'লেছি, অনুগ্রহ ক'রে এখন আমাকে শ্যামা-পূজার তাৎপর্য্যার্থ বুঝিয়ে দিন।

গুরু। তবে শোন। আত্মারাম ত্রিকালজ্ঞ ব্রহ্মবিদ্ ঋষিগণ ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কারও পূজা করেননি। কার্য্যানুরোধে কারণবশতঃ ঈশ্বরেরই

কোন্ নাদের পর শোনা যায় যোগশাস্ত্রে তাও নির্দ্দিষ্ট আছে, এবং ঠিক সেই রকম শোনাও যায়। সম্পূর্ণ দশটী নাদ যখন শুন্‌তে পাওয়া যায়, মন তখন সেই নাদে অর্থাৎ সেই আওয়াজে মন মগ্ন হ'য়ে থাকে, অন্য কোন বিষয় গ্রহণ করে না। রাজযোগে ধ্যানাবস্থায় মনের এই রকম ভাবটী অতীব প্রয়োজনীয়।

শিষ্য। এখন রাজযোগটী আমাকে বুঝিয়ে দিন।

গুরু। আজ থাক্ আবার কা'ল হবে।

একাদশ দিন।

শিষ্য। আজ রাজযোগটী বলুন।

গুরু। রাজযোগের শব্দার্থ হচ্ছে যে, যোগের রাজা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ যোগ, কিন্তু রাজযোগের তাৎপর্য্যার্থ হচ্ছে এই যে, চিত্তের বহির্মুখীন বৃত্তিগুলিকে ও ইন্দ্রিয়গুলিকে অন্তর্মুখীন ক'রে, ধ্যানের দ্বারা সমাধি অবস্থায় জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে মিলন তার নাম রাজযোগ, অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের নাম রাজযোগ। এই রাজযোগের আটটী অঙ্গ বা বিষয় আছে, সেই জন্য একে অষ্টাঙ্গ যোগও বলে। এই আটটী অঙ্গ বা বিষয়ের সাধনা ক'রে সিদ্ধিলাভ ক'রতে পারলে, তবে রাজযোগ সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ হয়। আত্মজ্ঞানীকে রাজযোগী বলে।

শিষ্য। সেই আটটী অঙ্গ আমাকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বুঝিয়ে দিন।

গুরু। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়ম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই আটটী অঙ্গ। (১) যম,—অহিংসা (হিংসা ত্যাগ), সত্য (মিথ্যা না বলা), অস্তেয় (চুরি না করা, ব্রহ্মচর্য্য (বীর্য্য ধারণ) ও অপরিগ্রহ (দান গ্রহণ না করা)। নিয়ম—(২) তপ, সন্তোষ, শৌচ, সাধ্যায়, ঈশ্বর-প্রণিধান এই কয়টী অভ্যাস করলে তবে নিয়ম সাধন করা হয়। আসন—যে কোন আসনে অনেকক্ষণ নিরুদ্বেগে ব'সতে

---

(১) গ্রন্থান্তরে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, ক্ষমা, ধৃতি, দয়া, আর্জব, মিতাহার ও শৌচ। এই কয়টা পালন করলে যমসাধন করা হয়।

(২) তপ, সন্তোষ, আস্তিক্য, দান, ঈশ্বর উপাসনা, সিদ্ধান্ত শ্রবণ, লজ্জা, মতি, জপ, ব্রত ও যজ্ঞ এই কয়টা সাধনের নাম নিয়ম গ্রন্থান্তরে এমনও আছে।

অভ্যাস হ'লে তবে আসন সিদ্ধ করা হয়। প্রাণায়ম—প্রাণের সংযম অর্থাৎ প্রাণবায়ুকে অপান বায়ুর সহিত সংযোগ ক'রে স্থির রাখা অভ্যাস কর্‌লে তবে প্রাণায়ম সাধন করা হয়। প্রত্যাহার—বিষয়োন্মুখী ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় থেকে ফিরিয়ে আনা অর্থাৎ বহির্মুখীন ইন্দ্রিয়গণকে অন্তর্মুখীন কর্‌তে পার্‌লে তবে প্রত্যাহার সাধন করা হয়। ধারণা—কোন একটী নির্দ্দিষ্ট বস্তুতে মনকে আকৃষ্ট ক'রে রাখ্‌তে পার্‌লে তবে ধারণা সাধন করা হয়। ধ্যান ধ্যেয় পদার্থকে অবিচ্ছেদভাবে চিন্তা কর্‌তে পার্‌লে তবে ধ্যান সাধন করা হয়। সমাধি—ধ্যানের দ্বাদশ গুণ স্থিতি হ'লে তবে সমাধি সাধন করা হয়। রাজযোগের এই আখির ফল সমাধি, অথবা যে কোন শাস্ত্রে যে কোন রকম সাধনা আছে, সকলেরই আখির ফল এই সমাধি। অর্থাৎ সমাধিলাভ হ'লেই আসল তত্ত্বে পৌঁছান যায়।

শিষ্য। এই সমাধি বিষয়টী যে কি অনুগ্রহ ক'রে তাই আমাকে বুঝিয়ে দিন।

গুরু। যোগশাস্ত্রে ব'লেছে যে,

তৎসমঞ্চ দ্বযোরৈক্যং জীবাত্ম পরমাত্মনোঃ।
প্রণষ্ট সর্ব্ব সংকল্প সমাধিঃ সোঽভিধীয়তে॥

যখন জীবাত্মা ও পরমাত্মা মিলিত হ'য়ে এক হন, এবং মনে সমস্ত সংকল্প বিকল্প রহিত হয়, তখন সেই অবস্থাকে সমাধি বলে। সে অবস্থায় জীবাত্মা ও পরমাত্মায় স্বতন্ত্রতা কিছুমাত্র থাকে না। যেমন লবণ সমুদ্র জল থেকে উৎপন্ন হয়, কিন্তু সেই লবণ আবার জলে গ'লে জল হ'য়ে যায়, তখন আর লবণের স্বতন্ত্রতা থাকে না। সমাধি অবস্থায় জীবাত্মার ঠিক

সেই ভাব হয়। এই সমাধি লাভ কর্‌বার জন্যই যোগের অন্যান্য অঙ্গগুলি সাধন কর্‌তে হয়। সমাধি অবস্থায় যোগীর বাহ্যজ্ঞান থাকে না। তখন তিনি পরমানন্দে বিভোর থাকেন। কেননা, তখন তিনি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, সচ্চিদানন্দ পরমাত্মাতে মিলে থাকেন ব'লে তাঁর নিকট আর অন্য কোন ভাব আস্‌তে পারে না। সমাধি প্রধানতঃ দুই প্রকার সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প। এদেরকে সবীজ ও নির্ব্বীজ সমাধিও বলে। পরন্তু, সবিকল্প সমাধি উচ্চ নীচ ভেদে অনেক রকম হয়, তার মধ্যে ভাব সমাধি ও জড়-সমাধি প্রায় দেখ্‌তে পাওয়া যায়। সবিকল্প সমাধি, বিকল্পের সহিত যে সমাধি লাভ হয়, তাকে সবিকল্প সমাধি বলে। বিকল্প কি? মনের মধ্যে দ্বৈতজ্ঞান থাকা হচ্ছে বিকল্প। তার মানে মায়াজনিত অহং জ্ঞানটী থাকে। অর্থাৎ ধ্যাতা, ধ্যেয় ও ধ্যান, এবং জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এদের পরস্পরের পার্থক্য থাকে। এর সোজা মানে এই যে, মায়ার অধীনে থেকে যে সমাধি লাভ হয় তাই সবিকল্প সমাধি। সুতরাং এ সমাধিতে সংস্কার সব ধ্বংস হয় না। নির্ব্বিকল্প সমাধি, বিকল্প রহিত অর্থাৎ মায়া জনিত অহংজ্ঞান হেতু দ্বৈতভাব রহিত যে সমাধি তাকে নির্ব্বিকল্প সমাধি বলে। এ সমাধিতে ধ্যান, ধ্যেয় ও ধ্যাতা এবং জ্ঞান, জ্ঞেয় জ্ঞাতার কোন পৃথক্ অনুভব থাকে না সমস্তই একভাবে পরিণত হয়। এই সমাধিতে সংস্কারের নাম গন্ধও থাকে না এবং অহং জ্ঞানের ছিটে ফোঁটাও থাকে না। এর সিধা মানে এই যে, পূর্ণ অদ্বৈতজ্ঞানের সহিত স্বরূপ অবস্থায় স্থিতির নাম নির্ব্বিকল্প সমাধি।

শিষ্য। নির্ব্বিকল্প সমাধিতে দ্বৈতভাব থাকে না ব'লছেন, তবে কি বরাবরই অদ্বৈতভাব থাকে, না—মন কখন নেমে আসে।

গুরু। পরমাত্মা যাঁদের দ্বারায় জগতের কিছু কাজ করান অর্থাৎ লোকশিক্ষা দেওয়ান, তাঁদের মন নেমে আসে নচেৎ নয়। লোক-শিক্ষার্থে

মন নেমে এলেও সে সব মহাত্মাদের স্বীয় ভাবের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় না। উভয় অবস্থাতেই মনের ভাব ঠিক একই থাকে। তাঁরা যা করেন বা বলেন, তার সঙ্গে তাঁদের নিজেদের কিছুমাত্র সম্পর্ক থাকে না। প্রহ্লাদ, জনক, শিখিধ্বজ ও কচ্ প্রভৃতি মহাত্মাদের নির্ব্বিকল্প সমাধি থেকে লোকশিক্ষার্থে, মন নেমে আসাব কথা যোগবাশিষ্ঠে উল্লেখ আছে।

শিষ্য। আপনি যে জড় সমাধি ও ভাব সমাধির কথা ব'ল্লেন তা কেমন জানতে কৌতূহল হচ্ছে।

গুরু। জড় সমাধি,—কোন কোন যোগীর প্রাণবায়ু সুষুম্নাতে প্রবেশ ক'রেও কোন কারণবশতঃ কোন স্থানে আট্‌কে যায়, ব্রহ্মরন্ধ্রে, যেতে পারে না। তখন যোগী জড়াবস্থায় থাকেন এবং কিছুমাত্র না খেয়েও বহুদিন জীবিত থাক্‌তে পারেন। আ ম মাদ্রাস নাগাপেটেমে সেই রকম একটী যোগী দেখেছি। তিনি কিছুমাত্র না খেয়ে আড়াই বছর একটী শিব মন্দিরে জড়াবস্থায় প'ড়ে ছিলেন। শুনেছি, পরে প্রাণবায়ু সুষুম্না থেকে বেরিয়ে এলে তখন তাঁর বাহ্যজ্ঞান হয়, এবং কিছু কিছু খেতেও আরম্ভ কর্‌লেন ও ধীরে ধীরে কথা বল্‌তে লাগ্‌লেন। নিদ্রার সুষুপ্তি অবস্থাকেও জড় সমাধি বল্‌তে পারা যায়। পরন্তু এ জড় সমাধি যোগীদের জড় সমাধি থেকে অনেক নীচু। কেন না, এতে কিছুমাত্র অনুভূতি থাকে না, যোগীদের জড় সমাধি অবস্থায় অন্তরে একটা অনুভূতি থাকে। সমাধি লাভ কর্‌লে মন উন্নত হয় কিন্তু নিদ্রার সুষুপ্তি অবস্থায় যে জড় সমাধি বল্‌ছি তাতে মনের একবারে অবনত হয়। তবুও এই সুষুপ্তি অবস্থাকে জড় সমাধি বল্‌বার কারণ এই যে, মন তখন তমরূপ অন্ধকারে সমাহিত থাকে। সমাধি অবস্থায় মন প্রকৃতির অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার সীমানার বাইরে যায়, তার মানে মন মায়ানির্ম্মুক্ত হ'য়ে পরমাত্মার

মুক্ত জ্ঞানালোকে যায়, সুতরাং পণ্ডিত কি মূর্খের যেমন মনই হ'ক্ না কেন, সমাধিলাভ কর্‌লেই জ্ঞানময় হবে। এমন কি মহামূর্খেরও যদি সমাধি লাভ হয় সেও মহাজ্ঞানী হবে। কেন না, মন জ্ঞানালোকে আলোকিত হ'য়ে আসে, কাজেই সে মনে অজ্ঞানরূপ অন্ধকার আর থাক্‌তে পারে না। একে মনের ঊর্দ্ধগতি বলে। পরন্তু সুষুপ্তির জড় সমাধির অবস্থা ঠিক এর বিপরীত অর্থাৎ মন তখন তমরূপ অন্ধকারে ডুবে থাকে। সেইজন্য দেখ না, লোকে গাঢ় নিদ্রা থেকে উঠে হঠাৎ কিছু স্মরণ কর্‌তে পারে না, একটু পরে তবে প্রকৃতিস্থ হয়। তার মানে সুষুপ্তি সময়ে মন ঘোর অন্ধকারে ডু'বে থাকে, কাজেই জাগ্রত হ'য়ে বাহ্য জগতে ফিরে এলেও প্রথমটা খানিক সেই তমোর প্রভাব থাকে। ভাব সমাধি ভগবৎ কীর্ত্তন কি তাদৃশ কোন সঙ্গীত অথবা ভগবল্লীলার কথা শু'নে যে সমাধি লাভ হয়, তাকে ভাব সমাধি বলে। ভাব সমাধিতে মন অবশ্য ত্রিগুণাত্মিকা মায়া অতিক্রম ক'রে পূর্ণ জ্ঞানালোকে যেতে পারে না বটে, কিন্তু মায়ার সঙ্গে জড়িত থেকে জ্ঞানালোক দর্শন হওয়া হেতু ভগবৎ প্রেমে মন মগ্ন থাকে এবং এক রকম আনন্দও উপভোগ হয়। পরন্তু এ সমাধির দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হয় না, অথবা অপরোক্ষানুভূতি আসে না। আমি ৺বৃন্দাবন ধামে গিরিরাজে একটী বৈষ্ণবের আশ্চয্য ভাব সমাধি দেখেছি। মুখে গাঁজড়া ভেঙ্গে সাদা ফেনা বেরুচ্ছিল, এবং প্রাণায়মের কুম্ভকের মত স্থির অবস্থায় অনেকক্ষণ তিনি ছিলেন। নাম সংকীর্ত্তন কর্‌তে কর্‌তে তবে বাহ্যজ্ঞান হ'ল। এই ভাব সমাধির দ্বারায়ও চিত্তের যথেষ্ট শুদ্ধি লাভ হয়।

শিষ্য। যোগ সম্বন্ধে আমি মোটামুটী এক রকম বুঝ্‌লাম। যোগ-মার্গের সাধনায় ও সাধারণ মার্গের সাধনায় বিশেষ পার্থক্য আছে ব'লে বোধ হচ্ছে। তাতেই মনে হচ্ছে যে, সাধারণ লোকে যোগাভ্যাসের

অধিকারী হ'তে পারে না। কারণ, রাজযোগের মধ্যে যে ব্রহ্মচর্য্যের কথা শু'নলাম সেটা অবশ্য ত্যাগীরা পালন করতে পারেন, সুতরাং তাঁদের দ্বারায় যোগাভ্যাস হয়, কিন্তু গৃহীদের দ্বারায় যোগাভ্যাস হ'তে পারে না। কেন না, গৃহীরা ব্রহ্মচর্য্য পালন করতে পারবে না। আচ্ছা, গৃহীরা ব্রহ্মচর্য্য পালন না ক'রে কি যোগাভ্যাস করতে পারে না ?

গুরু। ব্রহ্মচর্য্য ভিন্ন যোগসাধন হয় না। কারণ, ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত আত্মজ্ঞান লাভের সম্ভাবনা নাই।

শিষ্য। ব্রহ্মচর্য্য ভিন্ন আত্মজ্ঞান লাভ না হওয়ার কারণ কি ?

গুরু। তার কারণ এই যে, যেমন দর্পণে পারা লাগিয়ে তার সাহায্যে মুখ দেখা যায়, তেমনি হৃদয়রূপ দর্পণে বীর্য্যরূপ পারা লাগিয়ে তৎসাহায্যে আত্ম দর্শন হয়। সেইজন্য প্রথম হ'তেই ব্রহ্মচর্য্য পালন করতে হয়। এমন কি, শরীর, মন ও বাক্যের দ্বারায় স্ত্রী সংসর্গের প্রসঙ্গও নিষিদ্ধ। যোগশাস্ত্রে ব'লছে যে,

কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্ববস্থাসু সর্ব্বদা।
সর্ব্বত্র মৈথুনং ত্যাগ ব্রহ্মচর্য্য প্রচক্ষতে ॥

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ, বুঝলাম যে এই তিন রকম মৈথুন ত্যাগই হ'ল ব্রহ্মচর্য্য।

গুরু। তিন রকম মৈথুন নয়। এই তিন রকম উপায়ের দ্বারায় আট রকম মৈথুন ত্যাগের নাম ব্রহ্মচর্য্য।

শিষ্য। আট রকম মৈথুন কি কি ?

গুরু। শাস্ত্রে ব'লছে যে,

> ব্রহ্মচর্য্য সদা রক্ষেদষ্টধা মৈথুনং পৃথক্।
> স্মরণং কার্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্য ভাষণম্।
> সংকল্প অধ্যাবসায়শ্চ ক্রিয়া নিষ্পত্তি রেবচ।
> এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রপদন্তি মনীষিণঃ ॥

স্মরণ করা, বলা, ক্রীড়া করা, দেখা গুপ্ত মন্ত্রণা করা, সংকল্প, চেষ্টা করা, এবং কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া। মৈথুনের এই আট রকম উদ্যম থেকে নিবৃত্ত থাকার নাম ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করতে পারলে ওজ সঞ্চয় হয়, এবং ওজসম্পন্ন ব্যক্তি বিশেষ ক্ষমতাশালী হয়।

শিষ্য। ওজ সম্বন্ধে আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না।

গুরু। বীর্য্য ধারণ ক'রলে অর্থাৎ মজুত হ'লে, সেই মজুত বীর্য্য থেকে এক রকম বাষ্প উঠে মস্তিষ্কে গিয়ে জমা হয়, তাকেই ওজ বলে। বীর্য্যের যা সার তাই ওজ। ওজসম্পন্ন লোকের চোখে এক রকম জ্যোতি প্রকাশ পায়। যে ব্যক্তি এই ওজ যত সঞ্চয় করতে পারবে তার মানসিক বল তত বাড়বে।

শিষ্য। কি উপায়ের দ্বারা বেশী পরিমাণ ওজ সঞ্চয় হ'তে পারে?

গুরু। ব্রহ্মচর্য্য পালন ক'রে অর্থাৎ বীর্য্য ধারণ ক'রে ধ্যান ধারণাদি সাধনার দ্বারায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ওজ উৎপন্ন হ'তে পারে। যেমন জলাদি তরল পদার্থে তাপ দিলে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বাষ্প উঠে, তেমনি ধ্যান ধারণাদি সাধনার সময় শরীরাভ্যন্তরে এক রকম তাপ উৎপন্ন হয়। মস্তিষ্কে বিশেষ বেশী তাপ উৎপন্ন হয়। কাজেই সেই তাপের দ্বারা শরীরস্থ সঞ্চিত বীর্য্য থেকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ওজ উৎপন্ন হয়।

শিষ্য। তাহ'লে গৃহীরা ত ব্রহ্মচর্য্য পালন করতে পারে না, সুতরাং ওজও সঞ্চয় হয় না, কাজেই তাদের যোগাভ্যাসের আশাও নাই।

গুরু। কেন? গৃহীরা ত ব্রহ্মচর্য্য পালন কর্‌তে পারে। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি ব'লেছেন যে,

ঋতাবৃত্তৌ স্বদারেষু সঙ্গতির্যা বিধানতঃ।
ব্রহ্মচর্য্য তদেবোক্তং গৃহস্থাশ্রম বাসিনাম্॥

ঋতুকালে ঋতু রক্ষার জন্য যথা বিধানে নিজ স্ত্রীর সাহিত যে সঙ্গ, গৃহীদের তাই ব্রহ্মচর্য্য। এই পরিমিত বীর্য্য ক্ষয় কর্‌লেও ভজন সঞ্চয় হ'য়ে থাকে, কিন্তু অপরিমিত ক্ষয় হ'লে আর কোন আশাই নাই। এমন কি, অপরিমিত বীর্য্য ক্ষয়ের দ্বারা আয়ু পর্য্যন্ত হ্রাস পায়। নারদ পঞ্চরাত্রে একটা বচন আছে যে, "মরণং বিন্দু পাতেন জীবনং বিন্দু ধারণাৎ।" অতএব সকলেরই পরিমিত বীর্য্য ক্ষয়ের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

শিষ্য। তাহ'লে আমার বোধ হচ্ছে যে, উপযুক্ত গুরুর আদেশে চল্‌লে সকল রকম সাধনাই সকলের দ্বারা হওয়া সম্ভব। পরন্তু, উপযুক্ত গুরু পাওয়াই কঠিন।

গুরু। একদিকে কঠিন বটে, কিন্তু অবস্থাভেদে কঠিনও নয়। কারণ প্রাণে যখন প্রকৃত ব্যাকুলতা আসে, অর্থাৎ লোকে যখন প্রকৃত অধিকারী হয়, ভগবান তখন গুরু মিলিয়ে দেন। জ্ঞানী পুরুষ পেলে তাঁর কাছ থেকে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ নিতে হয়। ভগবানও সে সম্বন্ধে গীতার ৪র্থ অধ্যায়ের ৩৫শে শ্লোকে ব'লেছেন যে,

তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

জ্ঞানী পুরুষকে প্রণিপাত সেবা ও প্রশ্নের দ্বারা জ্ঞানোপদেশ গ্রহণ কর, তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীরা তোমাকে তার উপদেশ দিবেন। তার মানে

এই যে, জ্ঞানী পুরুষ পেলে, তাঁর সেবা ক'রে প্রণাম ক'রে তাঁকে সন্তুষ্ট ক'রে, তাঁর কাছে প্রশ্ন কর, তিনি তোমাকে জ্ঞানোপদেশ দেবেন। জ্ঞানী মহাত্মার নিকট উপদেশ পেলে লোকের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দূর হ'য়ে হৃদয় জ্ঞানালোকে আলোকিত হয়। তখন সেই হৃদয়ের রং ব'দ্‌লে যায়। তাতেই মহাত্মা তুলসী দাসজি ব'লেছেন যে,

সদ্‌গুরু পাওয়ে ভেদ্ বাতাওয়ে জ্ঞান্ করে উপদেশ।
কয়লাকো ময়লা ছোড়ে যব আগ করে প্রবেশ॥

কয়লাতে অগ্নি সংযোগ হ'লে কয়লা যেমন লাল রং হয়। তেম্‌নি তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ পেলে অন্ধকারাবৃত হৃদয়ও জ্ঞানালোকে আলোকিত হয়।

শিষ্য। জ্ঞানী মহাত্মা চেনা বড় কঠিন। কারণ, সব মহাত্মারাই সাধুর বেশধারী, এবং সবাই শাস্ত্রবাক্য বলেন। এখন জ্ঞানী এবং অজ্ঞান কিসে চেনা যায়?

গুরু। জ্ঞানী মহাত্মা চেন্‌বার উপায় এই যে, যে মহাত্মা শাস্ত্র-বাক্য যেমন উপদেশ দেন, নিজেও ঠিক সেই রকম আচরণ করেন অর্থাৎ সেই রকম চলেন, তিনিই জ্ঞানী। আর উপদেশ দিতে বিশেষ পটু, কিন্তু সে রকম চ'ল্‌তে অক্ষম, তিনি অজ্ঞান।

শিষ্য। আপনি যাই বলুন, আজকাল কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানী মহাত্মা চেনা এক রকম অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, ভেলই বেশী।

গুরু। না, অসম্ভব নয়। জ্ঞানী পুরুষের ভাব লক্ষণ দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পারা যায়। তা ছাড়া, জ্ঞানী মহাত্মাদের কথা বড় হৃদয়গ্রাহী হয়। কেননা, তাঁরা অনুভব লব্ধ জ্ঞানের কথা বলেন। আর যে মহাত্মা দের অনুভবে কিছু আসে নি, কেবল গ্রন্থের কথা আবৃত্তি করেন, তাঁদের কথা হৃদয়গ্রাহী হয় না, তাঁরা ঠিক বাক্‌যন্ত্রের ন্যায়। তাঁরা নিজেরাই যখন

জ্ঞানলাভ ক'র্‌তে পারেন নি, তখন সেই জ্ঞান অপরকে দেবেন কি ক'রে? যে মহাত্মার কথা শুনে হৃদয়ে বেশ আনন্দ অনুভব হবে, এবং সেই কথায় অসঙ্কোচে বিশ্বাস জন্মাবে, তুমি সেই মহাত্মাকে জ্ঞানী ব'লে জেন। ধর্ম্ম ও পূজাদি মীমাংসা পুস্তকে তার একটী উদাহরণ আছে বলি শোন। প্রাচীনকালে এক স্বাধীন হিন্দু রাজা ছিলেন। তাঁর বড় গুরুভক্তি ছিল, সেইজন্য গুরুদেবকে রাজধানীতেই প্রকাণ্ড বাড়ী ও অনেক সম্পত্তি দিয়ে রাজার মত অবস্থায় রেখেছিলেন। গুরু প্রত্যহ প্রাতে রাজসভাতে রাজাকে আশীর্ব্বাদ করতে আস্‌তেন, এবং তিনি একখানি স্বতন্ত্র সিংহাসনে ব'স্‌তেন। এই রকমে কিছুদিন যাওয়ার পর, রাজার মনে অশান্তি বোধ হওয়াতে, রাজা একদিন গুরুদেবকে ব'ললেন যে, গুরুদেব! আমার মনে শান্তি পাচ্ছিনা, কি ক'র্‌লে শান্তি পাই তাই আমাকে বলুন। গুরুদেব ব'ল্‌লেন যে, পুরাণ শ্রবণ কর শান্তি পাবে। তদনুসারে বহু ব্রাহ্মণ দ্বারা এক বৎসরকাল পুরাণ পাঠ হ'ল, রাজা শুন্‌লেন এবং অনেক দানাদিও হ'ল, কিন্তু রাজার মনে দিন দিন অশান্তিই বাড়্‌তে লাগ্‌ল। তখন রাজা গুরুদেবকে ব'ল্‌লেন যে, গুরুদেব। আমার মনে অশান্তি দিন দিন বাড়্‌ছে তার উপায় কি? গুরুদেব বল্‌লেন যে, আচ্ছা আমি স্বয়ং তোমাকে পুরাণ শোনাব তা হ'লে তুমি শান্তি পাবে। তখন গুরুদেব নিজে এক বচ্ছর ধ'রে রাজাকে পুরাণ শোনালেন, কিন্তু রাজা তাতেও শান্তি পেলেন না, দিন দিন অশান্তি বাড়্‌তেই লাগ্‌ল। ইতিমধ্যে একদিন সকাল বেলায় গুরুদেব যেমন রাজসভায় গিয়েছেন, আর অমনি রাজা হুকুম দিলেন যে, গুরুদেব। আজ হ'তে সপ্তাহ মধ্যে আপনি আমার মনে যদি শান্তি দিতে না পারেন, তাহ'লে সবংশে আপনার ফাঁসি হবে ও আপনার সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হবে। আপনি এখন যান তার ব্যবস্থা করুন। হুকুম শুনেই গুরুদেব মৃতপ্রায় হ'লেন। দুটী বচ্ছর এত কাণ্ড ক'রেও

যে শাস্তি দিতে পারেন নি, সেই শাস্তি সাত দিনের মধ্যে কি ক'রে দেবেন? সুতরাং প্রাণের আশা ত্যাগ ক'রে বাড়ী ফিরে এসে শোকাচ্ছন্ন হ'য়ে মৃতপ্রায় প'ড়ে রইলেন। ব্রাহ্মণী অকস্মাৎ বিপদের কারণ জিজ্ঞাসা করায়, সংক্ষেপে তাকে বৃত্তান্তটী ব'লে ব্রাহ্মণ প'ড়ে রইলেন। ব্রাহ্মণীও ব্যাপার শুনে শোকাতুরা হ'লেন। একটী পুত্রবধূ ছিলেন এইসব দেখে শুনে তিনিও ম্লান হ'য়ে বসে রৈলেন, স্নানাদি কেও কর্‌লেন না অথবা পাকাদিও কিছু হ'লনা। গুরুদেবের পরিবারবর্গের মধ্যে তাঁর স্ত্রী, গোপাল নামক একটী পুত্র ও পুত্রবধূ; কিন্তু পুত্রটী পাগল, সর্ব্বদা জঙ্গলেই থাকে, কোন বেশভূষা বা কোন সখ নাই। খিদে পেলে বাড়ীতে আসে এবং দুটী খেয়ে আবার চ'লে যায়। বিষয় ব্যাপার কি ঘরকন্না কিছু দেখে না কিম্বা কোন আলাপ করে না। সেদিন গোপাল দুপুর বেলায় বাড়ীতে খেতে এসে দেখে যে, বাড়ীর সকলেই শোকাচ্ছন্ন অবস্থায় আছে কারও স্নানাদি হয় নি কিম্বা পাকশা'কও হয় নি। তখন গোপাল মায়ের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলে যে মা। আজ কি হ'য়েছে? মা ব'ল্লেন যে, বাবা। তোমাকে ব'লে আর কি হবে? তুমি ত পাগল তুমি আর কি করবে? আমাদের সকলেরই ফাঁসি হবে। সম্পত্তি যায় যাক যদি আমাদের প্রাণ বাঁচে তা হ'লেও হয়। এই ব'লে গুরুপত্নী আসল বৃত্তান্তটী গোপালকে ব'ল্লেন। গোপাল শু'নে ব'ল্লে যে, মা। তুমি কোন চিন্তা ক'র না, তুমি আমার পরম গুরু, তোমার সাক্ষাতে ব'ল্‌ছি যে আমি আজই রাজাকে শাস্তি দিব। তুমি উঠ, স্নান কর, পাকশাক কর, বাবাকে ওঠাও, সকলে খাওয়া দাওয়া কর। তুমি এটা নিশ্চয় জেন যে আমি কখন মিথ্যা বলি না। গোপালের এই যুক্তিপূর্ণ সতেজ বাক্য শু'নে গুরুপত্নীর হৃদয়ে একটু আশার সঞ্চার হ'ল তখন তিনি উঠে অনেক ব'লে ক'য়ে গুরুদেবকেও উঠালেন এবং তাড়াতাড়ি স্নানাদি ক'রে

পাকশাক করলেন, কিন্তু গুরুদেব কিছুই খেতে পারলেন না। ফাঁসির আসামীকে হুকুম শুনানের পর তার যে অবস্থা হয়, গুরুদেবেরও ঠিক সেই অবস্থা হয়েছিল। আহারাদির পর গোপাল সেদিন আর কোথাও না গিয়ে বাড়ীতে ব'সে রইল, এবং বেলা প'ড়লে গুরুকে ব'ললে যে, বাবা। চলুন রাজবাড়ী যাই, রাজাকে শান্তি দিতে হবে। তাই শুনে গুরু গোপালকে বললেন যে, ভাল কাপড় চোপড় পর ফোঁটা কর। তাতে গোপাল ব'ললে যে, আমি যে বেশে আছি সেই বেশেই যাব। তখন পিতা-পুত্রে রাজবাড়ী গেলেন। রাজা, গুরু ও গুরুপুত্রের অসময়ে আসার সংবাদ পেয়ে, নিজেই এগিয়ে নিতে বেরিয়ে এলেন, এবং গুরুকে সাম্‌নে দেখে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ক'রলেন। গুরু ডান পায়ের বুড়া আঙ্গুলটা রাজার মাথায় ঠেকালেন। গোপাল তাই দেখে জিভ্‌ কেটে রাজাকে মাটী থেকে হাত ধরে টেনে তুললেন। তখন রাজা তাঁদেরকে নিয়ে বাড়ার মধ্যে একটা নির্জ্জন ঘরে ব'সলেন। তখন গোপাল রাজাকে জিজ্ঞাসা করলে যে মহারাজ! আপনি আজ আমার পিতার প্রতি এমন কঠোর আদেশ দিলেন কেন? রাজা ব'ললেন যে, গুরুপুত্র। আমি শান্তি পাবার আশায় এমন কঠোর আদেশ দিয়েছি। গুরুদেব আমাকে যা ব'লেছেন তাই করেছি, কিন্তু শান্তি পাইনি, অশান্তিই দিন দিন বাড়ছে। সেইজন্য এই কঠোর আদেশ দিয়েছি, কেননা, গুরুদেব কোন না কোন উপায় করবেনই। গোপাল রাজাকে বললে যে, আচ্ছা, আপনি আজই শান্তিলাভ করবেন। এখানে ব'লে রাখি যে, গোপাল একজন যোগাভ্যাসী, উপযুক্ত গুরুর নিকট যোগাভ্যাস ক'রে আত্মজ্ঞান লাভ ক'রেছে। সংসারে যে ছেলের মনে ভগবদ্‌ প্রেম উদয় হয়, এবং বিষয়কর্ম্মের প্রতি বৈরাগ্য হয়, তাকে লোকে পাগল বলে, সুতরাং গোপালও পাগল ব'লে পরিচিত ছিল। যেমন কোন বেশ্যার মেয়ে

বেশ্যাবৃত্তি না ক'রে যদি সৎপথে থাকতে চায়, তা হ'লে যাবতীয় বেশ্যারা সেই মেয়ের নিন্দা করে। তেম্নি সংসারে যে ছেলের মন ভগবৎ পথে যায় তাব অবস্থাও ঐ বেশ্যার মেয়ের মত হয়। তখন গোপাল রাজাকে ব'ল্লে যে, মহাবাজ। আমি ৭০ হাত লম্বা আর আঙ্গুলের মত মোটা দুগাছি দড়ি এখনই চাই রাজা তখনই হুকুম দিতেই দড়ি দুগাছি তৈয়ার হয়ে এল, তখন প্রায় সন্ধ্যা হ'য়েছে। গোপাল দড়ি দুগাছি নিয়ে উঠে দাড়িয়ে রাজাকে ব'ল্লে যে, মহাবাজ। আজ আপনাকে আমার সঙ্গে কোন স্থানে যেতে হবে, এবং আমার পিতাকেও সেই সঙ্গে যেতে হবে। রাজা সম্মত হ'লেন, কিন্তু পিতা সম্মত হ'লেন না, কারণ, শাস্তিদানে দড়ি দেখেই তিনি ভয়ানক চ'টে গিয়েছেন। পবে রাজা গুরুকে ব'লে ক'য়ে রাজি ক'রে স্বয়ং হাতিয়ারবন্দ হ'য়ে ঠিক সন্ধ্যার সময় তিনজনে রাজবাড়ী হ'তে রওনা হ'য়ে গঙ্গার ধারে বরাবর তিন ক্রোশ রাস্তা গিয়ে গোপাল একটা প্রকাণ্ড জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ কর্‌ল, সুতরাং রাজা ও গুরু দুজনকেই সেই সঙ্গে যেতে হ'ল ; কেন না, গোপালই সেদিনকাব পথপ্রদর্শক। নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে অনেক দূর গিয়ে, একটী স্থানে মোটা মোটা বড় বড় গাছ এবং নীচে পরিষ্কার ধপ্‌ধপ্ ক'র্‌ছে, তার উপর চাঁদেব আলো প'ড়ে বড়ই মনোহর শোভা হ'য়েছে দেখে গোপাল রাজাকে ব'ল্লে যে, মহারাজ। সকলেই ক্লান্ত হ'য়েছেন, অতএব এইখানে একটু বিশ্রাম করুন। তদনুসারে সকলে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করার পব, গোপাল রাজাকে ব'ল্লে যে, মহারাজ! কিছুক্ষণের জন্যে আপনাকে আমি একটা গাছেব সঙ্গে বাঁধ্‌ব। রাজা স্বীকৃত হ'লেন। তখন গোপাল এক গাছি দড়ি দিয়ে একটী গাছের গুঁড়ির সঙ্গে জড়িয়ে জড়িয়ে খুব মজবুত ক'রে রাজাকে বাঁধ্‌ল। তারপর পিতাকে বাধ্‌বার কথা বলাতে তিনি অনেক আপত্তি ক'রলেন,

কিন্তু গোপাল এক রকম জোর ক'রেই তাঁকেও ঠিক সেই মত ক'রে বাঁধ্‌ল, এবং দুজনকে বেঁধে থু'য়ে গোপাল তখন সেখান থেকে রওনা হ'ল। এদিকে রাজা ও গুরুর খুব শক্ত বাঁধনের জন্যে রক্ত চলাচল বন্ধ হ'য়ে সর্ব্বাঙ্গে যন্ত্রণা উপস্থিত হওয়াতে রাজা চীৎকার ক'রে বল্‌তে লাগ্‌লেন যে, হে গুরুপুত্র। বাঁধন খুলে দিন, বড় যন্ত্রণা পাচ্ছি। গুরুও ঠিক সেই রকম ভাবে চীৎকার ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। গোপাল কিন্তু সে সব কথা কিছু না শুনে ক্রমেই চলে যেতে লাগ্‌ল, সুতরাং রাজা ও গুরু উভয়েই যন্ত্রণা ভোগ ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। অনেক দূর গিয়ে গোপাল ফিরে দাঁড়িয়ে রাজাকে হেঁকে ব'ল্‌লে যে, মহারাজ। আপনি কি ব'ল্‌ছেন? রাজা ব'ল্‌লেন যে, বাঁধন খুলে দিন, ভয়ানক যন্ত্রণা হচ্ছে। তখন গোপাল খুব চীৎকার ক'রে ব'ল্‌লে যে, মহারাজ। আপনার গুরুকে বলুন তিনি বাঁধন খুলে দিবেন, তাহ'লে আপনার যাতনা যাবে এবং শান্তিও পাবেন। তখন রাজাও চীৎকার ক'রে ব'ললেন যে, গুরুদেব কি ক'রে বাঁধন খুলে দিয়ে আমাকে শান্তি দেবেন তিনিও যে নিজে বাঁধা এবং যাতনায় ছট্‌ফট্‌ ক'র্‌ছেন। তখন গোপাল রাজাকে ব'ল্‌লে যে, তবে মহারাজ। আপনি কার কাছে শান্তি নিতে গিয়েছিলেন? যিনি নিজেই বদ্ধাবস্থায় অশান্তি ভোগ ক'রছেন, তিনি কি আপনাকে শান্তি দিতে পারেন? তখন রাজা ব'ল্‌লেন যে, হে গুরুপুত্র। আমি এখন বুঝেছি, আমার বাঁধন খুলে দিন। গোপাল তখন এসে রাজা ও পিতার বাধন খুলে দিয়ে সেইখানে ব'সেই তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ দ্বারা রাজাকে শান্তিদান ক'র্‌লেন, এবং রাজাও কৃতকৃতার্থ হ'য়ে বাড়ী ফিরে এলেন ইত্যাদি। অনুভব জ্ঞানী ভিন্ন কেবল শাস্ত্রজ্ঞানী অপরকে জ্ঞান অথবা শান্তি দিতে পারেন না। কেননা, অপবোক্ষানুভূতি ভিন্ন সে অধিকার হয় না। তার কারণ, যার যা নিজের নাই, পরকে তা দেবে কি ক'রে? তার

আর একটী উদাহরণ শোন। রাজা পরীক্ষিতের সর্প দংশনের ব্রহ্ম শাপ হলে, তিনি মৃত্যু আশঙ্কায় মনে বড় অশান্তি পেয়েছিলেন। পুরোহিত ধৌম্য ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ রাজাকে শান্তি দিবার জন্য পুরাণাদি শুনিয়েছিলেন, কিন্তু রাজা কিছুতেই শান্তি পান নি। পরে শুকদেব স্বামী এসে যখন পুরাণ শুনালেন এবং তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দিলেন, তখন রাজা পরীক্ষিত আনন্দ ও শান্তি সবই পেলেন, এবং ব্রহ্মশাপ যাতে মিথ্যা না হয়, সেজন্য ব্যস্ত হ'য়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন ক'রলেন

শিষ্য। আপনি যে ব'ল্লেন শাস্ত্রজ্ঞানী শান্তি দিতে পারেন না। তাহ'লে শাস্ত্রসিদ্ধ জ্ঞান ও সাধনসিদ্ধ জ্ঞানে পার্থক্য কি ?

গুরু। আজ থাক, আবার কাল হবে।

পাঁচটী ঘর আছে, এবং অপরার্দ্ধে অর্থাৎ নিবৃত্তি মার্গে সুষুপ্তি নামক একটী ঘর আছে। প্রাণরূপ পেণ্ডুলেমের সাহায্যে মনরূপ কাঁটা সর্ব্বদা সেই প্রবৃত্তি মার্গস্থিত বিষয়রূপ পাঁচটী ঘরে ঘু'রে বেড়াচ্ছে। যখন যে ঘরে মন যায় তখন তাতেই অর্থাৎ সেই বিষয়েই মজে এবং তদনুরূপ কাজ করে। পরন্তু, প্রাণরূপ পেণ্ডুলেম স্থির হ'লেই মনরূপ কাঁটা তৎক্ষণাৎ খটাস্ ক'রে নিবৃত্তি মার্গের সুষুপ্তির ঘরে গিয়ে স্থির হ'য়ে থাকে। এই অবস্থাটী সাধকের সাধনার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুকূল। প্রাণায়মের দ্বারা এই অবস্থাটী প্রাপ্ত হওয়া যায় ব'লে প্রাণায়ম এত উপকারী। মুদ্রা প্রাণায়ম সিদ্ধ করবার জন্য শারীরিক ক্রিয়াবিশেষ। মুদ্রা দশ প্রকার মহামুদ্রা, মহাবন্ধ, মহাবেধ, খেচরী, উড্ডান, মূলবন্ধ, জালন্ধর, বিপরীত করণী, বজ্রোলী ও শক্তিচালিনী। বন্ধ, ইহাও শারীরিক ক্রিয়াবিশেষ। ষট্‌কর্ম্ম, এগুলিও প্রাণায়মের জন্য নাড়ী শোধনকারক শারীরিক ক্রিয়াবিশেষ। ধৌতি, নেতি, বস্তি, নৌলি ও কপাল ভাতি এই ছয়টী ক্রিয়া ষট্‌কর্ম্ম। শরীরস্থ নাড়ী পাইপের মত, সেই সব নাড়ীর মধ্যে যদি ময়লা আবর্জ্জনা জমা থাকে, তাহ'লে প্রাণায়ম অভ্যাস হয় না। কেননা, প্রাণায়মের জন্য প্রাণ ও অপান বায়ুকে পাইপ সদৃশ নাড়ীর মধ্যে দিয়ে অধঃ ও উর্দ্ধ চালনা ক'রে এক ক'রতে হয়, সুতরাং প্রাণায়ম অভ্যাস করতে গেলে প্রথমেই নাড়ী পরিষ্কার করার নিতান্ত প্রয়োজন। সমল নাড়ীতে প্রাণায়ম অভ্যাস আদৌ হ'তে পারে না। সেইজন্য যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি ব'লেছেন যে,

নাড়ী সংশোধনং কুর্য্যাদুক্ত মার্গেন যত্নতঃ।
বৃথা ক্লেশোভবেত্তস্য তচ্ছোদনং মকুর্ব্বতঃ॥

হঠযোগ শাস্ত্রে বল'ছে যে,

মলা কুলাস্থ নাড়ীষু মারুতো নৈব মধ্যগঃ।
কথংস্যাদুন্মনী ভাবঃ কার্য্যসিদ্ধিঃ কথং ভবেৎ ॥

মলাযুক্ত নাড়ী হ'লে পরে, তার মধ্যে দিয়ে প্রাণবায়ুর চলাচল হ'তে পারে না, সুতরাং উন্মন ভাব ও কার্য্যসিদ্ধি (প্রাণের সুষুম্না পথে ব্রহ্মরন্ধ্রে গমন) কি ক'রে হ'তে পারে? তবে কোন্ যোগী প্রাণায়মে সক্ষম, পরের শ্লোকে তাই ব'লছে যে,

শুদ্ধি মেতি যদা সর্ব্বং নাড়ী চক্রম্ মলাকুলম্।
তদৈব জায়তে যোগী প্রাণ সংগ্রহণে ক্ষম ॥

যাঁর নাড়ী চক্র (সমুহ) শুদ্ধ হ'য়েছে, সেই যোগী প্রাণায়মে সক্ষম হন। লয়যোগ, মনকে একদম স্থির করার নাম লয়যোগ। অর্থাৎ মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম যে সংকল্প বিকল্প রূপ বিক্ষেপ তখন একবারে রহিত হ'য়ে যায়। মন যখন আপনার মনেই স্থির হ'য়ে থাকে, তখন তাকে লয়যোগ বলে। যোগশাস্ত্রে এই লয়যোগ সিদ্ধির যে সব পদ্ধতি আছে, তার মধ্যে নাদ শ্রবণই একমাত্র শ্রেষ্ঠ। যোগাভ্যাসীরা এই নাদ শ্রবণের অভ্যাসকে নাদানুসন্ধান বলেন। নাদ শ্রবণের মানে এই যে, লোকের হৃদয়ে আত্মার চারিদিকে নানাবিধ শব্দ (বাদ্য) অহরহঃ বাজ্ছে, অভ্যাসের দ্বারা সেই শব্দ আপন কাণে শু'নতে পাওয়া যায়। নাদ শ্রবণ অভ্যাসের নিয়ম এই যে, এমন নির্জ্জন স্থানে আসন ক'রে ব'সতে হবে যে কোন রকম শব্দ সেখানে না আসে, এবং মনে কোন বিষয়-চিন্তা না ক'রে কেবল চুপ ক'রে ব'সে থাকতে হবে। এইরূপ ছ মাসের অভ্যাসের দ্বারা স্বীয় হৃদয়স্থ নাদ আপন কাণেই শুনতে পাওয়া যায়। নাদ দশ প্রকার, তার কোন নাদ

দক্ষিণা-সাহিত্য

বাংলার
উপন্যাস

বাংলার
রস

শতকরা ১০০ জনই উপকৃত হইবেন—কেহই ব্যর্থ মনোরথ হইবেন না—শুধু কথায় নহে—কার্য্যে দেখুন—

সংসারের সুখ-শান্তি—BIRTH-CONTROLLER

৮১ বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে—গর্ভ ইচ্ছাধীন করিবার

ইচ্ছামতি পিল

"Wifes friend"—The safe and sure way to Birth-Control—গর্ভ ইচ্ছাধীন করিবার বা চিরদিনের মত স্থগিত রাখিবার একমাত্র উপায়—এরূপ নিশ্চিত ঔষধ আর দ্বিতীয় নাই। নির্দ্দোষ ঔষধ—ব্যবহারে কোনরূপ স্বাস্থ্যহানী হয় না। ইহা ঋতুর সময়ে একদিন মাত্র খাইতে হয়। যে ঋতুতে খাইবেন, সে মাসে গর্ভ কিছুতেই হইবে না—ইহা আমরা জোর গলায় ঢাক বাজাইয়া স্পর্দ্ধার সহিত ঘোষণা করিতেছি। ইহা প্রতি মাসে ঋতুকালীন খাইলে কোনক্রমেই গর্ভ হইবে না। আবার ঔষধ বন্ধ করিলেই পূর্ব্ববৎ সন্তানাদি হইতে পারিবে। যাঁহারা রুগ্নতা, অর্থাভাব বা অন্য যে কোন কারণ বশতঃ সন্তান উৎপাদনে অসমর্থ তাঁহারা নিঃসন্দেহে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন। লক্ষ লক্ষ স্থানে পরীক্ষিত এবং একমাত্র নিরাপদ ও অব্যর্থ ফলপ্রদ দেব-দুর্লভ স্বর্গীয় মহৌষধ। মূল্য—এক বৎসরের ২৷৷০ আড়াই টাকা—ছয় মাসের ১৸০ সাত সিকা।

সাবধান—এক মাসের ঋতুকালে ঔষধ খাইয়া (পেট-পোড়া) কেহ চিরদিনের জন্য গর্ভ হওয়া বন্ধ করিবেন না। ইহাতে অনেকের চির-জীবনের মত শরীর ব্যাধি-মন্দির হইয়া শেষে অকাল মৃত্যু বা ঋতু দোষে পেটের পীড়া, মাথার পীড়া, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি নানা রোগের সৃষ্টি হইয়া থাকে। অতএব সকলে নির্দ্দোষ ঔষধ ব্যবহার করুন।

টাইট ... [illegible]

এই ঔষধ ঋতুকালীন সাত দিন মাত্র ব্যবহার করিলে পতিত বক্ষোজ উন্নত ও [illegible] ... সন্দেহ নাই।

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত

পীতাতঙ্কের প্রতিকার

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই বপ্লবীরা সুপ্রতিষ্ঠিত রাজশক্তি বিধ্বস্ত করিবার উদ্দেশ্যে গুপ্ত নরহত্যা দ্বারা সমাজে উদ্বেগ ও ত্রাসের সঞ্চার করিয়া দেশে অশান্তি বিস্তার করে। এক সম্প্রদায়ের পীতাঙ্ক মঙ্গোলিয়ান বিপ্লবী পিশাচিক ষড়যন্ত্রের সাহায্যে একটি বিরাট ককেশীয় রাজশক্তির গৌরব ও প্রতিষ্ঠা নষ্ট করিবার চেষ্টা করিলে কি ভাবে তাহাদের সেই চেষ্টা বিফল হইযাছিল এবং অবশেষে বিপ্লবীরা কি উপায়ে বিধ্বস্ত হওয়ায় বিভীষিকাপূর্ণ বিপ্লববাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছিল, তাহার ঘটনা-বৈচিত্র্যপূর্ণ এরূপ উপন্যাস বঙ্গসাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া অসংখ্য পাঠক ইহা পাঠের জন্য উদগ্রীব। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই অতি উৎকৃষ্ট, সুবৃহৎ উপন্যাস—মূল্য দেড় টাকা।

— রহস্যলহরী সিরিজের অন্যান্য পুস্তক —

অতুলনীয় রহস্যলহরী সিরিজের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সুনির্ব্বাচিত উপন্যাসগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয়। পাঠাগার, রেলওয়ে ইনষ্টিটিউট এবং স্কুল কলেজের 'কমনরুমে' রাখিবার যোগ্য। সকল পাঠক পাঠিকার চিত্তাকর্ষক লোমাঞ্চকর এড্ভেঞ্চার কাহিনী—

১। **নির্ব্বাসিতের নির্য্যাতন**—উপন্যাস হইলেও প্রকৃতপক্ষে অনতিরঞ্জিত সত্য ঘটনার বিবরণ। মূল্য এক টাকা বার আনা।

২। **গুণ্ডার ঘাড়ে গুণ্ডা**—পরহিতব্রত বলবান পালোয়ান গুণ্ডার কবল হইতে লক্ষপতির অপহৃতা কন্যাকে একাকী উদ্ধার করিয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, মূল্য দেড় টাকা।

৩। **মরণ-ভবন**—কৃত্রিম স্বর্ণ নির্ম্মাণের দ্বারা বিশুদ্ধ স্বর্ণকে রাং, তাঁমা, সীসা প্রভৃতি ধাতুর ন্যায় সুলভ করিবার চেষ্টায় রাসায়নিকের জীবনব্যাপী সাধনার কৌতুকাবহ বিবরণ। মূল্য দেড় টাকা।

১৫। **দস্যু সম্মিলনী**—লণ্ডনের সুবিখ্যাত কসমোপলিটনে হোটেলে পৃথিবীর সকল সভ্যদেশের দস্যুতস্কর সমাজের প্রতিনিধিগণের বার্ষিক সভাধিবেশন। মূল্য বার আনা।

১৬। **হুইবারের মৃত্যু**—পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের দস্যুদলের অধিনায়কের শোচনীয় মৃত্যু। মৃত্যুর পর লণ্ডনে তাহার আকস্মিক আবির্ভাব। মূল্য বার আনা।

১৭। **স্বর্গের মধ্যে ভূত**—কর্ত্তব্যনিষ্ঠ নির্লোভ সাধুপ্রকৃতি ডিটেকটিভ চুরির মিথ্যা অভিযোগে সাতবৎসরের জন্য

রবীন্দ্রনাথের

= ছন্দোময় নূতন কবিতার বই =

বিচিত্রিতা

অবনীন্দ্র, গগনেন্দ্র, নন্দলাল প্রভৃতি ও

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত

মোট ৩০ খানি নূতন রঙীন চিত্রে শোভিত

বর্ণে, চিত্রে, কবিত্বে, গৌরবে ও

— শ্রীনরেন্দ্র দেব সম্পাদিত —

নিখিল-বিরহী-জন হিয়াব প্রতি অসীম সমবেদনা নিয়ে অমর কবি কালিদাস তাঁব অনুপম কাব্যে মেঘ-দূতের শ্লোকে শ্লোকে বিরহের যে অভিনব স্বর্গলোক সৃষ্টি করে গেছেন, সেই অক্ষয় মেঘদূত কাব্য মনোহর চিত্রাবলীতে সুসজ্জিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। সুকবি নরেন্দ্র দেব সুললিত বাংলা কবিতায় এর অনুবাদ করেছেন এবং কতিপয় সুনিপুণ শিল্পী, প্রতি কবিতার প্রতিপাদ্য বস্তুকে,—কবির কল্পিত ও সহৃদয় পাঠকের অনুভবমাত্র-বেদ্য পদার্থকে মূর্তিমান্ করে লোকলোচনের সম্মুখে তুলে ধরেছেন।

ছবি, ছাপা, কাগজ, বাঁধানো ও সর্ব্বোপরি প্রচুর এবং মনোহর চিত্রগুলির দিকে তাকিলে, গ্রন্থের

মেঘদূত

তৃতীয় সংস্করণ

ছত্রিশখানি বহুবর্ণ চিত্র শোভিত

তিন রঙের ছাপাই ও উৎকৃষ্ট বাঁধাই